মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

দীপক চন্দ্র

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আধুনিক কথাসাহিত্যকে যাঁরা খ্যাতির উন্নতশীর্ষে তুলে ধরেছেন, মনোজ বসু সেই অগ্রণী কথাসাহিত্যিকদের একজন। লেখকের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে তাঁর সৃজনী ব্যক্তিত্বের রসাস্বাদন করতে চেয়েছি। সেই প্রচেষ্টা সেরেছি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করে। লেখকের জীবনস্মৃতিমূলক রচনা না থাকার জন্য বক্তব্যকে সবদিক দিয়ে তথ্যপূর্ণ করার প্রয়োজন বোধ করেছি। শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সৃষ্টি কার্যকে মিলিয়ে নেবার জন্য লেখকের সঙ্গে অনেকগুলি বৈঠকে বসেছি। গল্পকারের মনঃপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেছি এবং বক্তব্যের শিল্পমূল্য যাচাই করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছি। দেশকাল এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত লেখক-মনটির অনুশীলনের সাধনায় কতখানি সাফল্য অর্জন করেছি, জানি না। তবে, শিল্পীর সান্নিধ্যে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাতে স্রষ্টার অন্তর্নিহিত রহস্য কিছুটা উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস। আপন জ্ঞান বিশ্বাসের নিক্তিতে মেপেছি কালগত ইতিহাসের পরিধি এবং শিল্পীর নিজস্ব শিল্পকর্ম। লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা থেকে আমার রচনা উৎসারিত। এইটুকুই আমার তৃপ্তি। যদি কিছু ভ্রান্তি বা অসংগতি ঘটে থাকে, তার সংশোধনের জন্য গুণীদের পরামর্শ সবিনয়ে আহ্বান করছি।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য বহু লোকের কাছে নানাভাবে ঋণী। সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। সবচেয়ে বেশি ঋণী লেখক মনোজ বসুর কাছে। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় যোগসূত্রটি উপলব্ধির জন্য সময়ে অসময়ে নানাভাবে উপদ্রব করেছি। রচনার সূত্রপাত থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বিবিধ উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। উপকৃত করেছেন। এবং আমার প্রতি আন্তরিক প্রীতিবশত একটি ভূমিকা লিখে গ্রন্থটিকে অলংকৃত করেছেন। তাঁকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাই। রবীন্দ্রভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ও পাণ্ডুলিপির শেষাংশটি দেখে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। তিনি শিক্ষক। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। এ ছাড়া বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন টাকী রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সর্বশ্রী নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, প্রণবেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইইন্দু ঘোষ, এবং সুলেখক শ্রীসুভাষ সমাজদার। ব্রতচারী-গ্রামের শ্রীপ্রিয়লাল সেন মনোজ বসু সম্পাদিত দুষ্প্রাপ্য 'বাংলার শক্তি' পত্রিকাটি দেখতে দেন। এঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

আলোচ্য গ্রন্থটি যদি সুধী পাঠকমহলে কোনরকম কৌতূহল জাগাতে পারে, তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

দীপক চন্দ্র

ভূমিকা

বাঙলা গল্প-উপন্যাস সাহিত্যে যাঁরা এই শতকের বিশের দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন মনোজ বসু তাঁদের অন্যতম। মনোজ বসুর সমসাময়িক কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পীর সামগ্রিক মূল্যায়নের চেষ্টা ইতিপূর্বে হয়েছে। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিকের মূল্যায়ন আমরা করেছি, কিন্তু অনেকেই এখনও সামগ্রিক বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন। এঁদের চেয়ে বয়সে কিছু বড় হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় সমসময়ে আবির্ভূত জগদীশ গুপ্তের পৃথক ঐতিহাসিক মূল্যায়নেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অবশ্য কল্লোল ও সমসাময়িক কালের অনেক লেখক এখনও লিখছেন। তাঁদের কেউ কেউ এখনও বাস্তবতার নতুন নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতিতে উৎসাহী, প্রাচীন ইতিহাস ও শাস্ত্রভিত্তিক জীবন-কাহিনীকে রূপ দিতে উৎসুক, ভবিষ্যৎ মানব-সমাজ সম্পর্কে শঙ্কা বিস্ময় বিহ্বল অনুমিতি ও কল্পনাতে এখনও আগ্রহী। কাজেই এঁদের সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পর্কে এখনই অধীর হলে চলবে না, অপেক্ষা করতে হবে।

সেই দিক থেকে মনোজ বসুর সামগ্রিক মূল্যায়ন হয়তো এখনই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে তাঁর লেখনী গল্প-উপন্যাস সাহিত্যে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা বিশেষ চারিত্র্য-ধর্ম অর্জন করেছে এবং পরবর্তী দুই প্রজন্মের প্রেরণামূলে কাজ করতে শুরু করেছে বলে এই সুদীর্ঘ কালের সৃষ্টিবৈচিত্র্যকে পূর্বাপর সাহিত্যধারায় অন্বিত করে দেখবার চেষ্টা করলে বোধহয় অন্যায় হবে না।

চরিত্রধর্মে মনোজ বসু 'কল্লোল' লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। কল্লোলের নাগরিকতা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। সে দিক থেকে তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। তারাশঙ্কর যেমন ছিলেন পল্লীপ্রাণ, রাজনৈতিক কর্মে অনুপ্রাণিত ও গ্রামীণ ঐতিহ্যে বিশ্বাসী তেমনি মনোজ বসুও পল্লীপ্রাণ, বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে চালিত না হলেও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং পল্লী-জীবন উদ্বোধনে বিশ্বাসী। কাজেই অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র কিংবা শৈলজানন্দের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তারাশঙ্কর যেমন একগোত্র নন, মনোজ বসুও তাই। তবে জল মাটি মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা মনোজ ও

তারাশঙ্করের গল্পে যে বৃহত্তর মানবসমাজের নতুন স্বাদ এনেছিল তার সঙ্গে কল্লোলের লেখকদের একটা সূক্ষ্ম সহমর্মিতার সূত্র বাঁধা হয়ে গিয়েছিল।

তাই বলে মনোজ ও তারাশঙ্করকে একেবারেই সমগোত্রের শিল্পী বলা চলবে না। দেশের মানুষের বিক্ত বীভৎস আদিম যে রূপটি তারাশঙ্করের গল্পে ফুটেছে, যে আদিম দৈবশক্তির লীলায় তিনি গভীর দৃষ্টিকে চালিত করেছেন, যে দৈবশক্তির রূপ আমরা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় মাঝে মাঝে পেয়েছি—মানুষের সেই অন্তর্জগতের নৈরাশ্য চেতনায় তারাশঙ্কর কল্লোলীয় মানসিকতার নিকটআত্মীয় বলে মনে হয়। এবং এক্ষেত্রেই তিনি মনোজ বসুর শিল্পীসত্তা থেকে ভিন্ন পথে চলে গেছেন। অন্যদিকে বিভূতি ভূষণের সঙ্গে মনোজ বসুর শিল্পীমনের সাদৃশ্য ফুটে ওঠে। উভয়েই দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে এগিয়েছেন, শিক্ষকতা করে জীবন কাটিয়েছেন (বিভূতিভূষণ বরাবরই শিক্ষক, মনোজ বসু পরে শিক্ষকতা ছেড়েছেন, সাচ্ছল্য এসেছে জীবনে), কিন্তু উভয়েই চরম দারিদ্র্য ও উঞ্ছবৃত্তির মধ্যেও স্রষ্টার মানসিকতাকে অমর রাখতে পেরেছেন। উভয়েই জীবিকার সূত্রে শহরের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও পল্লীনিষ্ঠা ও প্রকৃতিনিষ্ঠাকে অটুট রেখেছেন, প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতায় প্রবাসী বিরহ বোধ করেছেন। 'পথের পাঁচালী' থেকে 'ইছামতী' পর্যন্ত প্রকৃতির প্রসন্নতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমতায় বিভূতিভূষণ শান্ত উদার, ঊর্ধ্বমুখী, বিনম্র ও করুণ। এই প্রকৃতিপ্রীতি ও জনজীবন মমতা মনোজ বসুর শিল্পী সত্তার ভিত্তিভূমি এক্ষেত্রে উভয়েই তারাশঙ্করের রুদ্রতা বীভৎসতা ও বলিষ্ঠতা থেকে অনেক দূরে। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের শিবনারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণ এবং 'নববাঁধ' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় সিংহ চরিত্রের স্রষ্টা মনোজ বসু যেমন তারাশঙ্করের আত্মীয়, তেমনি 'জলজঙ্গল' 'বন কেটে বসত' 'আমার ফাঁসি হল'-র লেখক মনোজ বসু বিভূতিভূষণের আত্মীয়। বিশেষ করে আমার ফাঁসি হল' বইটিতে অতিপ্রাকৃত চেতনার দিকটি তাঁকে বিভূতিভূষণের নিকটআত্মীয় করেছে। দেবযানের অতিপ্রাকৃতের তাত্ত্বিকতাকে মনোজ বসু ত্যাগ করেছেন ঠিকই, তবে দেবযানের মতোই মানুষের এক বিশেষ বিশ্বাসলব্ধ সত্যকে এই উপন্যাসে রূপ দেওয়া হয়েছে এবং প্রেতলোকের মানব-প্রেমতৃষ্ণা বিভূতিভূষণ ও মনোজ বসু কারুরই কম নয় বলেই আমার ধারণা। প্রেতলোকের প্রতি বিশ্বাসকে মেনে নিলে একটা তত্ত্বকেই গ্রহণ করা হয়। বিভূতিভূষণ যে তত্ত্বকে একটু ডিটেল্‌স-এ সাজিয়েছেন, মনোজ বসু সেই ডিটেল্‌স-এ যাননি এই যা তফাত। নইলে

বিভিন্ন •স্তরে আত্মার মানবিক স্নেহ-প্রেম-তৃষ্ণা বিভূতিভূষণ যথেষ্টই দেখিয়েছেন এবং জীবনের প্রতি এক করুণ মধুর শান্ত কৌতূহলেই সেবখান উপভোগ্য হয়েছে। অন্যদিকে মনোজ বসুর উপন্যাসে জীবন-মুখীনতার তীব্র হাহাকার ফুটে উঠেছে এবং তা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই ঘটেছে। প্রেমের গভীরতা শুধু হাহাকারেই যে প্রকাশ পাবে এমন কোনো কথা নেই। শান্ত উদ্বেগের কারুণ্যও যে সময় সময় গভীর মমতার অব্যর্থ প্রমাণ দেয় তাতে সন্দেহ কি? তার ওপর প্রেমের জটিলতা, নারীর•নানা পরিবেশগত সমস্যা ও তার ওপর সামাজিক চাপ, রাজনৈতিক আবর্ত ও মানবসমাজে তার প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সামাজিক নানা বৃত্তির ('নিশিকুটুম্ব' যার দুর্লভ ঔপন্যাসিক রূপায়ণ বলেই মনে করি) জীবনায়ন, একেবারেই সমকালীন বিচ্ছিন্নতা বোধের যন্ত্রণা ইত্যাদি বিচিত্র সমস্যার ক্ষেত্রে মনোজ বসুর শিল্পীসত্তা আত্মপ্রকাশের নিরন্তর পরীক্ষা করেছে ও করছে এবং সেদিক থেকে বিভূতিভূষণের তুলনায় সৌভাগ্যতঃ পরিবর্তিত সামাজিক পটে বৃহত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনেক সুযোগ পেয়ে গেছেন তিনি। মানবের প্রতি অসীম মমতা, অন্তর্জগতের প্রবল দ্বন্দ্ব (যদিও দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ খুব গভীর নয়), পাপীর প্রতি অসীম মমতা, মানুষের ওপর সামাজিক নানা সংস্কারের চাপের ফলে দুঃখবোধ মনোজ বসুর শিল্পী-মনকে বিষণ্ণ ও বৈরাগী করে তুলেছে, মাঝে মাঝে মনে হয় কিছুটা অভিমানীও করেছে। মোটকথা জীবনের বিচিত্র পথ-পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় লেখক আপাততঃ একটা নিরুদ্বিগ্ন কৌতুক স্নিগ্ধ শান্ত শিল্পী মনকে আয়ত্ত করেছেন ঠিকই কিন্তু সমকালের বিকৃত জীবন-ভাবনার মধ্য দিয়ে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাসকে লেখক সঞ্চার করতে পারেন নি। রাজনীতি, সমাজ ও শক্তির-পারস্পরিক মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পীমন নিরুত্তর থেকেছে। শুধু উদভ্রান্ত বর্তমানের ছবি ফুটিয়েই শিল্পী ক্ষান্ত হয়েছেন। 'আমি সম্রাট' উপন্যাসটির কথা মনে রেখেই একথা বলছি। তারাশঙ্করের শেষের দিকের উপন্যাসেও এই স্থিরলক্ষ্যের অস্পষ্টতা দেখা গেছে। সমস্যাকে যত স্পষ্ট করে তোলেন, বিষয়জ্ঞানের যতটা পরিচয় দেন, জীবনের পরিপূর্ণতার চেহারাটা তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। মনে হয় একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সামনে এসে শিল্পী যেন থমকে যান।

মনোজ বসু তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ-- এই তিন শিল্পী গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের সংগ্রামের স্থায়ী রূপ দেবার যে চেষ্টা করেছিলেন, তার মধ্যে রোমান্টিক ভাবুকতার প্রমাণ যতই থাক, বিষয় জ্ঞান

পা বাস্তবচেতনা যথেষ্টই আছে এবং সব রকমের ইম্প্রেশান বা প্রতীতির মধ্য দিয়ে জীবনের যে বিস্ময় রস তাঁদের রচনায় বিচ্ছুরিত হয়েছে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুর মধ্য দিয়ে সেই রস একালের শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেও উদ্দীপ্ত হয়েছে।

দীপক মনোজ বসুর সাহিত্যসাধনার সূচনাপর্ব থেকে পরিণতি কাল পর্যন্ত ধারাবাহিক বিশ্লেষণের আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। গল্প উপন্যাস নাটক স্মৃতিকথা ডায়ারি—বিভিন্ন বিভাগে মনোজ বসুর অবদানের সার্বিক রূপটিকে তিনি তুলে ধরেছেন এবং সবচেয়ে প্রশংসনীয় এই যে, পরিপ্রেক্ষিতটিকে স্পষ্ট করে লেখকের রচনাগুলির বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রয়োজন মতো সমকালের বা সমগোত্রের বা বিভিন্ন গোত্রের শিল্পীদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি মনোজ বসুর শিল্পী মনটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন এবং এই নীতিতেই একজন প্রধান শিল্পীর ভূমিকা যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই মৌলিক ধারণা থেকে তিনি কখনই বিচ্যুত হন নি। তবে উত্তরকালের কাছে মনোজ বসুর রচনার মূল্য কতখানি, উত্তর-সূরীদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র কোথায়, প্রতিভার সীমাবদ্ধতাই বা কোথায় সে প্রসঙ্গে একটু বিস্তৃত আলোচনা থাকলে মনোজ বসুর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ বোধহয় আরও সম্পূর্ণ হতো। গদ্যশিল্পী মনোজ বসুর ভূমিকাতেও ততটা ধারাসচেতনতা লক্ষ্য করা গেল না। ভবিষ্যতে এই অসম্পূর্ণতা তিনি পূরণ করবেন নিশ্চয়।

কিন্তু একজন অন্যতম সাহিত্যস্রষ্টার সার্বিক মূল্যায়নের এই প্রাথমিক বহু পরিশ্রমসাধ্য সাধনাকে শ্রদ্ধা জানাই এই কারণে যে প্রাথমিক গবেষকের দুরূহ কাজ তিনি সম্পাদন করেছেন বলেই এই সাহিত্যবিচার প্রসঙ্গে সম্পূর্ণতা অসম্পূর্ণতার তর্ক তুলতে পারছি, অন্ততঃ তর্ক করবার সাহস পাচ্ছি। আশা করি পাঠকও মনোজ বসুর সাহিত্য-বিচারের এই আলোচনায় তর্কবিতর্ক তুলে দীপকের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাবেন।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালা বদলের ইতিহাস :

ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ-মানুষের সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে এবং মানবিক মর্যাদা ও বাস্তব সত্য-প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিশ শতকের শুরু থেকে এই বিরাট জিজ্ঞাসা সোচ্চার হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক গ্রন্থ, দৃষ্টিকে শুধু সমাজবর্গগতভাবে প্রসৃত রাখেনি। জীবনকে দেখা ও দেখানোর ক্ষেত্রে তাকে বিস্তৃত করেছিল। যুগগত তাগিদও ছিল এর পশ্চাতে সক্রিয়। ব্যক্তির আত্মভাবনা এবং সমাজচেতনায় ধীরে ধীরে যা জাগছিল অথচ পারছিল না ঠিকমত অবগুণ্ঠনমুক্ত হতে, সেই প্রত্যয়দৃপ্ত জীবনের নিশ্চিত আবিষ্কারের চাঞ্চল্য অনুভূত হল এই বিশ শতকেই।

কিন্তু শিল্পসাফল্যের পশ্চাতে সমাজসংস্কারের প্রতি সাধারণ মানুষের আনুগত্য ছিল বড় বন্ধন। সমাজের নাগপাশ থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার মুক্তির প্রশ্ন দেখা দিল প্রথম। প্রথম দশকের পরেও, পূর্বে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গৌরবের সমাজ-ভূমিতে। সমাজসত্তা ছিল জীবন পরিবেশের যূপকাষ্ঠে করুণতম বলি। বিশ শতকের উপান্তে এসে বাংলা সাহিত্যের যে পালা বদল হল, তা আকস্মিক না হলেও দ্রুত। অনুশীলনের ভেতর দিয়ে তার ক্রমাগত গ্রহণ-বর্জন চলেছে। একটা নির্দিষ্ট formএ পৌঁছতে লেগেছে অনেক সময়। বাংলা উপন্যাসে এই বিশেষ রীতিটি হচ্ছে: ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সমাজ-প্রভাবকে গৌণ করে দেখা। মানুষের সামগ্রিক বিকাশই সমাজের লক্ষ্য। সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধারণার অবসান ঘটিয়ে একটা স্বাধীন মুক্তদৃপ্ত জীবনাবেগ সৃষ্টি করা ছিল সাহিত্যের মৌল উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য সাহিত্য ইতিপূর্বে তা সার্থকতায় উত্তীর্ণ। মানুষের বিপুলব্যাপ্ত বহুমুখী জীবনের কোলাহলের ঢেউ বাংলা সাহিত্যের তটভূমিতে এসে আঘাত করল। মানুষের সার্বিক মূল্যায়নে বাংলা সাহিত্য পশ্চাৎপদ থাকল না। বিশ শতকের তিন দশকের মধ্যেই দ্রুত অনেকগুলি পরিবর্তন সংঘটিত হল।

রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" (১৯০১) বাংলা সাহিত্যে এক অনাগত যুগের বার্তা বহন করে আনল। ঐ বছরের [illegible] জুলাই ([illegible] সাল) [illegible] বঙ্গ

ম. ১

জন্মগ্রহণ করেন। এই দু'য়ের মধ্যে কোন সম্পর্কসূত্র নেই। তবে, কালগত পরিধিতে তার একটা তাৎপর্য হয়ত পাওয়া যেতে পারে। তাই এই সময়ের মূল্যায়নের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ মনোজ বসুর জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যখ্যাতি লাভ করা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য যে বেশ কয়েকটি বাঁক নিয়েছে, কালগত ব্যবধানের দিক থেকে তা অনুমান করা যায়। এই বাঁকগুলির অনুসন্ধানসূত্রেই মনোজ বসুর প্রতিভার তাৎপর্য নির্ণয় করব এবং ফলে লেখকের স্ব-ক্ষেত্র চিহ্নিত করণের কাজের সুবিধে হবে।

বিশ শতকের সুরু থেকেই সমাজ ও মানুষকে নিয়ে সাহিত্য যে প্রশ্ন করেছে এবং মানুষ সম্পর্কে যে বিচিত্র কৌতূহল প্রকাশ করেছে তার ফলে শৈল্পিক আদর্শ ও বি'য়ের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। "নষ্টনীড়" প্রামাণিক নিদর্শন। আমাদের সাহিত্যে যা নেই অথচ জীবনে যে সমস্যা খুবই সম্ভব ও সম্ভাব্য, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বরণ করে আনলেন বাংলা কথাসাহিত্যে।

"নষ্টনীড়" গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসা এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে। "চোখের বালি"তে (১৯০৩) সেই সংকেত আরো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়েছে। এই দুইটি রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সমাজের নৈতিক আনুগত্যকে ব্যক্তির জীবনে শিথিল করে দেখা। [illegible] কারণের [illegible] মর্মভেদী [illegible] সমাজসংস্থাকে করেছেন তিনি নির্লিপ্ত দর্শক। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সমাজের ভূমিকা খুব স্পষ্ট ও সুবেদ্য নয়। আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি ছিল জীবনের [illegible] পর্যন্ত ব্যাপ্ত। "Look within and life, it seems, is very far from being like this---life is a luminous halo".[১] সেই কারণে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসংস্থার কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটেনি। পরোক্ষভাবে তা (সমাজসংস্থা) positive বা ইতিবাচক শক্তি সৃষ্টি করে চরিত্রগুলির অন্তরে। রবীন্দ্রনাথের এই জীবনবোধের পশ্চাতে আছে লেখকের গভীর পাশ্চাত্ত্য অনুশীলন।

রবীন্দ্র সমকালেই পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে এক বিরাট ভাঙাগড়ার সূচনা হল। পুরাতন রীতি ও জীবনধর্ম অস্বীকার করে এক নবজীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত হল ইউরোপীয় সাহিত্যে। যার মর্মকথা ছিল "try and catch the colour of life itself"[২]। ফলে, সন্ধানী দৃষ্টি মেলে মানুষের জীবনের যথাযথ স্বরূপ অনুধ্যানে লেখকরা ছিলেন তদ্গতচিত্ত। যুগের পরিবর্তিত জীবনবোধ ও

১। Virginia Woolf.

২। James Joyace—The art of fiction

দৃষ্টিভংগীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং অবচেতন লোকের গূঢ় তমসাবৃত মানব-মনের জটিল দুর্ভেদ্য দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদঘাটনে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষার তত্ত্ব যেমন একদিকে প্রধান চর্চার বিষয় হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি দেহধর্মের আদিম কামনার জয়ঘোষণাও সাহিত্যে সুচিহ্নিত হল। সামাজিক মূল্যবোধ হল সংকুচিত। অপরপক্ষে, form, technique, content, characterisation এবং analysisএর পরিবর্তন দেখা দিল অবশ্যম্ভাবী রূপে। রবীন্দ্রমননেও তার দোলা এসে লেগেছিল। তাই তাঁর উপন্যাসের আয়তরেখায় ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার কোন দ্বান্দ্বিক ভূমিকা রচিত হয়নি। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে আছে মননের সংস্কার, অসঙ্গতি ও প্রবৃত্তিগত বিক্ষোভ। রবীন্দ্রসাহিত্যে আন্তর্জাতিকতার এই মহান দানটুকু স্মরণ্য।"

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্রমপ্রসার আরম্ভ হল উপন্যাসে। সমাজ শাসন থেকে ব্যক্তিমানসের মুক্তির অভিযান শিল্পীর একমাত্র আত্মজিজ্ঞাসায় পরিণত হল। ব্যক্তিসত্তার জয়যাত্রায় রবীন্দ্রোপন্যাস (শেষ পর্বের) চিহ্নিত। ব্যক্তি সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তিচরিত্রের পূর্ণ পরিণতির মাঝে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানসের অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্পর্কটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে আপনা হতে ফুটে ওঠে। একারণে পাশ্চাত্য লেখকরা ও উপন্যাসে সমাজের স্থান [illegible] সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন।

> "সমাজ প্রভাবের ক্রমিক ক্ষীণত্ব ও ব্যক্তিসত্তার সমাজ নিরপেক্ষ সম্পূর্ণতার স্বীকৃতি ধীরে ধীরে কথাসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।... সমাজের পরিবেশমূল্য ক্রমশঃ কমতে কমতে এক নঞর্থক ধারণায় গিয়ে পৌঁছেছে। ব্যক্তির জীবনবোধ উন্মেষে [illegible] নিয়ন্ত্রণে সমাজ-প্রভাব আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকল না। সমাজ কেবল ভৌগোলিক অবলম্বনরূপে মনকে শূন্যতা থেকে রক্ষা করেছে এবং এর আত্মিকক্ষেত্রে কোন আত্মিক প্রেরণা যোগায়নি।"[৪]

এর ফলে কিন্তু তাদের মানবিক মূল্য হ্রাস পায়নি। পরিবর্তে, মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্বন্ধ এবং চিরকালের মনুষ্যত্ব-স্বভাব হয়েছে স্পষ্ট ও

৩। রবীন্দ্রনাথ "যোগাযোগ" উপন্যাসে গলসওয়ার্দির Man of property অংশকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।—উপন্যাসের কথা – দেবীপদ ভট্টাচার্য।

৪। উপন্যাসের নূতন সংজ্ঞা নির্ণয়—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সংকলিকা—সঞ্জীব বসু।

উজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যক্তির জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজ প্রভাব বলে কিছু অবশিষ্ট নেই।

আধুনিকতার এই বিশেষ লক্ষণটি রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রথম অভিব্যক্ত হলেও উনিশ শতকের ভাবাদর্শের পূজারীর পক্ষে বিশ শতকীয় জীবনজিজ্ঞাসার পূর্ণতা সম্পাদন একেবারেই অসম্ভব ছিল।

প্রতিভার সঙ্গে পরিবেশের ওতপ্রোত যোগ আছে সত্য, কিন্তু তার গাণিতিক বিকাশ যে অনিবার্যভাবে রচনামধ্যে প্রকাশ পাবে, এমন না-ও হতে পারে। যুগ রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিল ভাবনা ও পরিবেশ। কিন্তু কবির সৌন্দর্য অন্বেষণ যুগগত ক্ষয় ও অবসাদের মধ্যে ক্লান্তিবোধ করে। তাই যুগপ্রেরণার বেগকে ধারণ করে যুগের আবেদনকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সাহিত্যে। আগামীকালের সাহিত্য যে পথ ধরে চলবে, দিয়েছেন তার সম্ভাব্য পথ-নির্দেশের ইঙ্গিত। রবীন্দ্রপ্রতিভায় তাই যুগসন্ধিক্ষণের দ্বন্দ্ব প্রকট। এমন কি নোবেলপুরস্কার-প্রাপ্তির পরবর্তীযুগে রবীন্দ্ররচনা পূর্বাপেক্ষা সমাজ-নিরপেক্ষ। সমসাময়িক জীবনের সীমাহীন সমস্যার জগতে ভেসে বেড়ানোর মত শক্তি ছিল না কবির। একে এড়িয়ে যাওয়ার অভিলাষে তিনি টেকনিকের আশ্রয় নিলেন। ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৯), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাসে গল্প বলা উদ্দেশ্য নয়। মানুষের বিচিত্র তত্ত্বের বিশ্লেষণই এর আকর্ষণ। বোধ হয়, সমাজের নাগপাশ থেকে ব্যক্তিসত্তার মুক্তরূপ দেখাতে গিয়ে তিনি এই সূক্ষ্ম তত্ত্বভাবনা আশ্রয় করেছেন (যদিও তার মনস্তাত্ত্বিক মূল্য ছিল অপরিসীম)। এর ফলে ঔপন্যাসিক-গুণ ব্যাহত হয়েছে, কাহিনীবৃত্তে দেখা গেছে এক জাতীয় অসম্পূর্ণতা। তবু রবীন্দ্র-মনীষা যুগের বিশেষ মর্মবাণীটি উদ্ঘাটন করে। এই বিচারে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন।

শরৎচন্দ্রের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ সমাজনীতি থেকে সাহিত্যকে দূরে রাখার পক্ষপাতী। তাই প্রত্যয়বান শিল্পীর আত্মঘোষণা :

> "ভালকে ভাল মন্দকে মন্দ বলায় কোন artই কোনদিন আপত্তি করে না।"

এই উপলব্ধি শরৎসাহিত্যকে করেছে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে তিনি ব্যাধিক্লিষ্ট সমাজের রোগপাণ্ডুর শীর্ণ চেহারার যে ছবি এঁকেছেন তাতে সমাজের নির্দয় হৃদয়হীনতা প্রত্যক্ষ হলেও অন্তর্জীর্ণ অসহায় ও দুর্বল রূপটি চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে কখনও অপ্রকাশ

থাকেনি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সংঘাত রূপ পেয়েছে মানুষের মনোরাজ্যে, সংস্কার ও অনুভূতির নিরন্তর দ্বন্দ্বে। বস্তুত সমাজশক্তি তাঁর সকল রচনায় একমাত্র বিরুদ্ধশক্তি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তীকালে লিখিত চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), শেষপ্রশ্ন (১৯৩১) উপন্যাসগুলিতে সমাজের ভূমিকা পূর্বাপেক্ষা অনেক শ্লথ। সুদূর নির্লিপ্ততায় ব্যক্তির প্রবৃত্তিগত দ্বন্দ্বের সে একজন দর্শক। ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ এখানে সর্বাধিক। চরিত্রগুলি বেদনাময় অসহায়তার সঙ্গে সর্বত্র সমাজসংস্কারের কঠিন শাসনকে সহ্য করেছে। কিন্তু নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়নি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি শক্তিমান। শরৎসাহিত্যে নিয়ম-নীতির বাধানিষেধ অস্বীকার করে চরিত্রগুলি কেবল বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সমাজ ও সংসারের সঙ্কীর্ণতামুক্ত সাহিত্যে যে নতুন পরিবেশের উদ্ভব হয়েছে, প্রেম ও দেহ সম্পর্কে যে অভিনবত্বের সূচনা হয়েছে, তাই দিয়েছে শরৎচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক মহত্ত্ব। তাঁর নায়িকারা (কিরণময়ী, অচলা, কমল) দেহ নিয়ে খুব বিব্রত নয়। অন্যায় আর গোঁড়ামিকে দুঃসহভাবে আঘাত করতে পারায় বাংলা সাহিত্যে নৈতিক আড়ষ্টতা ঘুচে গেল চিরকালের মত। এ দিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা শরৎচন্দ্র অনেক বেশি দুঃসাহসী।

সমাজকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কোন চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব নয়। ব্যক্তির চরিত্রস্ফুরণ সম্পূর্ণরূপে সমাজনির্ভর ব্যাপার। তাই পরবর্তী যুগে সাহিত্যে সমাজের রূপান্তর সাধিত হয়েছে। ব্যক্তি-চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাজ তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। কেবল পার্থক্য, পূর্বের মত সমাজ এখানে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে না। চরিত্রস্ফুটনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমাজ ব্যবহৃত হয়েছে।

সভ্যতা-সংস্কৃতির মার্জিত রুচির প্যালিশ এবং আদর্শবাদ শরৎসাহিত্যকে প্রাণের গতিপথে মুক্তি দিতে পারেনি। কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থেকে গেছে জীবনের অনেকখানি। সমাজপ্রচলিত নীতির অনুশাসন থেকে সবলে নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে মানবমনের গোপন রহস্য ও জীবনের অনুক্ত অপ্রকাশিত ইতিহাসকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গেই অবারিত ভাবে প্রকাশ করার শপথ নিলেন শরৎ-উত্তর লেখকরা।

> "যেখানে সমাজের একটা গুরুতর ব্যথা লুকান আছে, যে বিষয়ে ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড় করিয়া সমাজ একটা মহাসমস্যাকে দুই হাতে

ঠেলিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে সেখানে কেবলমাত্র রুচি বা নীতির দোহাই দিয়া সে কথা আলোচনা নিবারণ করিবার কোনও হেতু নাই।"[৫]

জীবন সম্পর্কে তাঁদের এই সত্যনিষ্ঠা এবং সাহস বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগকে আবাহন করে আনল। মানুষের জীবনে ও সমাজে যা ঘটছে তার সত্যরূপ প্রকাশ করাই সাহিত্যের ধর্ম বলে বিবেচিত হল।[৬]

প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাব, বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের বিশ্ববীক্ষা, পরিবেশ ও মনোজগৎ সম্বন্ধে নানান জিজ্ঞাসার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রসার, রাজনৈতিক বিপ্লবান্দোলনের নিষ্ফল ফলশ্রুতি, প্রত্যয়ভঙ্গজনিত চিত্ত-বিক্ষোভ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসে একজাতীয় শূন্যতা ও তিক্ত হতাশার সৃষ্টি করে।[৭] বাঙালী জীবন-প্রতীতির মূলে দেখা দিল দ্বন্দ্বসংশয়, একটা অস্থির অনিশ্চিত জীবন-জিজ্ঞাসা। এই যন্ত্রণাই সে যুগের প্রাণ। মধ্যবিত্ত জীবনের সেই

৫। যুগপরিক্রমা (১ম) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃ—১২৩।

৬। "ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্তব্য, সত্য জীবন চিত্রিত করা। সেই চিত্রাঙ্কন-মুখে অনেক সত্য আপনাআপনি ফুটিয়া উঠিবে। সমাজের কোথায় ত্রুটি, কোথায় ব্যথা তাহা সকলের মনে জাগিয়া উঠিবে। সমাজের ও নীতির সংস্কার বিষয়ে সমস্যা লোকের মনে জাগিয়া উঠিবে।...গল্পের পরিণতি-মুখে এই সব নীতির পরিবর্তন-ঘটিত সমস্যা সমাজের কাছে জীবন্তভাবে উপস্থিত করাই ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্তব্য।" (—ঐ, পৃ-১২১)।

৭। এযুগের সাহিত্যের অন্যতম কর্ণধার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তব জীবন ভাবনায় তার প্রতিফলন পড়েছে: "আমাদের দেশের চারদিকে যখন চাই — যখন দেখি জীর্ণ শীর্ণ ভঙ্গুর দেহ নিয়ে শিশু থেকে যুবকের দল কেবল টায়-টায় জীবনটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, যখন দেখতে পাই তাদের কর্মের চেষ্টা নেই, কষ্ট সইবার-উৎসাহ নেই, নিরুপদ্রবে দিন কাটানই তাদের পরম পরমার্থ, যখন দেখতে পাই শিক্ষাভিমানী লক্ষ লক্ষ লোক তাদের স্বাধীন বিচারের জন্মগত অধিকার বর্জন করে আজ একে, কাল ওকে নেতা বলে মেনে নির্বিচারে ভেড়ার পালের মত তাদের আদেশে কর্ম বা অকর্ম করছে তখন মনে হয় যে এইটাই আমাদের দেশের সবচেয়ে অভাব;—আমাদের দেশে মানুষ নেই পুরুষ নেই।"—যুগপরিক্রমা (১ম)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; পৃ. ৬৮-৬৯।

বিনষ্টির পীড়া রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পক্ষপুটে ধরা পড়েনি। উপন্যাসশিল্পে এই অসম্পূর্ণ প্রাণলীলা শরৎ-অনুজ লেখকদের (নরেশ সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত) অন্তরে এনেছিল এক অভিনব উন্মাদনা। একটা স্বাধীন সাহিত্যিক আবহাওয়া তৈরী করার প্রবল উদ্যম দেখা গেল তাঁদের রচনায়। পূর্বসূরীদের সর্বরকম প্রভাব অস্বীকার করে এক নতুন সাহিত্যিক পরিবেশের উদ্ভব হল। জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, ডি. এইচ. লরেন্স, ফ্রয়েড, এলিস প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক ও মনোবিজ্ঞানীদের বাস্তব-নিষ্ঠা এবং জীবন-সত্যের উদ্ভাবন এই সব তরুণদের রচনার অনুপ্রেরণা জোগাল।[৮]

মানবচরিত্র ও জীবন সম্বন্ধে অকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা এবং নরনারীর প্রেমের বাস্তব বিশ্লেষণ এঁদের উপন্যাসে এক নতুন মনোভূমি সৃষ্টি করল। লরেন্সের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে : "My great religion is a belief in the blood, the flesh as being wiser than the intellect."

অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনভাষ্য বলতে এঁরা নর নারীর মিথুন-প্রবৃত্তিকে বুঝেছিলেন। প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত চিরন্তন সমস্যা নিয়ে সাহিত্য ও বাস্তবে যে প্রভেদ তারই চূড়ান্ত মীমাংসায় এঁরা আগ্রহী।

প্রবল ভাবাবেগের বন্যায় ভেসে গেল সুপ্রাচীন সামাজিক নীতি, আদর্শ ও বিশ্বাস। বিবাহ-সংস্কারের প্রতিও কোন শ্রদ্ধা রইল না তাঁদের। নর-নারীর প্রণয়জীবনের অবগুণ্ঠন মুক্ত-করা, নিষিদ্ধ কৌতূহল চরিতার্থ করা হল এঁদের রচিত গল্প ও উপন্যাসের একমাত্র পার্থিব উপাদান। মানুষী দেহ ঘিরে প্রবৃত্তি-পশুর আদিমতা সুচিহ্নিত-করণের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে বস্তুতান্ত্রিক সত্যদৃষ্টি ও রোমান্টিকপ্রবণতা। সত্যকে মিথ্যা দিয়া ঢাকার প্রয়াস নেই কোথাও। আত্মার স্বপ্রকাশিত সত্যকে বড় করে মানার ফলে সমাজ ও নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু সমগ্র জীবনকে দেখতে ও দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা। সাহিত্যে চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে কোন বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারেনি। বুদ্ধদেব বসুর মতকে একটু পরিবর্তন করে বলি : একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের প্রতিবাদের উপন্যাস—সংশয়ের ক্লান্তির

৮। "যে হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাহাতে আমাদের সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।"—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিচিত্রা—ভাদ্র ১৩৩৪।

সন্ধানের। আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানের আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।

এই বক্তব্য-সচেতনার পরিধিতেই কল্লোলের আগমন। মনে রাখতে হবে, কল্লোলের লেখকরা কেউ উনিশ শতকের শান্তিময় পরিবেশ কিংবা জীবন সম্পর্কিত ধ্রুব বিশ্বাসগুলির কোলে জন্মগ্রহণ করেনি। পূর্বালোচিত অস্থির পরিবেশ ছিল তাদের সামনে। চিন্তায়, বক্তব্যে, প্রকাশভঙ্গীতে তাই সৃষ্টি হল এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ।

> "যা আছে তার চেয়ে আরো কিছু আছে বা যা হয়েছে তা এখনো পুরোপুরি হয়নি, তারই নিশ্চিত আবিষ্কার।"*

অর্থাৎ, একালের যৌবন-চেতনা যা হতে চাইছিল অথচ পারছিল না, তারই বেগ এসে পড়ল কল্লোলের উপান্তে। উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতেও দেখা গেল কক্ষপরিবর্তনের চিহ্ন। নির্জীব সমাজের ওপর আক্রমণ ছেড়ে দিয়ে মানুষের প্রাণের মূল্য আবিষ্কার করার জন্য তারা নীতি সংস্কার ও সৌন্দর্য রুচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। An Acre of Green Grass-এ বুদ্ধদেব বসু লিখলেন: "We demanded a freer atmosphere, a greater electicism in diction and form." (p 71) এ বিদ্রোহ বিশ্বমানবাত্মার অপমান ও অসম্মানের বিরুদ্ধে। মনুষ্যত্ব ও মানবাত্মার পীড়নে কল্লোলীয়রা বেদনাবিহ্বল:

> আমার পরাণে ভাই
> কোটি মানবের অশ্রুজলের জোয়ার শুনিতে পাই।
>
> (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

কিংবা,

> আমার পরাণে জমেছে বিশ্ববেদনার মৌচাক। (ঐ)

এই সহমর্মিত্ববোধ ছিল কল্লোলভাবনার ভিত। গোটা মানুষের প্রাণের মূল্য আবিষ্কারে উৎসাহী চিত্ত ভীরুতা সংকোচ সংশয়কে বিসর্জন দিল। কোন কিছুতেই তার লুকোচুরি রইল না। জীবনের প্রয়োজনে যা অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল, নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করল তাকে। এই সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যের দিকপরিবর্তন করল। সমাজের তটভূমি থেকে জীবন সরে এল অনেকখানি। বিশাল জীবনের মহাকাব্যীয় বিস্তার বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হল সাহিত্যে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে "কল্লোল যুগ"এ লিখলেন:

> "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল, সরে এসেছিল অপজাত

৯। কল্লোল যুগ—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

কল্লোলের জীবনভাবনা ছিল বেঁচে থাকার যন্ত্রণায় পাণ্ডুর। বিকৃতি ও ক্ষয় জীবনের সব এবং শেষ কথা নয় বলেই কল্লোল-পত্রিকার অভ্যন্তরে অন্য এক সাহিত্যপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল, যার সঙ্গে বাঙলাদেশের জল-হাওয়া-মাটি ও সংস্কৃতির যোগ অবিচ্ছিন্ন। বর্তমানকে ভেঙে চুরে অগ্রাহ্য করে এক নঞর্থক শূন্য জীবনবাদ সৃষ্টিতে তাঁরা আগ্রহ বা উৎসাহ পাননি। পরিবর্তে, গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনের ভেতর যে প্রশান্ত জীবনস্রোত নিহিত থাকে তাকে আবিষ্কার করলেন সাহিত্যে।

গ্রামের অত্যন্ত পরিচিত পরিবেশের মধ্যে চরিত্রগুলির জন্ম। চরিত্র-গুলি জাতিগত ঐতিহ্য ও স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের। বলতে পারি, বিপর্যস্ত গ্রামবাংলার জীবন, অর্থনৈতিক কাঠামো ও সংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়নে তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের আটপৌরে অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে যে প্রচণ্ড জীবনস্রোত নিহিত তার কলস্বর আবিষ্কার করা ছিল এই সব রচনার অন্তর্নিহিত প্রেরণা। পল্লীর নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন অবসরের মধ্যে জীবনকে কি উপায়ে সুখে সার্থক করে তোলা যায় তার চিত্র আছে, আছে পল্লীর সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষ, ভূস্বামী এবং দিনমজুরও। আবার রাজনৈতিক ঘটনা ও ঐতিহ্যচর্চাও আছে। এই লেখকদের চিন্তায় ভাবনায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকলেও জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে কখনও প্রকাশ পায়নি তা। অনাদৃত, অবজ্ঞাত, অপাংক্তেয় মানব সমাজকে অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টির প্রবল মোহ সঞ্চারিত হয়েছিল এই কালে।[১১]

এই নবীন জীবনবোধ যাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁরা হলেন ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সরোজ রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

মনোজ বসু শেষোক্ত ধারার লেখক। কল্লোলীয়দের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তাঁর মন। মনে-প্রাণে গ্রামীণ তিনি। গ্রামজীবনের সহজ সুন্দর দিকটাই তাঁর কাছে একমাত্র সত্য।

মনোজ বসুর সাহিত্য-পাঠকমাত্রেই জানেন, এ যুগের কোন বিক্ষোভ, ঘন ঘন অধৈর্যের মাথানাড়া তাঁর গল্প, কবিতা, উপন্যাসে কোনরকম চিহ্ন-

১১। "আজকাল সব গল্পগুলিই প্রায় এক ধরণের আসে। কারখানা ও খনিকুলিদের ঘটনা লইয়া গল্প লেখা এখন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" —কল্লোল।

বিক্ষোভ সৃষ্টি করেনি। স্রষ্টার কলম হাতে করে বিধাতার রহস্যময় পৃথিবীকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আঁকলেন তিনি রূপময় করে। স্বাদু স্বাদু পদে পদে। পল্লীর আকাশ বাতাস, মাটি-মানুষ, গাছপালা, পশুপাখী, খাল-বিল নদী নালা সব লেখা হল অভিনব ভাষায়। "মনে হল হঠাৎ নতুন প্রাণের প্লাবন এসেছে—নতুন দর্শন, নতুন সন্ধান, নতুন জিজ্ঞাসার প্রদীপ্তি—নতুন বেগবীর্যের প্রবলতা।"[১২]

মনোজ বসু কল্লোলের দলের কেউ নন। এক দিক দিয়ে কথাটি সত্য হলেও, অন্য দিক দিয়ে তা কিয়ৎপরিমাণে সংকুচিত। কল্লোলের মহৎ মানবিক মূল্যবোধগুলি যে বলিষ্ঠ জীবনবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল, সাহিত্যে উত্তর-তিরিশের সব লেখকই কম বেশী তার দ্বারা প্রভাবিত। একে কল্লোলের প্রভাব না বলে বিশ শতকের সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম বলে চিহ্নিত করা ভালো। কালগত এই প্রভাব মনোজ বসুতেও উপস্থিত। কল্লোলের বিদ্রোহবাদ, আঞ্চলিকতা প্রবাহ, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, যৌননির্ভর জীবনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং নব্য রোমান্টিকতা মনোজ বসুর শিল্পীস্বভাবের অঙ্গীভূত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যে। শিল্পায়ন, জীবন প্রতিবিম্বন, ভাষারচনা লেখকের স্বাতন্ত্র্যদৃপ্ত ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল।

১২। কল্লোল যুগ—পৃ. ৩০৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাতে-খড়ি ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে মনোজ বসু কল্লোলের লেখক সম্প্রদায়ের মত তরুণ। স্ফুটোন্মুখ স্পর্শকাতর তরুণ হৃদয়ের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই ত্রিবিধ অভিঘাত এসে পড়ল। অস্থির পরিবেশের মধ্যে থেকেও লেখক অনুভব করেন নি কোন চিত্ত চাঞ্চল্য। কিংবা এযুগের সাহিত্যিক ধর্ম অনুসরণ করে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেননি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দিকে। অথবা, কল্লোলের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ, ক্ষোভ বিদ্বেষ, হাহাকার বুকে নিয়ে আঁকেননি কোন ব্যর্থ জীবনের ছবি। কল্লোল মুক্ত দৃষ্টি অনাড়ম্বর আটপৌরে জীবনের সহজ শান্ত সরল রূপের মধ্যে অন্বেষণ করেছে দেশীয় জীবনের ধারা। পারিবারিক জীবনপ্রবাহ, প্রতিবেশী মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। এই স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে বাংলাসাহিত্যে মনোজ বসুর পদসঞ্চার

লেখকের দৃষ্টিপটের সামনে ছিল গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপন, তাদের আশাআকাঙ্ক্ষার এক আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতির জগৎ। সেই ভাল-লাগা ও ভালবাসার অনুভবের বৃত্তে ধরতে চেয়েছেন সন্ধ্যাদীপের শিখার মত উজ্জ্বল, শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর গ্রাম জীবনকে।

প্রাপ্ত প্রথম-মুদ্রিত গল্প 'গৃহহারা'র (বিকাশ-২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) মধ্যেই লেখক মনোজ বসুর শিল্পধর্মের দ্বিধাহীন স্বাক্ষর প্রগাঢ় বর্ণে চিত্রিত। বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি। অপরিণত শক্তির নিদর্শন হলেও (পরিণত প্রতিভা পর্বের রচনারূপে লেখক কর্তৃক স্বীকৃতি নেই এই গল্পের। থাকার কথাও নয়) লেখক-মানস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তার মূল্য আছে বিশেষ। পূর্বোক্ত জীবনদর্শনের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে মিশেছে গল্পটির বক্তব্য। লেখকের পল্লীপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, উদার হৃদয়বত্তা এবং আদর্শবাদ অপরিণত শক্তির লেখাতেও রেকর্ড সৃষ্টি করে। "গৃহহারা" গল্পের সারমর্ম হল নিম্নরূপ ঃ

জ্যোৎস্না-পরিপ্লুত রাতে এক অজ্ঞাত সরলা পল্লীবালার অযাচিত ফুল

উপহারে এবং মিষ্টি সাক্ষাতে অভিভূত হয় কলেজে-পড়া শহরের ছেলে ডেপুটি বাবুর পুত্র। মেয়েটির পতিতা পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুগ্ধতার অবসান হয়। ঘৃণা-বিদ্বেষে আচরণ হয় রূঢ়। কিন্তু জ্যোৎস্নার মত মেয়েটির সবল সুন্দর নিষ্পাপ শান্ত জ্যোতির্ময়রূপের মধ্যে পাপ লেখা নেই। আপন ঘৃণিত জীবনের সত্য গোপন করে না সে। প্রকাশ তার নিঃসংকোচ ও দ্বিধাহীন। প্রকৃতির মত মেয়েটির মুক্ত মন, উদার নির্লিপ্ততা গল্পটির কেন্দ্রীয় সম্পদ। আকর্ষণের মূলবিন্দু।

পতিতা বলে পৃথিবীতে সে পরিত্যক্ত এবং স্বজনহীন। নিষ্পাপ জীবনযাপনের জন্য খুঁজছিল একটু নিরাপদ আশ্রয়। সে সম্ভাবনা না থাকায় ধিকৃত-জীবন অবসানের জন্য দামোদর জলে সে আত্মবিসর্জনের সংকল্প করে। এই মুহূর্তে ডেপুটিবাবুর ছেলের সঙ্গে তার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। 'আমি' চরিত্র জানতে পারল ফুল উপহার দিয়ে সে ভাই বলে বরণ করেছিল তাকে। তার দুঃসময়ে 'আমি' চরিত্র সেই দাবি স্বীকার করে তাকে গৃহে স্থান দেয়। কিন্তু সমাজের নাগপাশে বন্দী মানুষের আঁশটে সন্দেহ অজ্ঞাতকুলশীল এই বোনটিকে গৃহত্যাগে বাধ্য করে। স্বজনদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় ক্ষুব্ধ 'আমি' চরিত্র অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য 'পাষাণের সংসার' ত্যাগ করল চিরদিনের মত।

গল্পের শেষ এখানে। সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়েছে মনোজ বসুর অন্তর্নিহিত শিল্পীস্বভাব। গ্রামজীবনের আশীর্বাদ লেখককে করেছে মানবপ্রেমিক, প্রকৃতি-প্রেমিক ও রোমান্টিক। জাতীয় জীবনের হতাশা এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় জনিত যন্ত্রণা ও অবসাদ লেখককে করেছে নগরবিমুখ। আত্মপ্রত্যয়দৃপ্ত সবল মানুষকে খুঁজবার জন্য গ্রামকে নিবিড় অনুরাগে জড়িয়েছেন। রচনার মৌল প্রেরণা প্রসঙ্গে লেখকের আত্মস্বীকৃতি হল :

> "কোলকাতায় থাকি শহর রাজ্যের ভিতর অহরহ গ্রাম আবিষ্ট করে রাখে।"[১]

এর পর লেখকের দ্বিতীয় সাহিত্যিক উদ্যম হল "ছায়া" (বাঁশরী, ফাল্গুন, ১৩৩১)। কাব্যধর্মী ভাষা ও রোমান্টিক আবেগে লেখকের মানসপ্রবণতা চিহ্নিত। প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রটি কবি নিখিলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অনুভব করছেন। এখানেও লেখকের গ্রামপ্রীতি প্রকৃতিপ্রেম

১। গল্প লেখার গল্প—পৃ-৬৯।

এবং রোমান্স ও রোমান্টিকতা প্রধান হয়ে উঠেছে। এই ত্রিবিধ উপকরণ ছিল মনোজ বসুর প্রথম জীবনের সকল শ্রেণীর রচনার প্রেরণা।

আর দশজনের মত মনোজ বসুর সাহিত্যজীবন সুরু হয়েছিল কবিতা দিয়ে। সুলেখক ও পরমবন্ধু ভবানী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গল্পকার বলেছেন :

> "কবিতা লিখেছি গোড়ার দিকে…গল্পলেখার মেজাজ তখনও হয়ত গড়ে উঠেনি।"[২]

প্রথম বয়সের কবিতার কোন পরিচয় আজ আর নেই। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কবিতাগুলিই যা মনোজ বসুর কবিখ্যাতি বহন করছে। এইসব কবিতা "গৃহহারা" ও "ছায়ার" পরে প্রকাশিত হলেও লেখকের মতে কবিতাগুলি সমসাময়িক কালেই রচিত।[৩] প্রসঙ্গত বলা যায়, এতাবৎকাল পর্যন্ত মনোজ বসুর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। "ঝিলমিল" গ্রন্থের শেষের দিকে অন্যান্য রচনার সঙ্গে কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে। 'সৈনিক' উপন্যাসেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রথম যুগের কয়েকটি আবেগঘন রোমান্টিক প্রেমের কবিতা। লেখকের জীবনদর্শন গঠনে এবং সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণে এগুলির প্রয়োজন তাই বিস্মৃত হওয়া যায় না।

কবিতাগুলির এক কোটিতে আছে বাংলাদেশের সজল-শ্যামল গ্রামের রূপ, তার বুক-নিঙড়ানো মমতা ও স্নেহপ্রীতির এক জীবন্ত মানবীরূপ। অন্য কোটিতে আছে প্রেমিক-চিত্তের সুগভীর রোমান্টিক ব্যাকুলতা। মিলনের আর্তিতে কখন বিরহবিধুর, কখনও-বা প্রিয়সঙ্গ কামনায় উন্মন। আবার কখনও-বা গার্হস্থ্য জীবন-রস পিপাসায় কবিকণ্ঠ তৃষ্ণার্ত।

"গোপন কথা"[৪] কবিতায় বাংলাদেশের চির-চেনা প্রকৃতির রূপ এক অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে :

> বিল কিনারায় উড়ে চলেছিল সাদা সাদা বকগুলি
> মেঘের গলায় সাতনরী হার যায় যেন দুলি দুলি।
> তুলসীতলায় সন্ধ্যার দীপ বাতাসে কাঁপিয়া মরে।

শুধু প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য নয়, পল্লীপ্রাণকে আঁকারও চেষ্টা হয়েছে মহৎ-রূপে। "তুলসীতলায় সন্ধ্যার দীপ বাতাসে কাঁপিয়া মরে" দেশকালের গণ্ডী

২। কাছে বসে শোনা—অমৃত ; ২৯শে কার্তিক, ১৩৭২।

৩। লেখকের মুখে শোনা।

৪। বঙ্গলক্ষ্মী—আশ্বিন, ১৩৩৭, পৃ-৮৫০।

অতিক্রম করে ঐতিহ্যমণ্ডিত বাঙালী-ঘরের এক চিরপরিচিত মধুর চিত্র। ভাব ও ভাষার স্নিগ্ধতায় পল্লীর শ্রী ও লাবণ্য-মণ্ডিত রূপ আঁকার কৃতিত্ব মনোজ বসুর অনেকগুলি কবিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একাত্মতার কথা আছে "কনে ডিঙায় উঠলো"[৫] কবিতায় :

> কলমীলতারা আঁকড়িয়া ধরে নৌকার পথ ছাড়িবে না।
> ঐ মেয়েটার সাথে যে ওদের, আহা, কতদিন ধরি চেনা!
> মাঝি লগি ঠেলে। লগির গোড়ায় ডগা বেধে যায় লাখে। লাখো—
> লাখো বাহু মেলে লগির চরণে ডগাগুলো কাঁদে "রাখো, রাখো"—
> মাঝি লগি ঠেলে।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবসম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ কত নিবিড় তারই এক আশ্চর্য সুন্দর জগৎ রচিত হয়েছে এই কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণস্পন্দনকে তিনিও কবিতায় অনির্বচনীয় করে এঁকেছেন। জলস্থল আকাশের সঙ্গে একটা নিবিড় একাত্মতা ও বিশ্বপ্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষের দুঃখযন্ত্রণা বাঙ্ময় করে তোলা এবং আত্মীয়রূপে তাকে গণ্য করা তাঁর প্রকৃতিসম্বন্ধীয় কবিতার বিশিষ্টতা। Interpenetrative affinity between man and natureএর কাব্যরূপ প্রকৃতিকে একটি জীবন্ত চরিত্রে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশের এক পরিচিত কন্যা-বিদায়ের দৃশ্যে দরদী লেখকের সুকোমল অনুভূতির মৃদু শিহরণের অভিনব স্পন্দন :

> "মাঝি লগি ঠেলে। আর দুই দাঁড়ি বাঁধালের পথে গুণ টানে—
> ডিঙা ত নড়ে না। শেওলা বেধেছে,—আর বাধে কিসে কে জানে?
> তাতিমতলায় আঁখি মুছে পিসি, ন'কাকা, পুঁটি ও বৌদিদিরা
> নৌকাতে কনে, তারি সনে বুঝি আঁখিতে আঁখিতে পড়িল গিরা।
> ... ...
> কনে কাঁদিতেছে। আর কাঁদে বসে বাবলার ডালে শঙ্খচিল।
> ... ...
> সারা গাঁওখানি তাকাইয়া থাকে,—ডিঙা গুটি গুটি যায় চলি।

নদীপ্রবাহের সঙ্গে জীবনস্রোতকে মিলিয়ে দেখা এবং মাঝিকে মহাকালের

৫। বিচিত্রা—বৈশাখ, ১৩৩৮, পৃ-৬৩৩।

প্রতীক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এর কাব্য-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আত্মীয়বন্ধন যত নিবিড় হোক না কেন, দুরন্ত কালের হাতে সে অসহায় ক্রীড়নক মাত্র।

"ওরা গুণ টানে। হিঞ্চে-কলমী পট্ পট্ ছিঁড়ে নৌকা চলে,
আর ছিঁড়ে যায় মরমের গিঁঠ, শব্দ হয় না হাতিমতলে।

রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মর্মগত সাদৃশ্য এতে লক্ষ্য করা গেলেও কবিধর্মের স্বাতন্ত্র্যে কবিতার কাব্যমূল্য ও রসোৎকর্ষ হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনোজ বসুর কবিকল্পনা অরূপাভিসারে গমন করে না। জীবনের আঙিনা ঘিরে তার বিচরণ। 'যেতে নাহি দিব'র মত আপন ব্যথাতুর বাৎসল্য হৃদয়কে বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত করে দিয়ে এক নির্লিপ্ত নিরাসক্ত দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় দেননি। সম্পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত হয়ে কবি যে জীবন-রসধারার ফল্গুস্রোতে নৌকা ভাসালেন তা বুক নিঙড়ানো ব্যথার সুরে কাঙাল-করা কান্নার বন্যায় প্রাণমনকে প্লাবিত করে। অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মত জীবনের একপ্রান্তে অবশিষ্ট থাকে একটি অক্ষয়স্মৃতি :

"ডিঙা মাঝখানে কতদূর গেছে, ঘাটে বসে আছে এখনো মা—
ঘাটেতে জননী মধ্যে অথই—আর নৌকাতে মনোরমা।

... .

কনে কাঁদিতেছে। গালে জলধারা! রক্তের মত উহাও লাল,
কূলেতে সানাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুলিয়া তোলে সারা সকাল।

মনোজ বসুর সব কবিতার মধ্যেই পৃথিবীর প্রতি এবং বাংলা দেশের জীবন ও সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ বাংলার প্রকৃতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট। পল্লী-গ্রামকে অঙ্কিত করার ইচ্ছা সর্বজনের অভিজ্ঞতার ভাষায় সার্বজনীন। এজন্য কবিতার ছন্দ ভাষাকে অনুসরণ করেছে। সহজ সরল ভাব আঞ্চলিক শব্দ ও গ্রামীণ উপমা-উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে গ্রাম-জীবনের মহিমা এক অনির্বচনীয় কাব্যরূপ লাভ করেছে।

কবি হিসেবে মনোজ বসু কল্লোলের কাব্যাদর্শের বিপরীত মার্গে অবস্থান করছেন। মননধর্মের বিশিষ্টতা কাব্যের শরীরেও বিদ্যমান। রবীন্দ্রকাব্যের সুরধর্মিতা কবিতার কথায় অনবদ্য মহিমায় প্রকাশ পেল। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রভাবকে এড়িয়ে ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা রচনায় তিনি যে জগৎ নির্বাচন করেছেন মানসপ্রবণতার সূত্রেই তা অঙ্কিত। পল্লীর সৌন্দর্যমাধুর্যের রসাস্বাদনই ছিল কবিতাগুলির মর্মকথা।

মনোজ বসু কবিধর্মে রোমান্টিক। এই রোমান্টিক মন জানার চাইতে আস্বাদনের আনন্দে বিভোর। গভীর রাত্রে নির্জন নৈঃশব্দের মধ্যে 'যখন বাতায়ন-শিরে পূর্ণিমা-চাঁদ ঝরে' তখন কবিচিত্তও 'রূপবতী'[৬] জ্যোৎস্নায় সানন্দ অভিসার করে।

রূপবতী, আমি বসে আছি বাতায়নে
স্বপ্নের মতো এসো মোর চোখে—ভেসে এসো মোর পাশে—
আঁচল বাহিয়া গড়াক নিখিলে স্বপ্নের পারাবার।

দু' চোখের বিস্ময় এবং রূপতৃষ্ণা কবিকে রোমান্টিক সৌন্দর্যসুধা পানে অধীর করে।

রূপতরঙ্গ ছল্-ছল-ছল ছোট্ট সুতনু ভরি'।

প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ আনন্দরস আস্বাদনের অভিলাষ লীলাসহচরী জ্যোৎস্নার প্রতি তাঁকে কৌতূহলী করে তোলে।

সেই [illegible] রাত চুপ করে থাকা, রাত জাগা অকারণ…
স্বপ্ন শিয়রে একটি পলক চুরি করে চোখাচোখি…
কথা বলতাম, পাছে শোনা যায় হৃদয়ের স্পন্দন—

প্রকৃতি লীলারস বিহারিণী এবং কবির চিত্তে প্রকৃতি-নির্ভর রোমান্টিক ভাবাবেশের জনয়িত্রী মানসী প্রিয়া। অমর্তলোকের অধিবাসিনী নয় সে। আমাদের পরিচিত গৃহাঙ্গণে তার নিত্য-উপস্থিতি। তবে প্রকৃতির মতোই সে লজ্জাশীলা, নিঃশব্দ, গোপনচারিণী। 'গোপন কথা' কবিতায় কবি তার বাণীমূর্তি অঙ্কন করেছেন। প্রেমিক কবির নন্দিত চিত্তের আত্মা[illegible]নাদন নয়, এক দুর্লভ ক্ষণকে উপলব্ধি করার পরম আনন্দ প্রাণে মনে এনে জীবনের কলরোল। এক অশ্রুত জীবন-রাগিণী সুরের স্রোতে গড়িয়ে পড়েছে কবিতার চরণে চরণে।

সই কিরা কর্…পুরুষমানুষ কী ভীষণ দজ্জাল।
বাড়ি কেউ নাই, তবু লজ্জায় মুখ হয়ে গেল লাল।
দুয়ারে বসিয়া সে হাসিয়া কয়, মরি মরি—আহা মরি,
আকাশের রাঙা মেঘ কি খানিক মাখিয়াছ চুরি করি?
… … …
আর বলে কিনা—ওই যে হাসিলে লাখটাকা ওর দাম…

৬। এসো রূপবতী -বিচিত্রা, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ. ৮৩৯

উপোসীর মত তাকাইয়া থাকে, মোর মুখে অনিমিখ—

…   …   .

দূরে, বিয়াবাড়ি কত কোলাহল, বাজিতেছে ঢোল, কাঁশি,
ও কহে তখন সেই পুরাতন— ভালবাসি, ভালবাসি

এক গ্রাম্য কিশোরী বালার লজ্জা রাঙা প্রেমের চকিত স্পর্শ জীবন বৃন্তে যে নতুন কুসুম ফুটিয়েছে তারই সৌরভ মৃগনাভির মতো আকুল করে তাকে। আনন্দ বিহ্বল মনের রোমন্থন কবিতাকে করে রোমান্টিক। এই কবিতায় দাম্পত্যপ্রেমের প্রণয়-মধুরিমা আস্বাদনে কবিচিত্ত উৎসুক হলেও গার্হস্থ্য জীবনের এক অসামান্য ছবি জীবনের বাস্তব সমস্যার ইঙ্গিত করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, এবং লেখকের প্রেমস্নিগ্ধ অন্তরের মানসদৃষ্টির একটি রেখাচিত্র আঁকতে পারি। একে বলব আমরা লেখকের জীবনদর্শন। হেনরী জেমসের স্মরণীয় উক্তিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'The deepest quality of a work of art will always be the quality of the mind of the producer.'

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সমাজের হতাশা-সংশয়ের মূল্যবোধের ভাঙাচোরার ভেতর দিয়ে যে দুর্বিনীত উদ্ধত যৌবনধর্মের আবির্ভাব ঘটল বাংলাদেশে মনোজ বসুর শিল্পীমনের তাতে কোন আনুগত্য ছিল না। সংক্ষুব্ধ জীবন ও সমাজের জন্য নেই কোন চিত্তবিকার। এমন কি মানুষ পৃথিবীর কোন আঘাতেই তাঁর ভাবকেন্দ্র বিচলিত কিংবা স্থানচ্যুত নয়। বরং যুগের ব্যর্থতা হতাশা এবং অবক্ষয়ের একমাত্র সান্ত্বনা ও কামনার আশ্রয় করে, গ্রামের সরলতা ও কোমলতাকে জীবনের মধ্যে অন্বেষণ করেছেন তিনি। মনেপ্রাণে গ্রামীণ বলেই আত্মসন্তুষ্টিতে তিনি এমন নিমগ্নচেতা। লেখকের এই আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি মনের সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রাখে। অনুভূতি ও উপলব্ধিকে করে স্বতন্ত্র। স্বীকৃতি পর্বের প্রথম রচনা 'বাঘ' গল্পে লেখকের এই স্বাতন্ত্র্যদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শন নবরূপ লাভ করেছে।

বাত্তিক ছিল। দুই পুরুষের সাহিত্যচর্চার সঞ্চয় ছিল মনোজ বসুর লেখক হওয়ার পাথেয়।

অসংখ্য বাধাবিপত্তির ভেতর দিয়ে বালক মনোজ বসু ক্রমাগত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেছেন। ব্যর্থতা, হতাশা কখনো থামতে দেয় নি তাঁকে। প্রেরণা এসেছে কখনও অন্তর থেকে, কখনও বাইরে থেকে। অবাক চোখে লেখক সেই অতীতকে নিরীক্ষণ করেন :

> "অভাব-দুঃখের মধ্যে ফেলে বিধাতাপুরুষ বিস্তর মেহনত করেছিলেন বীজটুকু নিঃশেষ করে দিতে। পারেন নি। মনের তলে চাপা ছিল। সুযোগ একটুকু পেয়েছে কি অঙ্কুরোদ্গম।"[৩]

কেমন করে অসংখ্য ঘটনার সমাবেশ ও সংযোজন দৃষ্টির আড়ালে মনোজ বসুর লেখক রূপের 'অঙ্কুরোদ্গম' ঘটাল, আমরা তার পশ্চাদ্ভূমির অনুসন্ধান করব।

আত্মপ্রকাশের তীব্র ব্যাকুলতা অল্প বয়স থেকেই বালক-মনকে অধিকার করেছিল। লেখক হওয়ার স্বপ্ন ছিল দুই চোখে। বিস্মৃত সেই জীবন-অধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে লেখক বলেন :

> "তখন বছর সাতেক বয়স। বাবা বললেন, ও-ঘর থেকে বঙ্কিমবাবুর বইখানা আনতে। কে এই বঙ্কিমবাবু? বই লিখেছেন, মারা গিয়েও বেঁচে আছেন তিনি, দেশজোড়া নাম। মুহূর্তে সাব্যস্ত করে ফেললাম, আমিও বই লিখব, সকলে নাম করবে। ক্রিয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে। তক্ষুনি বসে গেলাম কলম নিয়ে। কবিতার একটা সুবিধে ছোট্ট হলেও ক্ষতি নেই—তাই কবিতা শুরু করলাম। ওরে বাবা, তরু—সরু—মরু—নরু কর গুণে গুণে মিল খুঁজতে প্রাণান্ত। সমস্ত বেলা ধরে চারটে লাইন দাঁড়াল। সেই আমার প্রথম লেখা।
>
> সেই থেকে গল্প আর কবিতা পড়ার ভীষণ নেশা ধরে গেল। অভিভাবকের চটির আওয়াজ পেলেই গল্পের বই চকিতে পাঠ্যবইর নিচে ঢোকে। লেখাও চলেছে একটুআধটু। খুব সামাল হয়ে লিখতে হয়, লিখেই বার কয়েক পড়ে ছিঁড়ে ফেলি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাহসও

৩। কেমন করে লেখক হলাম—[illegible] জগৎ।

বাড়তে লাগল। কবিতা লিখে তখন আর আশ মিটছে না, গল্পও ধরেছি।"[4]

হারিয়ে-যাওয়া অনুভূতিগুলোর গভীরতা মাখানো রহস্য লেখক-জীবনের অনুদ্ঘাটিত ইতিহাসের দ্বারোদ্ঘাটন করে।

কিন্তু নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে বালক মনোজের সাহিত্য-চর্চায় বিধাতাও বাদ সাধলেন। নির্মম অদৃষ্ট আট বছর বয়সে লেখককে করল পিতৃহীন (১৩১৬ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় মাস)। পাঠশালার গণ্ডী শেষ হয় নি তখনও। লেখক হওয়ার সাধ, স্বপ্ন, বাসনা সব-কিছুর ওপর পড়ল যবনিকা। পিতার আকস্মিক মৃত্যু সংসারকে অনাথ করে দিল। বালককে করল অসহায়। এক দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন কাটতে লাগল। চারদিক থেকে "অভাব-অনটন আষ্টেপৃষ্ঠে চাবকাতে লাগল।" গোটা পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম। বালক মনোজকে গ্রাম ছেড়ে আসতে হল কলকাতায়। তখন তাঁর বয়স তেরো-চোদ্দ বছর। এখানে এসে তিনি ভর্তি হলেন রিপন কলেজিয়েট স্কুলে।

১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অনেকগুলি লেটার সহ ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করলেন। এর পর কলেজে পড়ার কথা ভাবছেন। কিন্তু গরিব ছেলের অনেক সমস্যা। তীব্র আর্থিক সংকটের কথা ভেবে নব-প্রতিষ্ঠিত বাগেরহাট কলেজে ভর্তি হলেন। ভাল ছেলে হওয়ায় সেখানে আর্থিক সুযোগ সুবিধে পেলেন বেশি। বিজ্ঞান পড়ার সাধ ছিল মনে। স্বপ্ন ছিল ডাক্তার অথবা নাম করা ইঞ্জিনীয়ার হবেন।[5] কিন্তু নতুন কলেজ বাগেরহাটে তখনও বিজ্ঞান খোলা সম্ভব হয়নি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে ভর্তি হলেন কলা বিভাগে। এই বাগেরহাট কলেজে এসে রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হলেন তিনি। প্রবল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিন নিজের অজ্ঞাতেই জড়িয়ে পড়লেন তার সঙ্গে।

মূল-প্রেরণা অবশ্য পেয়েছিলেন পিতা রামলাল বসুর কাছ থেকে। মনোজ বসুর জন্মের কয়েক বৎসর পরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিলাতি দ্রব্য বর্জনের বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ হল। রামলাল বসু সেই বিপ্লবান্দোলনের একজন সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। গ্রামেও এই ...

৪। গল্প লেখার গল্প— জ্যোতিপ্রসাদ বসু সংকলিত। পৃ. ৬৭।

৫। লেখকের কাছে বসে শোনা।

তিনি সভা সমিতি করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। পিতার সঙ্গে বালক মনোজও মাঝে মাঝে যেতেন সেই সব সভায়। [illegible] দেশাত্মবোধ [illegible] প্রাণকে সুকঠিন আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করত। [illegible] রাজনৈতিক [illegible] সংগ্রামবিমুখ হয়ে থাকেন নি। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী [illegible] অসহযোগ আন্দোলনের ডাক এসে মনোজ বসুর ভাবাবেগ [illegible] তুলল। আই. এ. পরীক্ষার ফি দেওয়া বন্ধ রেখে মহাত্মার ডাকে [illegible] বেরিয়ে পড়লেন তিনি। ছাত্রদের মুখপাত্র হয়ে বক্তৃতা করলেন [illegible] নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। মিছিল নিয়ে পথে পথে ঘুরলেন। [illegible] রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না তাঁর। স্বাধীনতা-সংগ্রামের [illegible] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্রবে আসার কিঞ্চিৎ সুযোগ হয়েছিল এই সময়। গ্রামে গ্রামে শরীরচর্চা, গুপ্তসমিতি স্থাপন [illegible] [illegible] ছড়িয়ে পড়েছিল। অহিংস রাজনৈতিক [illegible] [illegible] থাকলেও মনোজ বসু চরমবাদীদের সমর্থক ছিলেন। প্রত্যক্ষ রাজকর্ম [illegible] না করলেও নানারকম খবর সরবরাহ করতেন তিনি। [illegible] আগস্ট আন্দোলন পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে মোটামুটি [illegible] সংযোগ ছিল তাঁর। খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও রাজনৈতিক জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার ফসল জমা হয়ে আছে তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে। ভুলি নাই সৈনিক আগস্ট ১৯৪২, বাঁশের কেল্লা প্রভৃতি উপন্যাস তার দৃষ্টান্ত। যথা সময়ে এগুলি আলোচনা করা যাবে।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম জোয়ার কেটে গেলে কলেজে ফিরলেন আবার। [illegible] বছর পরে আই. এ পরীক্ষায় পাশ করলেন (১৯২২ সালে)। সাউথ সাবারবন কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে যথাসময়ে বি. এ. (১৯২৪) উত্তীর্ণ হলেন ডিস্টিংশন নিয়ে। অতঃপর আইন পড়া শুরু করলেন। এই সময় সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে পেলেন সহপাঠী রূপে। শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্যের জন্য পড়া বন্ধ করতে হল। তাড়াতাড়ি একটা কাজ চাই। আরম্ভ করলেন শিক্ষকতার কাজ ও পাশাপাশি চলল স্কুলপাঠ্য বই লেখা। কঠোর সংগ্রামময় এই দিনগুলি লেখকের জীবনস্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে আছে।

৬। "[illegible] দায়ে টেক্সটবুকও লিখতে হয়েছে। আরও অনেক কিছু।" —বেতার জগৎ

"বি. এ. পাশ করে মাস্টারি জুটিয়ে নিলাম একটা ···ক্লাসে ক্লাসে টোপ ফেলে ট্যুইশানি···গেঁথে ফেললাম সাত-আটটা। বিদ্যাদানের অষ্ট-প্রহরী মচ্ছব চলল, ভাবতে গিয়ে আঁতকে উঠি এখন। শেষরাত্রে আকাশে শুকতারা এবং রাস্তায় গ্যাসের আলো—আমার পয়লা ট্যুইশানি তখনই শুরু হয়ে গেছে। চলল একের পর এক—ছুটোছুটি এ-বাড়ি থেকে সে-বাড়ি। দিন মাস বছর সড়াক সড়াক করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে দীর্ঘশ্বাসটাও ছিল মুহুর্মুহু ; জীবনের অপচয়, এ নাগপাশ কেটে বেরিয়ে পড়ব। বেরোবই—দিনান্তে মনে মনে আউড়ে নিতাম।"৭

দারিদ্র্য মনোজ বসুকে পরাভূত করেনি। ক্ষয় করতে পারেনি জীবনী-শক্তি। অদম্য উদ্যম নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষেছেন। এই সংগ্রাম করার ক্ষমতায় মনোজ বসুর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল অপরাজেয় মনোভাব। সব দুঃখকষ্ট তিনি হাসিমুখে মানিয়ে নিয়েছেন জীবনে। নির্লিপ্ত নিরাসক্তিতে মন প্রশান্ত ছিল বলেই আঘাত সংঘাতে কখনো ভেঙে পড়েন নি। এই অনাসক্তি তাঁর সৃজনী-চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছে। দৈন্যের নামাবলীখানি নিজেরই অজ্ঞাতে জড়িয়ে দিয়েছেন রচনার সঙ্গে।

মনোজ বসুর সাহিত্যচিন্তা তাঁর জীবনচর্চার একান্ত অনুগামী হয়ে দেখা দিয়েছে। জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে সাহিত্যচিন্তার প্রতিফলন। তাই দেখি, দুঃখমুক্তির সংকল্প লেখককে পরম আশাবাদী করেছে। আশাবাদ প্রবলতম হয়ে উঠেছে তাঁর সমস্ত রচনায়। প্রতিকূল অবস্থাকে প্রসন্নচিত্তে উপেক্ষা করার আশ্চর্য প্রশান্তি থেকে লেখক যে অনুভূতি লাভ করেছেন তা-ই তাঁর জীবনআত্মার এক পরম প্রাপ্তি। শিশির (সেতুবন্ধ), দীপ (রানী), অরুণেন্দু (আমি সম্রাট) প্রভৃতি চরিত্রগুলোয় দেখি দুর্ভাগ্যকে তারা সহজভাবে মেনে নিয়েছে। দুঃখ-মুক্তির জন্য ভাগ্যের সঙ্গে তারা সংগ্রাম করে। দুঃখ-জয়ের সাধনার মধ্যে নেই কোন কাল্পনিকতা কিংবা আদর্শবাদ সৃষ্টির মোহ। কণ্টকিত কৃচ্ছ্র জীবনপথের অভিনব অভিজ্ঞতাগুলি লেখক-মনে এনে দিল তাদের realise করার প্রবল ক্ষুধা। গল্পে উপন্যাসে লেখক বিচিত্র রামধনু এঁকেছেন, সৃষ্টি করেছেন রোমান্টিক কাব্যের জগৎ। এই মানসিকতার মূলে রয়েছে এক ধরনের উদার উদাস নির্লিপ্ত প্রসন্নতা।

৭। লেখকের জন্ম—উল্টোরথ। পৃ. ২২২

"আমার সাহিত্যজীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের কোন বিরোধ কখনো ছিল না, আজও নেই। পরিবারের মধ্যে এখন আমি থাকি একরকম উদাসীন।"৮

তথাপি, মানুষের দুঃখজর্জর জীবনের ব্যথা-বেদনা-হতাশা, দৈবের নিষ্ঠুরতা, মানুষের নির্মমতা তাঁকে অভিমানী করে। বাইয়ের ঘটনা শান্তিপূর্ণ জীবনকে বিচলিত করে তোলে।

"অবিচার দেখে বিচলিত হয়ে ওঠি, প্রতিবাদ জানাতে চাই। যোদ্ধা হলে মেশিনগান নিয়ে ছুটতাম, চাষীমজুর হলে ঘরে বসে বউ ঠেঙাতাম, শিশু হলে কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম।"৯

মনোজবসুর গল্প ও উপন্যাস এই হৃদয়-দাক্ষিণ্যে আবেগবিহ্বল। কখনো কখনো শিল্পসৃষ্টির পথে এই আবেগ অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। প্রৌঢ় বয়সের সীমান্তে এসেও লেখকমনের এই অস্থির বিচলিতভাবের পরিবর্তন হয় নি। সম্প্রতিকালের অনেকগুলি রচনাতে তার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

আবার আমরা পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে আসি। জীবনের দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও সাহিত্য-চর্চা বাদ পড়েনি। খ্যাতি তখনও মেলেনি, সাহিত্যের মৌচাকে মধুগুঞ্জন করে দিন কাটে।

"ইতিমধ্যে ছোটখাট একটা বন্ধুচক্র গড়ে উঠেছে আমাদের, সবাই কিছু না কিছু লেখেন। বাইরে পাঠকের অভাবে এ-ওর পিঠ চাপড়ে তারিপ করি।"১০

স্কুলে পড়ার কালে কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু মিলে একটি "হস্ত-মুদ্রিত পত্রিকা" প্রকাশ করতেন। তারপর, "বিকাশ" নামে একটি পত্রিকার সংস্রবে আসার সুযোগ ঘটলো। ক্ষুদ্রকায় ডিমাই সাইজের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই মনোজ বসু লিখতে আরম্ভ করলেন। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় লেখকের একটি গল্প প্রকাশিত হল। নাম "গৃহহারা"— লেখক মনোজ মোহন বসু। বাঁশরীর পৃষ্ঠাতেও ঐ নামে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পিতৃদত্ত নামের মধ্যপদ লোপ করে পরে তিনি মনোজ বসু হলেন। মনোজ মোহন বসু নামে তখন আর এক লেখক ছিলেন, 'রেশমি

৮। ধ্বনি—২৪শে আগষ্ট ১৯৬৮

৯। কাছে বসে শোনা—ভবানী মুখোপাধ্যায়। অমৃত—১১শে কার্তিক ১৩৭২

১০। গল্প লেখার গল্প—পৃ—৭০

রুমাল'*ইত্যাদি তাঁর বই— দুই নামে গোলমাল না হয়, সেইজন্য নাম-সংক্ষেপ।

বাগেরহাট কলেজে ছাত্র থাকা কালীন, পাঁচজন সাহিত্যপ্রিয় বন্ধু মিলে একটি বারোয়ারি উপন্যাস রচনা করলেন। তার কোন নিদর্শন আজ নেই, লেখকের স্মৃতিতে আছে কেবল।

মোটামুটি ভাবে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে তিনি সাহিত্যিক-খ্যাতির অধিকারী হন। এই যশোলাভের নেপথ্যে যাঁরা আছেন, লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কথা (আত্মকথন-মূলক রচনায়) বারবার উল্লেখ করেছেন। একজন হলেন কল্লোলের সুখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বাগচী এবং অন্যজন সুবল মুখোপাধ্যায়।[১১] কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে (বিধান সরণী) বাগচী এণ্ড সন্স'এর বইয়ের দোকানে কয়েকজন নাম-করা লেখক ও শিল্পী নিয়ে ছোটখাট এক সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে উঠেছিল, মনোজ বসু সেখানে প্রায়ই যেতেন। বঙ্গশ্রীর[১২] সাহিত্য-মজলিসেও তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রায় প্রতিদিন। এই সব সাহিত্যসভায় মনোজ বসুর শিল্পী-সত্তার উদ্বোধন।

> "ওদের আসরে আমার কাজ গল্প-কবিতা-নাটক শোনা। ... কোন সূত্রে জানি না হেম টের পেয়েছেন, আমি···চোরাগোপ্তা লেখার অভ্যাস রাখি "[১৩]

একদিন তিনিও গল্প পাঠ করেন বাগচী এণ্ড সন্স'এর আড্ডায়। পরিণত লেখনীর লিপি-কুশলতা ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সাহিত্যরসিক সুবল মুখোপাধ্যায় লেখকের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনাময় প্রতিভার অস্তিত্ব বুঝে বিস্মিত ও অভিভূত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন মানুষের আগমন উপলক্ষ করে সুবল মুখোপাধ্যায় গল্পের আসল নাম "পিছনের হাতছানি" বদলে "নতুন মানুষ" নামকরণ করলেন। বন্ধুজনের উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রশংসায় চিহ্নিত হল আত্মপ্রকাশের দুর্গম পথ।

১১। সুবল মুখোপাধ্যায় "নিজে একচ্ছত্র লিখতেন না, কিন্তু অমন নির্ভেজাল সাহিত্য-প্রীতি দেখিনি অন্য কারো। কোন একটি লেখকের বিশেষ অনুরাগী হয়ে সর্বক্ষণ সাথেসঙ্গে ঘুরতেন।"—উল্টোরথ—১৩৮৫ *কাব, পৌষ।

১২। স্মৃতিচিত্রণ-(১ম)—পরিমল গোস্বামী।

১৩। কাছে বসে শোনা—অমৃত।

একটি কবিতা[১৯] কোথায় ছাপার অক্ষরে পড়েছে। বিষম ভাল লেগেছে তার। যাকে পাচ্ছে শোনাচ্ছে এবং সারা কলকাতা কবিকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কী উল্লাস আমায় পেয়ে!"

গ্রাম-জীবনের মূল্য আবিষ্কার করার দুর্নিবার আগ্রহ মনোজ বসুর শৈশব থেকেই। গ্রাম তাঁর কাছে চির-কৌতূহলের। এই সব গ্রাম অবশ্যই তাঁর জন্মভূমি অঞ্চলের। আবাল্য পরিচিত এইসব গ্রামের গাছপালা, মাটি, জল, নদী, খাল, বিল, মানুষের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর বন্ধন। গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ, নিসর্গ-শোভা সৌন্দর্যের মনোহারিত্ব মনোজ বসুকে শুধু অভিভূত করেনি, হৃদয়ের সেই অনুরাগ শিল্পীর মনোভূমিতে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে অধীর। লেখকের সমস্ত রচনার পশ্চাতে সেই মানসিকতা সক্রিয়। লেখক নিজেও তা উপলব্ধি করেন ঃ

"পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বাড়ির সামনে বিল। ছেলেবয়স থেকে ঋতুতে ঋতুতে বিলের রূপ বদলানো দেখেছি। চৈত্র-বৈশাখে ক্রোশের পর ক্রোশ ধূ ধূ করে। রাত্রিবেলা বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতাম, দূরে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। আলেয়া নাকি ঐগুলো। কল্পনা করতাম, কালো কালো ভয়াল অতিকায় জীব বিলের অন্ধকারে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে শিকার ধরবার আশায়। হাঁ করছে, আর আগুন বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। ...পথিক গ্রামের আলো ভেবে ছোটে সেদিকে।...আতঙ্কে চেতনা বিলুপ্ত হয়। আলেয়ার দল তখন চারিদিক থেকে ঘিরে এসে ধরে।

এই ভয়ংকর বিল বর্ষায় সবুজ সজল স্নিগ্ধ। ...ধানবনের ভিতর হঠাৎ চাষীর গলায় গান ভেসে আসে—সখিসোনার প্রেমকাহিনী।

আবার প্রথম শীতে পাকাধানে বিলের গেরুয়া রং। বাঁক বোঝাই ভারে ভারে ধান নিয়ে আসছে, ঘরে ঘরে পালপার্বণ ভাসান-কবি-যাত্রাগান। ঢোল বাজছে এ-পাড়া ও-পাড়ায়। ধান খেয়ে খেয়ে ইঁদুরগুলো.অবধি মুটিয়ে সারা উঠোন ছুটোছুটি করছে।

এই বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষগুলো তাদের দুঃখসুখ, আশা-উল্লাস নিয়ে আমার মন জুড়ে রয়েছে। বিশাল বাংলাদেশকে চিনেছি আমি এদের মধ্য দিয়ে। ...আলাদা ছিলাম না তাদের থেকে। ..গল্প লিখতে গেলে প্রতিটি ছত্রে তারাই এসে উঁকিঝুঁকি মারত। এমনি

১৯। "গোপন কথা" নামক কবিতা।

করে তাদের মানসসান্নিধ্য লাভ করতাম আমি, ...চোখের কত অশ্রু অন্তরের কত উল্লাস মিশিয়ে যে আমার সে আমলের গল্পগুলোর সৃষ্টি।[২০]

গ্রামীণ জীবনের এই রহস্য ও বৈচিত্র্য লেখককে দিয়েছে মানুষ সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মধুর শিল্পকর্মের পাশাপাশি মৌল শিল্পধর্ম রূপে উপস্থাপিত হয়েছে লেখকের প্রকৃতিপ্রেম, রোমান্টিক কল্পনা, আধিভৌতিক বিশ্বাস এবং অতিপ্রাকৃতের ছবি। মানুষের মতো সমগ্র গ্রামবাংলার পরিবেশ যেন এক একটি চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। শঙ্খপাকের মেয়ে, জলজঙ্গল বন কেটে বসত, ছবি আর ছবি উপন্যাসগুলিতে তার দৃষ্টান্ত।

এই গ্রাম-অনুরক্তির কারণ হয়তো স্পর্শকাতর কিশোর-হৃদয়ের উপর প্রথমবিশ্বযুদ্ধ-জনিত প্রবল অভিঘাত। নিজের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা থেকে জীবনের মূল্যবোধগুলি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাই তাঁকে গ্রামমুখীন হওয়ার প্রেরণা দিয়ে থাকবে। গ্রামের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে মানোজ বসুর আস্থাবান চিত্তভূমি খুঁজে পেয়েছিল এক নিরাপদ আশ্রয় প্রত্যয়দৃপ্ত জীবন।

গ্রামপ্রীতির মূলে লেখকের গ্রামকে জানার ও চেনার বিশেষ আগ্রহ। প্রথম যৌবনে স্বদেশী শিক্ষাব্রতে নানা গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর সময় বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ লাভ করেছেন। দেখেছেন তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। শিল্পীমনে সেই ছাপ গভীর রেখায় অঙ্কিত হয়ে গেছে। জসীমউদ্দিনের বন্ধুত্ব লেখককে উদ্বুদ্ধ করেছে চিরাচরিত শিল্পসংস্কৃতি ও জীবনধারার সন্ধানে গ্রামকে দেখতে ও অন্বেষণ করতে।

> "গ্রামকে আগে চেনা দরকার। আমাদের দেশের মানুষ গ্রামে গ্রামে ছড়ানো। তাদের বাদ দিয়ে কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না। গ্রামোন্নয়নের প্রয়োজন বুঝেছি আমি অল্প বয়স থেকে।"[২১]

এই চিন্তা ও চেতনা লেখককে গ্রাম সম্পর্কে কৌতূহলী করেছে। লোকচক্ষুর অগোচরে পল্লীর অমূল্য সম্পদ ও সংস্কৃতির অন্বেষণ এবং সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গপ্রেমী গুরুসদয় দত্ত। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ১৩৩৭ সালে বীরভূমে "পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি"

২০। গল্প লেখার গল্প—পৃ ৭০,
২১। কাছে বসে শোনা অমৃত

প্রেম বাইরের কোন বস্তু নয়, একেবারে অন্তরের। সর্বদেহ-মন দিয়ে লেখক উপলব্ধি করেন তাকে। অনুভব করেন জীবন ও প্রকৃতির প্রাণ-প্রবাহের মধ্যে। মাটির কাছাকাছি মানুষগুলোর মধ্যে প্রকৃতি এখনো সজীব। তাদের কথাবার্তায় আচার-আচরণে জীবনধর্মে প্রকৃতির স্বভাব-ধর্ম এখনও অটুট। 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে 'বাদাবনের বাঘ হল কেতুচরণ।' এই বাদাবনে 'মানুষ ও জীব জানোয়ারের তফাৎ নেই—তার নিতান্ত আপনাআপনি।' কেতুর তো জগন্নাথও (বন কেটে বসত) বাদারাজ্যে স্বচ্ছন্দ ও নির্ভীক। 'সৈনিক' এর বিনোদ জলে বিলে অনুরূপ নিঃশঙ্ক। প্রকৃতিধর্মিতায় এই চরিত্রগুলি বেড়ে উঠেছে—একাত্ম হয়েছে প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে। মানুষ ও প্রকৃতি মিলে সম্পূর্ণ করেছে প্রকৃতিবৃত্ত। প্রকৃতির রঙে রূপে তাদের সর্বদেহ ধূলি-ধূসর, সবুজ, শাদ্বল। খাল-বিল প্রভৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানবচরিত্র অঙ্কন করেছেন বলেই গল্পে উপন্যাসে ফুটে উঠেছে আঞ্চলিক রঙ, গণজপ্রবাহ এবং গ্রামীণ সার্বভৌম রূপ। পল্লীপ্রাণ এই লেখকের পক্ষে পল্লীবিচ্ছিন্ন হওয়া একেবারেই দুঃসহ।

> 'আমাদের বড়ো ক্ষোভ, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি বলে। সর্বদাই মনে হয় যে এখানে আমি প্রবাসী, আমি একজন বহিরাগত।"[২৬]

লেখকের এই মনোবেদনা থেকেই 'ছবি আর ছবি' 'পথ কে রুখবে?'-র জন্ম। গ্রামের সঙ্গে নিবিড় হয়ে মিশে যাওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসদ্বয়ে এক চিত্তদাহী বেদনার সৃষ্টি করে।

শিল্পীমানসের যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সংক্ষেপে সেগুলি হল লেখকের রোমান্টিক-প্রবণতা, প্রকৃতি-চেতনা, অতীতাসক্তি, গ্রামজীবনের প্রাধান্য, উদার উদাস নির্লিপ্ত প্রসন্নতা, এবং আশাবাদ। এরই মধ্যেই লেখকের ব্যক্তিত্ব ফুটেছে।

২৬। ধ্বনি—২৪শে আগষ্ট ১৯৬৮। পৃ ১২৭১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্রষ্টা ও সৃষ্টি ঃ

'নতুন মানুষ'এ (বিচিত্রা, কার্তিক-১৩৩৭) প্রথম পদক্ষেপ হলেও প্রকৃতপক্ষে 'বাঘ'ই মনোজ বসুর কৃতিত্বের পরিচয়পত্র—এতেই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। 'বাঘ' সম্বন্ধে লেখকের একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে। প্রসঙ্গ উঠলে শিশুর মত খানিকটা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। হৃদয়ের মধ্যে জেগে ওঠে বিগত দিনের একটি উজ্জ্বল মুহূর্ত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখক যেন একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন, আর লাভ করেন এক ধরনের তৃপ্তি।

একদিন দুরু দুরু বুকে আঁকাবাঁকা সিঁড়ি পেরিয়ে প্রবাসীর দোতলা অফিস ঘরে উপস্থিত হলেন 'বাঘ এর খোঁজ করতে। কিছুকাল পরে সেখানে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত নাটকীয় ঘটনা।

> "আড্ডা দিচ্ছেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস হেমচন্দ্র বাগচী বললেন এই ভদ্রলোকের একটা গল্প বেরিয়েছে এবার।
>
> গল্প—কোন গল্প ?
>
> বাঘ—
>
> আর যাবে কোথা। ধরময় কলরব উঠল বাঘের লেখক উনি ? বিভূতিদা উঠে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দস্তুরমতো আলোচনা হয়েছে গল্পটা নিয়ে। তখনকার দিনে এমনি হত—নতুন লেখক বলে অবহেলা করতেন না পূর্বোবর্তীরা। অশোক চট্টোপাধ্যায় বলবান পুরুষ—হাত ধরে হিড-হিড করে কেন্দ্রস্থলে টেবিলের ধারে নিয়ে এলেন। সে টেবিলে শালপাতার ঠোঙায় ডালপুরি তেলে-ভাজা ইত্যাদি। আমাকেও বসানো হল সেই জায়গায়। একটি গল্পের দৌলতে বড় বড় লেখকদের সঙ্গে ঠোঙা থেকে তেলে-ভাজা আহারের অধিকার বর্তে গেছে। অতএব নিখুঁত ষোলআনা সাহিত্যিক আমি একটি লহমার মধ্যে।" (উল্টোরথ পৌষ, ১৮৮৫ শকাব্দ)

লেখক-মনের এই আত্মপ্রসাদ আলোচনার ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রয়োজন নয়। তাঁর সম্ভাবনাময় লেখক-সত্তাটি যে বাংলাসাহিত্যে চিহ্নিত হতে পেরেছিল

এ কেবল তারই ইতিহাস। শুধু তাই নয়, প্রগাঢ় হৃদয়ানুভবের দর্পণে পড়েছে মনোজ-মানসের প্রতিফলন। "নতুন মানুষ" বা "পিছনের হাতছানি" গল্পের গিরিজাকে লেখকের প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়। দর্পণে মানুষ যেমন আপনাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তেমনি গিরিজাও অতীতের মধ্যে নানাভাবে খোঁজে আপন অপরাজেয় পৌরুষকে। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে যে আপন ভাগ্যকে জয় করার সাফল্য অর্জন করেছে এবং পুত্রকন্যা-পরিবার সহ শান্তি-সুখের সচ্ছল সংসারজীবনে যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সার্থক-রূপে—গিরিজা তাকে অনুভূতির মধ্যে আরো নিবিড় করে পেতে চায়। তাই কথায় কথায় পুরাতনের আবৃত্তি তার ভাল লাগে, ভাল লাগে সকলকে তার সুখের অংশ বন্টন করে দিতে। শীতের ভোরের রোদ্দুরের মতো একটা মিষ্টি মোহ জড়িয়ে আছে এই গল্পের সারা অঙ্গে।

পূর্বালোচনায় ফিরে এসে বলি, গিরিজার আত্মপ্রসন্নতার সঙ্গে পূর্বোক্ত লেখকের প্রশান্ত পরিতৃপ্তির কোন প্রভেদ নেই। মনোজ বসুর মনোজীবনের তৃপ্তির সূত্রেই যেন গিরিজার মানসপ্রসন্নতা গাঁথা। স্রষ্টা ও সৃষ্টি মিশেছে একই সরলরেখায়। কল্যাণস্নিগ্ধ সত্যসুন্দর জীবন-মহিমা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন বলেই শিল্পী ও শিল্পের সমন্বয় এমন অভূতপূর্ব। আরো আশ্চর্য এই যে, প্রথম বয়সের রচনাই স্পর্শ করে লেখকের মানসদিগন্ত। অতীতপ্রবণতা, রোমান্টিক ভাব-বিহ্বলতা, গ্রামপ্রীতি, গার্হস্থ্য জীবনধর্ম, দাম্পত্যপ্রণয়ের মাধুর্য, বাল্যপ্রণয়ের রোমান্স—সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মনোজ-মানস—লেখকের জীবনদর্শন।

দ্বিতীয় উদ্যম 'বাঘ' গল্পেও দেখি, অত্যন্ত সামান্য সাধারণ ঘটনা হয়েছে এর বিষয়বস্তু। গ্রামোফোন যন্ত্রের আকস্মিক আগমন উপলক্ষ করে গ্রামের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবননদীতে যে ঢেউ জেগেছে, গল্পের পরিধিতে তার তরঙ্গগুলি ধরে রাখার নিপুণতা বিভূতিভূষণকে ও অন্যদের মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল।

গ্রামোফোনের প্রতি সাধারণ কৌতূহলকে মধ্যবিন্দু করে পল্লীর বিচিত্র জীবনকাব্য রচনা করা গল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রামের পরিবেশে গ্রাম্য-মানুষদের আচার-আচরণ ও স্বভাবের যে ছবি শিল্পী আঁকলেন, তাতে মানুষেরাই প্রত্যক্ষ হল, গতানুগতিক প্রথাবদ্ধ সমাজজীবনের কোন প্রতিফলন পড়ল না। আচারসর্বস্ব সমাজ রইল মানুষের বাইরে। সেই কালের সাহিত্যিক-প্রবণতা ছিল প্রত্যক্ষ সমাজপ্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করে সাহিত্য সৃষ্টি করা। প্রথম রচনা থেকেই মনোজ বসু সাধনায় সিদ্ধপুরুষ।

গ্রামজীবনের এই সহজ সরল সুন্দর দিকটা সাহিত্য-কুলগুরু রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনায় মমতামাখানো অনুভূতির নিবিড়তায় অনুরাগসিক্ত। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল নদনদীবিধৌত গ্রামবাংলার বিস্তৃত ভূখণ্ড, প্রান্তর, বনানীশোভিত নিসর্গরাজ্য এবং নরনারীর জীবনে নিহিত এক অপার প্রশান্তি, সহজ সরল জীবনযাপনের নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—

> "আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রুসজল ভাবঘন গোপনপ্রবাহ আছে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত ও মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।"[১]

রবীন্দ্রনাথের মতো কবিমনের তীব্র আবেগ দিয়ে মনোজ বসু জীবনকে দেখেন নি। কিংবা জীবনের গভীরতর তলদেশে অবতরণ করে তাব অনুধ্যান করেন নি। ছোট ছোট জীবনের সহজ সরল অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর জীবন-উপভোগের কেন্দ্রবিন্দু। উপভোগকে প্রধান করেই সমস্যার আয়তরেখাটি যে স্পষ্ট করে তোলা যায়, মনোজ বসুর রচনাগুলি তার দৃষ্টান্ত।

জীবন উপভোগের জন্য যেমন সরস মনের দরকার তেমনি দরকার বাস্তব জ্ঞান। বাস্তব-সচেতন মনোজ বসুর রোমান্টিক মন রবীন্দ্রনাথের মতো বস্তু-পৃথিবীর কামনা-বাসনা উপেক্ষা করে কল্পনার ভাবলোকে বিচরণ করে না। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি—জীবনরসের রূপকার। তাই বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। গল্প বলার ক্ষেত্রে তাঁর আর্টটাই মুখ্য বিষয়বস্তু গৌণ।

কিন্তু মনোজ বসুকে ঘটনার উপভোগ্যতাই বেশি আকৃষ্ট করে। জীবনের দীনতা, হীনতা, কুশ্রীতাকে অন্তরের ঔদার্য দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মন কোথাও ক্ষুব্ধ প্রতিবাদে উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। শরৎচন্দ্রের মতো পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ, বিদ্বেষ, ঘৃণা নিয়ে কোন চরিত্র সৃষ্টি করেন নি তিনি। আঁকেন নি কুটিল হিংসুটে মানুষের ছবি, কিংবা পল্লীসমাজের আপোষহীন পাপচক্র। নীতি সমাজ বা ধর্মসম্পর্কে কোনরকম প্রশ্ন উত্থাপনের উদ্দেশ্যও নেই তাঁর।

মনোজ বসুর রচনায় স্রষ্টার আনন্দই প্রধান। উপদেশ-দান বা হিতসাধন

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

করার কোন সংকল্প নেই তাঁর। পাঠককে তিনি কি দিতে পারলেন, সে বিচার তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত নয়। তিনি স্রষ্টা। সৃষ্টিসুখের উল্লাস-উপভোগই তাঁর একমাত্র চরিতার্থতা। শিল্পী হিসেবে মনোজ বসু তাই আস্বাদনপন্থী। অনাড়ম্বর ভোগের আয়োজন মাধুর্যময় বলেই লেখক সংক্ষুব্ধকালের প্রশ্নজর্জর জটিল কালসত্তাকে তেমন ভাবে রচনার বিষয়ীভূত করেন নি। মানুষের সমস্ত সাজসজ্জা খসিয়ে দেহমনের এবং সমাজের নগ্নরূপকে উৎকটভাবে দেখানোর আগ্রহ নেই তাঁর। হাতের আলতো ছোঁয়ায় টেনেছেন দু-একটি রেখা, তাতেই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়েছে সমাজের রূপ।

অল্প কথায় দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ভিতরের ও বাইরের গ্লানির যে ছবি শিল্পী আঁকলেন, তাতে জীবন ও সমাজের দুটি দিক ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'বাঘ' গল্প প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিকে আছে ইংরেজের কল্যাণকর শক্তির সম্পর্কে উনিশ শতকীয় বাঙালীর বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও মোহের ভাব, অন্য দিকে আছে যন্ত্রের অত্যাশ্চর্য মোহিনী ক্ষমতার সম্পর্কে বিস্ময় এবং মানুষের যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতার এক বেদনাময় ইতিহাস। তিনকড়ির কণ্ঠে যুগপৎ বেদনা ও বিস্ময়ের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়েছে সেই গ্লানিভরা নির্মম জীবনসত্য :

> "ও যে কোম্পানীবাহাদুরের কল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? গোটা জেলাটা ওদের রাজ্য, আর আমি ব্রহ্মোত্তরের খাজনা পাই মোটে একান্নটাকা সাত আনা।"

বিক্ষত মানুষকে স্বর্গীয় সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস রচনার মধ্যে এক অনবদ্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। বিশিষ্ট অন্তরপ্রবণতা লেখককে গ্রামের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, জ্ঞাতি-বিরোধ, পারস্পরিক ঝগড়া, গ্রাম্য কলহের নীচতা-কুশ্রীতার প্রতি নিস্পৃহ নিরাসক্ত করেছে। তাঁর পাত্র-পাত্রীরা সরল সাদাসিধে, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার শরিক। ছোটখাট সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও একটুখানি হৃদয়ের উত্তাপ নিয়েই তারা সন্তুষ্ট।

মনোভূমির এই নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্তি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও আছে। মনোজ বসুর সঙ্গে তাঁর শিল্পধর্মের মিল সুগভীর। দু'জনেই আজন্ম গ্রামপ্রেমিক—যদিও এই গ্রামপ্রীতির মূলে রয়েছে নাগরিক জীবনের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস। নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতায় অবসন্ন অনুভূতিগুলি অনাবিল শান্তির তৃষ্ণায় অধীর।

অরণ্য-জীবনের সংস্পর্শে এসে বিভূতিভূষণ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, অপুর জীবনভাবনায় তাই তিনি ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন :

> "এই সব (মধ্যভারতের জনহীন অরণ্য) নির্জন স্থানে অপু দেখিল মনের ভাব সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়। শহরে বা লোকালয়ে যেমন আত্ম-সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকে, ambition লইয়া ব্যস্ত থাকে, এখানকার উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় সে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা, অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়।"

মনোজ বসুর "আমার ফাঁসি হল" উপন্যাসে 'আমি' চরিত্রের মধ্যেও অনুরূপ নগর-বিতৃষ্ণা দেখি।

> "কী আশ্চর্য। এ আমার কেমন হল, এত পেয়ারের শহর—এখন যে একটা দিনেই হাঁপ ধরে আসে।...লোকে কেমন করে শহরে কাটায় আঁটো-সাঁটো মাপের জীবন নিয়ে।"

জীবিকার প্রয়োজনে শহরে বাস করলেও গ্রাম উভয় লেখকের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। চির-চেনা গ্রাম তাঁদের দৃষ্টিপটের সম্মুখে রোমান্টিক স্বপ্নের জগৎ রচনা করে।

জীবন-উপভোগের দিকটা উভয়ের কাছেই প্রধান। তাই সামাজিক বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের বিষজ্বালা বুনে নিয়ে গল্প রচনা করেননি তাঁরা। নীতি সমাজ বা ধর্মসম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে উপভোগের ব্যাঘাত ঘটাননি তাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি অনুভূতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিভূতিভূষণের প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস তাঁর "আত্মস্মৃতি ২য় খণ্ড" গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা মনোজ বসুর ক্ষেত্রে, সমভাবে প্রযোজ্য

> "আমরা দীর্ঘবিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যাহা করিতে পারি নাই, বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যের সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।"

আলোচ্য কথাশিল্পীদ্বয়ের প্রতিভা মূলতঃ গ্রামকে অবলম্বন করেই বিকশিত। পল্লীর প্রাণলীলার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে লেখকদ্বয়ের পল্লীপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি। প্রকৃতি ও মানুষ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁদের রচনায়। তথাপি একথা সত্য, মনোজ বসু বিভূতিভূষণের মতো অতখানি প্রকৃতিপ্রাণ নন। মননের দিক দিয়েও বিভূতিভূষণ একেবারে নির্লিপ্ত। এরকম বিভেদ সত্ত্বেও জীবনে মননে ও শিল্পধর্মে তাঁদের মিল গভীর ও ব্যাপক।

তারাশঙ্করের সঙ্গে মিলটা প্রত্যক্ষ না হলেও দুর্লক্ষ্য নয়। প্রকরণ, বিষয়-

নির্ধারণ, চরিত্র-চিত্রণ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি ব্যাপারে দুই লেখকের মধ্যে বিশেষ ঐক্য আছে। দৃষ্টিভঙ্গি-গত সাদৃশ্য তারাশঙ্করের নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত :

> "আমার নিজের সাহিত্যের মধ্যে আমি যা বলেছি, তা সুস্পষ্টভাবে সেকালের সাহিত্যের বক্তব্য থেকে পৃথক।.. আমার দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।...আমি সাহিত্য ক্ষেত্রে এসেছিলাম স্বাভাবিক আলাদা দৃষ্টিকোণ নিয়ে, অন্তরের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে। ..আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের তৃপ্তি কোনদিন হয়নি।"[২]

মনোজ বসু'র মত তারাশঙ্করও পল্লীর ভক্ত। গ্রামের বহুবিচিত্র মানুষের প্রতি তারাশঙ্করের কৌতূহল। পরিচিত অপরিচিত মানুষের এক অনাবিষ্কৃত জীবন ও জগৎ মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়।

মনোজ বসুও তারাশঙ্করের মতো গ্রাম্য পরিবেশে খুঁজেছেন মাটির মানুষকে, লোক-সংস্কৃতিকে। এঁকেছেন উৎপীড়িত তবু অপরাজিত মহান মানুষের ছবি। ফুটিয়েছেন একক জীবনের মধ্যে বহুজনের ব্যঞ্জনা। সৃষ্টি করেছেন বৃহত্তর গণজীবনের আবহাওয়া, বলিষ্ঠ জীবনস্রোত, আদিম সারল্য এবং জীবন-মৃত্যুর সুস্থ স্বাভাবিকতা।

তারাশঙ্করের গল্পগুলির আশ্রয়ে যে জৈবিক বেগের প্রাবল্য অনুভূত হয়, মনোজ বসুর রচনায় তার কোন পরিচয় নেই। রক্তমাংসের দেহে জৈব-প্রবণতা মনোজ বসুর সাহিত্যে আদৌ কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। রক্ত-মাংসের জীবদেহে তৃষ্ণা-ক্ষুধায় প্রেম হয় অভিশপ্ত। তাই জীবনরসের উপভোক্তা নরনারীর প্রেমের মধ্যে রোমান্সকে খুঁজেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্করের সঙ্গে মনোজ বসুর মিল বহিরঙ্গে। আর অন্তরঙ্গের মিল বিভূতিভূষণের সঙ্গে। তারাশঙ্করের রচনায় বীরভূমের রুক্ষতা, আর মনোজ বসুর রচনায় আছে যশোহরের পল্লীর শ্যামল সজল রূপের কোমল মহিমা।

মনোজ বসু রোমান্টিক শিল্পী। শুধুমাত্র রোমান্স-রস পরিবেশনা রচনার কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। রোমান্স ও রোমান্টিকতার সমন্বয়ে বাস্তবকে রূপময় ও রসময় করে তোলার কৃতিত্ব মনোজ বসুর রচনায় ভাস্বর। এই রোমান্টিক প্রবণতার মধ্যে তাঁর সাহিত্যায়ন হয়েছে মূলতঃ পাঁচভাবে :

২। আমার সাহিত্য জীবন পৃ. ২৮২

এক ঃ জমিদারী বাংলা নিয়ে।

দুই ঃ গোষ্ঠীভুক্ত জীবনযাত্রা প্রণালী অবলম্বন করে।

তিন ঃ মানবকে নিসর্গান্বিত করে।

চার ঃ সাধারণ মানব-মানবীর গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবন আশ্রয় করে।

পাঁচ ঃ সমকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল রচনা করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বদেশ-চিন্তা ঃ

রাজনৈতিক উপন্যাস (ভুলি নাই—১৯৪৩) দিয়ে মনোজ বসুর ঔপন্যাসিক-জীবন শুরু। পরাধীন জাতির মুক্তি-প্রচেষ্টায় গণবিক্ষোভের তরঙ্গ জাতীয় জীবনে উত্তাল উদ্দাম। শত তরঙ্গভঙ্গ নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। স্বদেশের সেই প্রোজ্জ্বলমূর্তি স্বভাবতই ঔপন্যাসিককে আকর্ষণ করে। জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে-আঁকা জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংঘাত উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান।

বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সহিংস ও অহিংস দুই বিপরীতমুখী ধারায় প্রবাহিত। সহিংস আন্দোলন কংগ্রেসের অনুমোদিত আন্দোলনের বিরুদ্ধ হলেও জাতীয় আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। সন্ত্রাসবাদীদের দাবি ছিল পূর্ণস্বাধীনতার। অপরপক্ষে, কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক পথে শাসক সরকারের সঙ্গে আপোষধর্মিতার মধ্য দিয়ে স্বরাজ-অর্জন। স্বরাজ বলতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ নয়, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থেকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (১৯০৫—১৯৩০) বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এর মূলে ছিল কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্ব। কংগ্রেস-নেতৃবর্গের আপোষধর্মিতা এবং বিদ্রোহাত্মক গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি নীরবতা জনগণেশের সামনে কোন প্রত্যয়পূর্ণ অঙ্গীকার রাখতে পারে নি। গণ-অভ্যুত্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে কংগ্রেস নীতি নির্ধারণ করে নি। অনেক ক্ষেত্রে তাদের দলীয় নীতি গণ-আন্দোলনের বিপক্ষেও গিয়েছে (দৃষ্টান্ত ঃ আরউইন চুক্তি—১৯৩১, গোলটেবিল-বৈঠকের ব্যর্থতার পর আন্দোলনের

ডাক দিয়েও তা স্থগিত রাখা (১৯৩৩) প্রভৃতি)। ফলে, কংগ্রেসের কর্মপন্থা সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে সংশয় এবং হতাশার সৃষ্টি করে। এদিক দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। সন্ত্রাসবাদীদের মুখপত্র "সন্ধ্যা" লিখেছিল, "আমরা চাই পূর্ণস্বাধীনতা। ফিরিঙ্গি-শাসনের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত যতদিন অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতের উন্নতির আশা নেই।"[১] যুবশক্তি সহজেই এই সংগ্রামদৃপ্ত জীবন-মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র শিক্ষক অধ্যাপক উকিল কেরাণী সকলের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। "যুগান্তরে" গণ-ইচ্ছার স্বরূপটি ধরা পড়ল—"আমরা চাই ইংরেজ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাই বিপ্লবের তরঙ্গ ডেকে আনবে।"[২]

দুই বিরোধী আদর্শ ও নীতির দ্বাবা গণমানসে বিভ্রান্তি এলো। বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনের দারুণ ব্যর্থতা, লবণ-আইন সংক্রান্ত চুক্তি সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান, আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০) অসাফল্য, নিষ্ফল গোলটেবিল বৈঠক এবং চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যর্থতা— উভয় শিবিরের লোকদের দ্বিধা-নৈরাশ্যের প্রান্তরে নিক্ষেপ করল। দেখা দিল দারুণ অসহায়তা উদ্যমহীনতা এবং পরাজিত মনোভাব। সন্ত্রাস-বাদের সাফল্য সম্পর্কে (১৯৩০এর পর) জনসাধারণকে সন্দিহান করে তুলল।[৩] ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সক্রিয় আন্দোলনেব গতি নানাভাবে রুদ্ধ হল।

১। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা— নরহরি কবিরাজ, পৃ. ২২৯

২। ঐ — পৃ. ২২৬

৩। "অসহযোগ আন্দোলনেব ব্যর্থতাব পরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আবার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সময় থেকেই সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনা আরম্ভ হয়। তাঁরা দেখলেন, সন্ত্রাসবাদের পথে সাফল্য লাভ করা সুদূরপরাহত। ব্যক্তিগত সাহস, খুন বা ডাকাতি— দেশের লোকের মনে উন্মাদনা এনেছিল সত্যি, দেশের জন্য নির্ভীক আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছিল, কিন্তু বিদেশী সরকারের ভিত্তিমূলকে পুরোপুরি নাড়া দিতে পারে নি কোনদিন। কাজেই সন্ত্রাসবাদের অসাফল্য জলেব মত পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল দেশবাসীর কাছে, সন্ত্রাসবাদীরা নিজেরাও আত্মসমালোচনা আরম্ভ করলেন।" ঐ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, পৃ. ২৩১।

নিরীহ ভারতবাসীকে ইংরেজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে জড়ালে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। কংগ্রেসের আপোষধর্মিতা এবারে রূপ নিল "ভারত ছাড়" আন্দোলনে। কূটনীতিপরায়ণ ইংরেজ আপোষের নামে ভারতরক্ষা-বিধানের বেড়াজালে সমগ্র ভারতকে বেঁধে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে ভারতের প্রধান প্রধান নেতাদের অতর্কিতে অবরুদ্ধ করল, ৯ই আগস্ট। ১৯৪২-বিপ্লবের রক্তরাগে রঞ্জিত হল ভারতের মাটি। নেতা নেই, সংগঠন নেই—জনগণের নিজস্ব নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান। ইংরেজের দুঃশাসনী উপদ্রবে লক্ষ শহীদের রক্তে ভারতের মাটি লাল হয়ে গেল। বিপ্লবের মরণোৎসবে জনসাধারণ সর্বক্ষেত্রে অহিংসার সংযম রক্ষা করতে পারল না। শিকল-ভাঙার উন্মাদনার এক যৌবনদৃপ্ত রুদ্রমূর্তি। "আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে" ৪২'এর আন্দোলনকে সফল করার উদ্যম নতুন জীবন-সঞ্চার করেছিল।

এই পটভূমির উপর মনোজ বসুর রাজনৈতিক চেতনা প্রসৃত। ব্যক্তিগতভাবে লেখক আন্দোলনের সংস্রবে আসেন বাগেরহাট কলেজে ছাত্রাবস্থায়। কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ দৌলতপুর বিপ্লবী-সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ছাত্রদের মনে স্বদেশমন্ত্রের বীজবপন করতেন তিনি। কলেজে তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য-লাভ ও তাঁর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক লেখক-জীবনে অক্ষয়স্মৃতি হয়ে আছে। "ভুলি নাই"এ দু'একটি রেখার টানে লেখক সেই স্মৃতি উজ্জ্বল করে তুলেছেন। সৈনিক, আগস্ট ১৯৪২, বাঁশের কেল্লা প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অনেক মধু-স্মৃতি রচনার উপকরণ হয়ে দেখা দিয়েছে। স্মৃতির পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে।

আশ্চর্যের বিষয়, কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা লেখক পরিচালিত নন। স্বদেশী আন্দোলনের কালে জনগণের নৈরাশ্য হতাশা উদ্যমহীনতা এবং সেই সঙ্গে দীপ্ত যৌবনের যে শঙ্কাহরণ রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, উপন্যাসে তার বাস্তব আলেখ্য অঙ্কনের চেষ্টা হয়েছে। সাংবাদিকতা রূপান্তরিত হয়েছে সাহিত্যায়নে।

বিরাট এই জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে গণজীবনের ধারার মধ্যে মিশেছে ব্যক্তিজীবন। ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই—সময়ের গতিস্রোতে ভেসে গেছে ব্যক্তিসত্তা। লুপ্ত হয়েছে নায়কত্বের পরিচয়। সমগ্র ব্যক্তিজীবন ঘটনার দোলায় দুলেছে অবিরাম। রচনার মধ্যে লেখক সচেতনতার সঙ্গে রাজনৈতিক আবর্তকে অনুসরণ করেছেন বলে রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে

কোন একক ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য দেখা যায় না। সংগ্রামপরায়ণ এক বিশাল গোষ্ঠীভুক্ত মানবসমাজের অঙ্গরূপে নরনারীদের আবির্ভাব।

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ এবং আন্দোলন হল 'ভুলি নাই'এর বিষয়বস্তু। ১৯৩৬ সাল অবধি এর কাহিনীকাল প্রসারিত। জাতীয় আন্দোলনের সেই সংগ্রামদৃপ্ত অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটেছে—অতীত বিলীন হয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির গর্ভে। সম্পূর্ণ হারানোর আগে ঝাপসা স্মৃতি দিয়ে ঐতিহ্য-সচেতন লেখক তার চিত্র এঁকেছেন। স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠেছে অনেক চেনা মুখ। 'ভুলি নাই'এর চরিত্রে চিরস্মরণীয় কয়েকটি শহীদ-জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। রচনা-প্রেরণা প্রসঙ্গে লেখক এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

কুন্তল চক্রবর্তী, চারু ঘোষ (এঁরা দৌলতপুর কলেজের ছাত্র) প্রমুখ সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের কথা ক'জনই বা জানে। ইংরেজের কড়া শাসন চলেছে তখন। আমার চেষ্টা হল, কুন্তল নামটা অন্তত লোকে জানুক। 'ভুলি নাই' লিখলাম, বইটা বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। একবার ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দৌলতপুর স্টেশনে শুনতে পেলাম, এক প্যাসেঞ্জার বলে উঠল, কুন্তলদা, ভুলিনি তোমাদের—ভুলিনি। 'ভুলি নাই'এর প্রথম কথা। আমার উদ্দেশ্য পুরেছে, অতএব, ভারি আত্মতৃপ্তি পেলাম।

'কুন্তলদা। তোমাদের ভুলিনি'—কথাটি দিয়ে কাহিনীর আরম্ভ। এক অশরীরী জগতের রহস্যে চমকে ওঠে যেন সমগ্র অতীত। প্রসঙ্গসূত্রে লেখকের মুখে শুনেছি, বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ এই গ্রন্থের ডাকসাইটে প্রিন্সিপাল নীলকান্ত রায়ের প্রতিরূপ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে মনোজ বসু যখন কলেজ পরিত্যাগ করেন তখন কামাখ্যাবাবু তাঁদের সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—তারই স্মৃতি নীলকান্ত রায় এবং প্রিয় ছাত্র কুন্তলের কথোপকথনে উপস্থাপিত হয়েছে। আগস্ট'৪২-এ মহিমের কলেজ পরিত্যাগ প্রসঙ্গে কামাখ্যাবাবুর সস্নেহ ভালবাসার স্মৃতিচারণ আছে। মুগ্ধতার ছবি আছে সরোজ পাকড়াশি ও নিরুপমা-শঙ্করের চরিত্রে। বিপ্লবী শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত গুলির ক্ষতের ব্যাণ্ডেজ ইচ্ছাকৃতভাবে ছিঁড়ে মৃত্যুবরণের পন্থা গ্রহণ করেছিলেন ; সরোজ পাকড়াশিও উপন্যাসে তাই করেছে। অপরপক্ষে সুহাসিনী গাঙ্গুলী এবং শশধর আচার্য পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দলের কাজ করার জন্য চন্দননগরের একটি বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীরূপে অভিনয় করেছিলেন ; নিরুপমা ও শঙ্করের অজ্ঞাতবাসে লেখক তার ছবিই এঁকেছেন।

"নিঃশব্দ রাত্রে তোমরা এসে হাজির হও, ফিস ফিস কথাবার্তা···আমার পাতান বউ নিরু হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ায়···অভিমানাহত আনন্দ আসে···স্তব্ধমূর্তি সোমনাথের ছায়া দেখে তাড়াতাড়ি যুক্তকরে প্রণাম করি···জগৎ দত্ত, উমারাণী, মায়া, সরোজ পাকড়াশি, জানা অজানা কত সাথী যেন যুগান্তরের ঘুম ভেঙে উঠে আসেন।"

'ভুলি নাই' তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের রাজনৈতিক উপন্যাস। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়, সংগ্রামীদের ব্যক্তিজীবন এর বিষয়বস্তু। স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মবলি দিল, যারা অংশ গ্রহণ করল, তারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু এই স্মরণীয় ব্যক্তিদের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করল, বঞ্চিত হল, নিঃস্ব-রিক্ত হল, অথচ পেল না কিছুই, কালান্তরের পৃষ্ঠায় থাকবে না তাদের কোন পরিচয়। এই গ্রন্থে লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করেছেন। অনেক কালের পুরণো কথা—সে সব মানুষ নেই, সে পৃথিবীও নেই, কেবল আছে কতকগুলো স্মৃতি। স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে লেখক 'ভুলি নাই'এর যে চিত্র আঁকলেন তা বিচিত্র ও রমণীয়।

'ভুলি নাই'এর প্রবক্তা শঙ্কর। তার স্মৃতিবাহিত গল্পের রস আস্বাদন করি আমরা। উপভোগের দিকটা মুখ্য হয়ে ওঠার দরুন কাহিনীর চমৎকারিত্বের প্রতি বেশি ঝুঁকেছেন লেখক। তাই দেখি, খণ্ড খণ্ড ঘটনা চরিত্রগুলির পূর্ণতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎচমকের মতো চরিত্রগুলো উজ্জ্বল রেখায় ধরা দিয়েই পরক্ষণে মিলিয়ে গেছে তমসার গভীরে। তার ঔজ্জ্বল্য চোখ দুটিকে কিছুক্ষণ ধাঁধিয়ে রাখে।

সরোজ পাকড়াশির চরিত্রে লেখক সেই চমক সৃষ্টি করলেন : একটানে সরোজ ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলে। রক্ত তীব্র বেগে ছুটেছে। সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। চেতনা আর ফেরেনি।

লেখক যেন দ্রুতহাতে কতকগুলো রেখা দিয়ে একটা চলন্ত ঘটনার চরম নাটকীয় মুহূর্তের ছবি এঁকেছেন। নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ করে আমরাও তা প্রত্যক্ষ করি।

দল বাঁচানোর জন্য উমারাণীর নিরুদ্দেশ জীবন, আনন্দকিশোরের দধীচির মত আত্মত্যাগ, নিরুপমার স্ত্রীত্বের অভিনয়, সোমনাথ ও মায়ার পরস্পরের প্রতি ছলনা প্রভৃতি জীবনঘটনাতেও আছে এই আকস্মিকতা।

শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"র সব্যসাচীর চরিত্রধর্মের সঙ্গে কুন্তল চরিত্রের অনেক মিল আছে। সব্যসাচীর মত কুন্তল পাষাণ দেবতা।

কোন দুর্বল মানবিক অনুভূতির দ্বারা যে অভিভূত হয় না, অনুরাগ *বিরাগের মর্ম বোঝে না সে। এই নির্মম ঔদাসীন্যের মূলে কোন দুঃসহ* অভিঘাতের ইংগিত আমরা পাই না। কোন রকম জীবনদ্বন্দ্বের ছবি ফোটে নি। কর্মক্ষেত্রে ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্যে সে তার সহকর্মী-সংঘকে সম্মোহিত করে। উপন্যাসে তার সক্রিয় কর্মনীতি অনুপস্থিত। কেবল দলের অনুগত কর্মীদের মুখে তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা এবং অতিমানবিক শক্তির প্রতি মুগ্ধতার বিবরণ পাই। কথার চেয়ে কাজের মধ্যে কুন্তলকে দেখলে তার চরিত্রটি অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পারত। উপন্যাসে সে কেবল ফাঁকা আদর্শবাদ সৃষ্টি করে। সরল হাস্য-পরিহাস, সংযত কথাবার্তা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে ফুটেছে তার নেতৃত্বসুলভ চরিত্র। নেতার জীবনের সংগ্রাম, সংঘাত, ধৈর্য, উদ্বেগ প্রভৃতি কুন্তলের মধ্যে অনুপস্থিত। কুন্তলকে মনে হয় রণক্লান্ত সৈনিক।

পরিশেষে বলা যায়, দেশাত্মবোধ কিংবা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির কোন প্রয়াস নেই 'ভুলি নাই'তে। বিচ্ছিন্ন গল্পরাশি উপন্যাসের সংহতি ক্ষুন্ন করে। উপন্যাসের কাহিনী-পরিকল্পনা দুর্বল এবং ছক বাঁধা হওয়ায় কোন বৃহত্তর রাষ্ট্রিক চেতনার রূপ ফুটে ওঠে না তাতে।

'আগস্ট ১৯৪২' গ্রন্থেও দেশানুগত্য ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য নেই লেখকের। স্বাধীনতার জন্য দেশবাসী যে আশা নৈরাশ্যের দোলায় দুলছে, যে আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম করেছে, লেখক তার সার্থক চিত্র রচনা করলেও ঘটনার রস আস্বাদনই ছিল মুখ্য।

স্বাধীনতার স্বপ্নসৌধ রচিত হয় '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে। এই আন্দোলন যে আকস্মিক ঘটনা নয় পূর্বেই সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। লেখকও দেখেন নি একে বিচ্ছিন্ন করে। আদি-মধ্য ও অন্তে কাহিনী বিন্যাস করে আন্দোলনের স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। প্রথম পর্বে রয়েছে '৪২র পূর্বকথা (আদি কথা), দ্বিতীয় পর্বে 'সংগ্রাম' অর্থাৎ '৪২র গণ অভ্যুত্থান, তৃতীয় পর্বে "উত্তর কথা" বা আন্দোলনের ফল-শ্রুতি ও লেখকের জীবনদর্শন।

১৯৩১-এর পরবর্তী কালচেতনায় মুখ্যত "আগস্ট ১৯৪২'র কাহিনী প্রসারিত। এই সময়কার স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত অবস্থা আলোচনা পূর্বাঙ্কেই হয়েছে। কাহিনীর প্রথম অংশে প্রাক '৪২ যুগের ইতিহাস। এর একদিকে আছে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আইনঅমান্য আন্দোলনের

প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিরাট স্বপ্নসাধ। অন্য দিকে আছে শাসকশক্তির পীড়নমূলক দমননীতি এবং অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্পর্কে জনসাধারণের সংশয়াকুল জিজ্ঞাসা, হতাশা ও নৈরাশ্য। এই বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বের মধ্যে দুলছে উপন্যাসের কাহিনী।

আখ্যায়িকায় সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরূপে যূথিকা স্বদেশী আন্দোলনের বিমুখী প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের জিজ্ঞাসার উত্তর দাবি করে :

"তোমরা নাচিয়ে দাও, আর বোমা রিভলবার ছুঁড়ে মারা পড়ছে সেন্টিমেন্টাল ছেলেগুলো। এই নির্মল ঘোষের কথাই ধর, জীবন দিয়ে লাভটা কি হল। ডুশমনটা মরতও যদি তবু চব্বৃত্তি করবার লোকের অভাব হত কি দেশের মধ্যে? ৬-দশটা অমন কীটপতঙ্গ মেরে এ গবর্নমেন্ট ঘায়েল করা যাবে না, নিজেরাই মারা পড়ছে শুধু। (পৃ. ১৬-১৭)

যূথিকার এই প্রশ্নের উত্তর চন্দ্রা নিজের অজ্ঞাতে একদিন চিঠিতেই লিখল। জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী "বীর গঙ্গেশ নুলো-পঙ্গু হয়ে গেছেন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে।"

কংগ্রেসের অবাস্তব কর্মপন্থা এবং অহিংস আন্দোলন যূথীর মনে জাগাতে পারে না কোন প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গীকার। যন্ত্রের বিরুদ্ধে চরকার চ্যালেঞ্জ এক অবাস্তব হাস্যকর পরিকল্পনা। মহিমকে বিদ্রূপ করে তাই সে বলে :

"দেশসুদ্ধ লোক বন বন করে ঘোরাতে থাকলে স্বরাজ আপনি বেরিয়ে আসবে।...কিন্তু সুতো হয় বলে স্বরাজও হবে। সৈন্য কামান জাহাজ এরোপ্লেনে ঘেরা ইংরেজের রাজত্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। (পৃ. ২২)

এই বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসার কোন উত্তর সেদিনের দেশনেতারা দিতে পারেন নি। আদর্শের ফাঁকা বুলি দিয়ে মন ভরানোর প্রসঙ্গ মহিমের কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হয় : "যুক্তি বিশেষ কিছু নয়, আশা ও বিশ্বাসের কথা।"

প্রথম পর্বে শিথিল রাজনৈতিক ঘটনার বন্ধনে বাঁধা হয়েছে রাজনৈতিক সত্যকে। কিন্তু রাজনীতির উত্তপ্ত মাটিতে বেশীক্ষণ বিচরণ করতে পারেন না লেখক। গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি তীব্র ব্যাকুলতা থেকে এসেছে চন্দ্রা ও শিশিরের রোমান্টিক প্রেমকাহিনী।

দ্বিতীয় পর্বে তিনি এঁকেছেন '৪২এর ভারত-ছাড় আন্দোলনের জীবন্ত ছবি : "জগদ্দল পাথর চাপা দিয়ে অন্ধকূপে" যাদের "আটকে রাখা হয়েছিল পাথর ঠেলে বেরিয়েছে, আলোয় এসেছে, কে রুখবে আর এখন?" (পৃ-১১০)

এই আন্দোলনের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। লেখক সেই বিচিত্র সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন। "এর নেতা হয়েছিলাম তুমি আমি এবং আমাদের নিচেকার নিতান্ত সাধারণ যারা।" (পৃ. ১৮২) "মাথার উপর নির্দেশ দেবার কেউ নেই।" (পৃ. ১১৪)।

'৪২এর তরঙ্গে প্লাবিত হয়েছে মহকুমাশাসক শিশিরের সরকারী বাসভবন। এর ফলে চন্দ্রা ও শিশিরের মধুর দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে ব্যবধান ও বিচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। চন্দ্রা-শিশিরের বিরোধ শুধু আদর্শগত নয়, শ্রেণীগতও। একজন সামান্য সাধারণ, অন্যজন তকমা-আঁটা শোষক-শাসকদের গোলাম। চন্দ্রা তাই শিশিরকে মেনে নিতে পারছে না। শিশিরের বাংলোয় সে সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী বলে নিঃসঙ্গ এবং ঘৃণার পাত্র। বরানগরে (বাপের বাড়ী) চলে গিয়ে এই দ্বন্দ্বের সে মীমাংসা করল। এখন সে সাধারণের দলে। বিশাল জনতার একজন। আর শিশির সরকারী কর্মচারী বলেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। সকলের সর্বপ্রকার অসহযোগ তার সঙ্গে। জাতীয় আন্দোলনের কেউ নয় সে। নিঃসঙ্গ। জাতির পরম পরীক্ষার দিনে চন্দ্রা আহ্বান করেছে শিশিরকে। তাকে না পেয়ে চন্দ্রা আত্মাভিমানে ৪২'এর অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে।

রক্তাক্ষরা বিপ্লবের ছবি আঁকতেও তীব্র জীবনোন্মাদনা সৃষ্টি করতে গিয়ে লেখক সব সময় কাহিনীর অন্তঃশক্তির দ্বারা চালিত হননি। বাইরের বিভিন্ন সংবাদ কাহিনীর সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করায় ফলে ঘটনার গতিবেগ এবং বাস্তবতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃতীয় পর্বের শুরু দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের অবসান এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরে। আন্দোলনের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এই অবসরে গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রকর, দাম্পত্য প্রেমের কথাকোবিদ আবার স্বক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করলেন। নীড়হীন মানুষের গৃহ মিলিয়ে দেবার মতন তৃপ্তি আর কিছুতে নেই তাঁর। উপভোগের কবি "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করার উদ্দেশ্যে আঁকলেন মহিম-যূথীর বিয়ের রোমান্টিক ছবি।

পরিশেষে বলা যায়, কাহিনীর ত্রিবেণী সংগম সত্ত্বেও ঘটনার বন্ধন একটুও শিথিল হয়নি। কিন্তু উপন্যাসটি a novel of ideas হওয়ায় চরিত্রগুলি খুব স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট নয়। চন্দ্রা ও শিশির ছাড়া কারো জীবন পূর্ণাঙ্গ নয়। মহিম লেখকের ideas'এর ভারবাহী।

রচনাকালের দিক দিয়ে 'আগষ্ট ১৯৪২ (আগষ্ট ১৫, ১৯৪৭)-এর পূর্ববর্তী

রচনা * "সৈনিক" (১৯৪৫, জুলাই)। তুলনামূলকভাবে 'আগষ্ট ১৯৪২' অপেক্ষা সে সব দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট। এর কারণ বোধহয় 'সৈনিকে'র মত একটি serious রচনার পর লেখক মানসিকতার দিক থেকে খানিকটা ক্লান্তি অনুভব করেছেন। সেই জন্যে 'সৈনিকে'র বাস্তবতা আগষ্ট ১৯৪২-এএ এক উপভোগ্য রোমান্টিক কাব্যে পরিণত হয়েছে। 'আগষ্ট ১৯৪২'র স্বদেশপ্রীতি আবেগে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু 'সৈনিকে' বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মাঝখানে লেখক পরম সহিষ্ণু। জীবনসত্যের গভীরতা স্পর্শ করার জন্য তিনি সংযত-বাক। 'আগষ্ট ১৯৪২'এর পটভূমিকায় আগষ্ট-আন্দোলনের 'ভারত-ছাড়' অগ্ন্যুজ্জ্বল দিনগুলির উত্তাপ ছড়ানো মুখ্য উদ্দেশ্য। যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক মন্দা জাতীয় জীবনকে রাহুর মত গ্রাস করছে আগষ্ট'৪২-এ তার কোন ঐতিহাসিক পটভূমি নেই। 'সৈনিক' উপন্যাসে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের করালছায়া জাতীয় জীবনকে করে তুলেছে ভীত, সন্ত্রস্ত ও অসহায়। তার উপরে এসে পড়েছে আগষ্ট-বিপ্লবের অভিঘাত, মন্বন্তরের অসহায় মৃত্যুর কারুণ্য, চোরাকারবারীর বিভীষিকা। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, সৈনিকের ঘটনা কাল ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক জীবনের বিশাল ভাঙাগড়ার দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে কাহিনীর বৃত্তে অনুভব করার মহতী চেষ্টা 'সৈনিক'কে দিয়েছে মহাকাব্যীয় বিস্তার। 'ভুলি নাই', 'আগষ্ট ১৯৪২' এবং 'সৈনিক'—এই তিনে মিলে সম্পূর্ণ করেছে জাতীয় আন্দোলনের সংগ্রামদীপ্ত জীবনের এক বিশাল অধ্যায়।

এদের মধ্যে 'সৈনিক' শ্রেষ্ঠ। লেখকের বস্তু-সচেতনতা ও সমাজ-সচেতনতার আলোয় সমকালীন জাতীয় জীবনের যে রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে, তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। 'সৈনিক' সম্পূর্ণ আধুনিক ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজ্য ও রাজনীতির ছত্রছায়াতলে এর বিকাশ ও বৃদ্ধি। রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ কাহিনীর গতিনিয়ামক। ঐতিহাসিক ঘটনাবাহুল্যের মধ্যে মানুষ যেন এক পাশে সসংকোচে দাঁড়িয়ে থাকে। "বাহ্য ঘটনা অনেকটা দুর্দান্ত দস্যুর মত আসিয়া পড়িয়া মানুষের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিতেছে এবং তাহাকে অধিক চিন্তার অবসর না দিয়া তাহার মুখ হইতে একটা জবাব আদায় করিয়া লইতেছে। সেই মুহূর্ত হইতে তাহার মানসিক পরিবর্তন বাহ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলিতে বাধ্য হইতেছে।"[৪] অষ্টম সংস্করণে এই উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন : "ঘটনাস্রোতে নিম্নোক্ত

৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—(৩য় সং) পৃ. ৪৪

সময়ে ঘটেছিল, ধরে নেওয়া যেতে পারে, কৌতূহলী পাঠক ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন।" কিন্তু 'সৈনিক' শুধু সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনার ইতিবৃত্ত নয়, সৈনিক উপন্যাস। লেখকের ইতিহাস-সচেতনতা বেশি প্রাধান্য পেলে উপন্যাসের রসগৌরব ক্ষুণ্ণ হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিমানুষের ওপর কালস্রোতের সর্বগ্রাসী প্রচণ্ড প্রভাব এই গ্রন্থে অভিনব সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

দেশপ্রেমিক পান্নালালের জীবনঅভিজ্ঞতার সূত্রে ঘটনার মূল্যায়ন করার ফলে সৈনিক জাতীয় আত্মসমীক্ষায় পরিণত হয়েছে। যুদ্ধবিব্রত আতঙ্ক বিমূঢ় নরনারীর কলিকাতা থেকে গ্রামে পলায়ন উপন্যাসে এক নতুন জীবন-জিজ্ঞাসার সূচনা করে।

কারামুক্তির পর পান্নালাল যুদ্ধবিধ্বস্ত মহানগরীর নতুন রূপ দেখল। আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তব জীবনাচরণের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করা লেখকের উদ্দেশ্য। প্রথমেই আশ্রয়ের সন্ধান পান্নালালকে দিয়েছে দেশ ও জাতি সম্পর্কে এক নতুন জীবন-অভিজ্ঞতা :

"সত্যিই ভূত আমি। বাতাসে ভেসে আছি। এখানকার যেন কেউ নেই। দেড় বছরে যেন দেড়শ বছর কেটে গেছে জেলের বাইরে। কি শহর রেখে গেছলাম, আর ফিরে এলাম কোথায়? কর্তাদের বলতে ইচ্ছে করে, যেখানে গ্রেপ্তার করেছিলে, সেইখানে পৌঁছে দাও আমায়।" (পৃ. ২১)

বিমুখ বর্তমান ও শূন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পান্নালালের মনের মধ্যে এক পঙ্গু অসহায়তার সৃষ্টি হয়। মহাপ্রলয়ের মহানাটকের সে একজন দর্শক। প্রতিকূল পরিবেশের কাছে নীরব আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছুই করার নেই তার।

সমাজের দ্বান্দ্বিক রূপ অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক কার্যকারণসূত্রে তার প্রকৃত স্বরূপকে জানা। যুদ্ধোত্তপ্ত আবহাওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন কিছুমাত্র সুস্থ নয়। লোভের ক্রূরতায় সমাজদেহ ক্ষত-বিক্ষত। সাধারণ মানুষ নিস্পৃহ এবং নির্বিকার। অর্থ-পিশাচদের মানবিকতা-বিরোধী কার্যকলাপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সমাজসচেতন লেখক জীবন ও জীবনাদর্শের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য একই সঙ্গে নগর ও গ্রামকে ক্যানভাসরূপে ব্যবহার করেছেন। উদ্দেশ্য ঐক যুগান্ত সূচনাকারী ধ্বংসোন্মুখতার প্রতিবেশ সৃষ্টি করা।

যুদ্ধভীত নাগরিক হরিহর চৌধুরী, অনুপম ঘোষ, সুপ্রিয়ার আগমনে পল্লীর গতানুগতিক জীবনযাত্রায় দোলা লাগে। নিরক্ষর, অজ্ঞ, সরলস্বভাব মানুষগুলো রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নয় বলেই মাদারডাঙা, বাঁকাবড়শির

আলগামাটিতে সহজেই এরা শিকড বিস্তার করে। অনুপম নিজেই বাঁকাবভঙ্গিতে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছে ঃ

"আমি আর আমার মত ভাইব্রাদার করে খাচ্ছি তো এই গণ্ডমূর্খগুলোর জোরে। এদের নামে পয়সা খরচ করে একটু ফুর্তি করলামই বা। এ-ও একরকম স্পেকুলেশন বলতে পার। লেগে যায় তো কেল্লা-ফতে। না লাগে, মনে করব ঘরের থেকে তো যাচ্ছে না, যা আসে ষোলআনা তার কখনো ঘরে তোলা যায় না।" (পৃ. ৭২)

অসৎ ছদ্মবেশী ভদ্রমানুষরা কপট দেশপ্রেমের অভিনয় করে সরল লোকদের বোকা বানায়। এদের কারসাজিতে মন্বন্তর দেখা দেয়। দেশসেবার নামে 'মানুষকে ভিখারী বানিয়ে তারপরে সামান্য খেতে দেয়।' সমাজ-সচেতন লেখকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ভর্ৎসনা উষ্মার কণ্ঠের উপহাসে, কটাক্ষে, বেদনায় মর্মস্পর্শী। কটাক্ষ-বিদ্রূপের অন্তর্লীন হয়ে আছে অক্ষম মানুষের প্রতি লেখকের সুগভীর সহানুভূতি ও মমতা। গভীর মানবপ্রীতি থেকে উৎসারিত মন্বন্তরের ছবি যে কোন সভ্য মানুষের বক্ষস্পন্দনকে অবশ অসাড় করে দেয়। অনুপমের গুণ্ডামি সুপ্রিয়ার কাছে গোপন থাকে না। তীব্র অন্তর্ভেদী বাক্যবাণে অনুপমের বিবেকহীন মনুষ্যত্বকে আঘাত করে সে।

"লাখ লাখ মানুষ মরল, আর শাসনের নামে দুর্নীতি অব্যবস্থার চূড়ান্ত চলেছে ওদিকে। খুনী নয় তো কি বলব তোমাদের?" (পৃ. ২১৯)

মনোজ বসু ধ্বংসের চিত্রকর নন, তিনি জীবনরসের কবি। মন্বন্তরের সর্বগ্রাসী ধ্বংসযজ্ঞ গ্রামের জীবনযাত্রা অচল করে দিলেও প্রকৃতির দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত করেন নি মানুষকে। "শীতের বাতাসে দুলছে। ঝিলমিল করে ধরিত্রী সোনা ঢেলে দিয়েছে।" 'জাহান্নমের আগুনে বসে' পান্নালাল জীবনের আশা পোষণ করে। এই ক্ষয়ই শেষকথা নয় জীবনের। "স্বাধীনতার আলোয় সোনার মানুষ, হাসিতে যাদের মুক্তা মাণিক ঝরে – আমি লিখে যাব অদূরকালে তাদেরই কথা" (পৃ. ২২৩)। আশার এই সোনালি রেখায় উজ্জ্বল 'সৈনিক'।

"বাঁশের কেল্লা" উপন্যাসটি "ভুলি নাই"এর প্রতিরূপ। জাতীয় আন্দোলনের স্রোতোধারায় দেশপ্রাণ মানুষের মনেপ্রাণে যে বিপ্লবের উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছিল সেই প্রাণবন্ত আত্মোৎসর্গের অমৃত, দুঃখের দীপ্তি, অপরাজিত

মানুষের বীর্যবত্তা, গোটা জাতির সমরযাত্রা নবলব্ধ স্বাধীনতার শুভ মুহূর্তে লেখকের কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একজন দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর বেনামীতে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সেই সব কাহিনী এই উপন্যাসে স্মরণ করা হয়েছে।

স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল নীলবিদ্রোহ, সশস্ত্র অভিযান, লবণ-সত্যাগ্রহ, আগস্ট-বিপ্লব। যাদের 'মৃতদেহের উপর দিয়ে স্বাধীনতার সিঁড়ি উঠেছে, স্বপ্নের মত আবছা আবছা মনে পড়ে' তাদের। চলচ্চিত্রের মতই তারা ছায়া ফেলে যায় মনে।

> "জীবন্ত দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। সেই আগের মতোই চরে ফিরে বেড়ায়। কেশব, দুর্গা যতীন-দাকে দেখি, কানুকে দেখি। প্রদীপ্তমুখ প্রভাস মহারাজকে দেখতে পাই।" (পৃ. ১১১)

এদের কাউকে ভোলেননি লেখক। স্মৃতিতে অতীতের প্রিয় মানুষগুলো ভিড় করে।

মনোজ বসু সংগ্রামের নন, জীবনের রূপকার। নীলবিদ্রোহ তাই এখানে 'নীলদর্পণে'র মত অত্যাচারী হৃদয়হীন নীলকরেব বিবেকবর্জিত কাহিনী নয়। প্রতিবেশীসুলভ ঔদার্য ও মহানুভবতার ছবি-অঙ্কনই জীবনরসের স্রষ্টার উদ্দেশ্য। সে কারণে তাদের দানবমূর্তি অপেক্ষা প্রতিপালকের ভূমিকাই লেখকের কলমে ফুটেছে ভাল। কিন্তু ইতিহাসের রথচক্রে দলিত পিষ্ট রায়তদের জীবনযন্ত্রণা এবং অত্যাচারিত মানুষের কথা কাহিনীর মধ্যে আসেনি। তাদের সঙ্গে শিল্পীহৃদয়ের তেমন যোগ নেই। কাহিনীতে নীলদর্পণের মত লোমহর্ষক কোন প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ নেই।

মোটামুটিভাবে, ১৯০৫ থেকে ১৯৪৪ সাল অবধি জাতীয় সংগ্রামের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসগুলি নিয়ে যৎসামান্য আলোচনা করলাম। এবার স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা "পথ কে রুখবে?" উপন্যাসের আলোচনা করব।

জাতীয় আন্দোলনের রক্তক্ষয়, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দেশবিভাগ-জর্জরিত বঙ্গ দেশের অবক্ষয়িত অবস্থা স্থানগত ও কালগত ভাবে এই উপন্যাসে দুই মূর্তি গড়ে তুলেছে। এক মূর্তিতে আছে রণদুর্মদ বীর্যবান অপরাজিত মানুষের উজ্জ্বল দীপ্তি, অন্যমূর্তিতে ঘূর্ণিধূলিতে আচ্ছন্ন লাঞ্ছিত মানুষের জীবনের ভিন্ন এক রূপ। পরাভবের গ্লানি কিছু লেগে থাকলেও জীর্ণতার দাগ পড়েনি সেখানে। একথা বলার তাৎপর্য, সত্তর দশকের সাহিত্য যখন মানুষের একক

নির্জনতায় নিঃসঙ্গ, শূন্যতায় অবসন্ন, তখন সোনার কলমে মনোজ বসু লিখলেন 'পথ কে রুখবে ?' নৈরাশ্য হতাশা দিয়ে জীবনের গতি রুদ্ধ করতে চাননি তিনি। বরং এই অবসন্নতার মধ্যে দেখেছেন মানুষের আশাকে বেঁচে থাকতে। সাহিত্যিক হিসাবে মনোজ বসুর কাম্য, জীবনে আলো ও উত্তাপ সঞ্চার করা। 'পথ কে রুখবে ?' লেখকের সেই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষর।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের ঘটনা অবলম্বন করে লেখা একালের রাজনৈতিক ইতিহাস 'পথ কে রুখবে ?' স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্নিক্ষরা বিপ্লবের অন্তর্লীন দুর্বলতা, ষড়যন্ত্র, বিদেশী শাসকের চক্রান্ত, জিন্না ও গান্ধীর ভূমিকা, দ্বিজাতিতত্ত্বের উন্মেষ, দেশবিভাগ, হিন্দু-মুসলমানের জীবনে উদ্ভূত সমস্যা, স্বাধীন রাষ্ট্রের জনগণের সংকট– ইত্যাদি নানা ঘটনার ঐতিহাসিক দলিল।

রাজনৈতিক চক্রান্তে খণ্ডিত ভারতবর্ষ, বিশেষ করে দ্বিধাবিভক্ত বাংলা-দেশ এর পটভূমি। ওপার-বাংলা এপার-বাংলার গণ আন্দোলন—ভাষা-আন্দোলন (১৯৫২) ও খাদ্য-আন্দোলনে (১৯৬৫) সরকারের বর্বরতা, নৃশংস গণহত্যা, লক্ষ শহীদের রক্ত-লেখা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে করেছে কলঙ্কিত। লেখক সেই ছবি অঙ্কিত করেছেন। সাংবাদিকতার সাহিত্যায়নের ফলে কাহিনীবৃত্তে সৃষ্টি হয়েছে একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। জীবন ও সমাজের মধ্যে ধর্মের স্থান অত্যধিক নয়। সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পারস্পরিক নির্ভরতা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি প্রধান সে কারণে ধর্ম ও রাজনীতির বিভেদে জনমন দ্বিখণ্ডিত হয়নি। ভাষা-আন্দোলন, খাদ্য-আন্দোলন প্রমুখ গণ-অভ্যুত্থানে উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনের জন্য দাবি করেছে, জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সংগ্রাম করেছে। শহীদের শোণিতধারায় একত্র মিশেছে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত। লেখা হয়েছে বাঙালি-জাতিত্বের বিজয়গাথা। ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে জাতীয়তাবোধ। জাতীয় দাবি হিন্দু-মুসলমানকে যেভাবে একজাতিত্বে উদ্বুদ্ধ করে, তাতে লেখক আশান্বিত হয়ে ওঠেন—প্রত্যক্ষ করেন এক ঐতিহাসিক জাতির অভ্যুদয়। দেশ-কালগত ইতিহাসের মধ্যে নিজেকে অভিন্ন অস্তিত্বে ছড়িয়ে দিতে পারার জন্যে উপন্যাসকার হয়ে উঠেছেন ঐতিহাসিকও। ইতিহাসের পথ ধরেই তাঁর অনুসন্ধিৎসা কল্পনার অনুগামী হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে এক বৃহৎ মহাকাব্যীয় জীবন পরিবেশ। (পরবর্তী পরিচ্ছেদে এবিষয়ে আরও আলোচনা করেছি।)

প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে সব অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব, তা আমাদের চিরাগত বিশ্বাস ও সৌভ্রাত্রবোধকে ক্ষুণ্ণ করে। ধর্মবিশ্বাসকে স্বার্থাসক্তির কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টির চক্রান্তকে লেখক তীক্ষ্ণভাষায় আক্রমণ করেছেন। এমন কি যে গান্ধীবাদ একদিন দেশকে পথ দেখিয়েছিল, সেই গান্ধীজী, তাঁর নীতি এবং তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের বিরুদ্ধেও বলতে হয়েছে তাঁকে। সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই লেখক মানবতাবাদে বিশ্বাসী। সেইজন্যে দেশের কল্যাণের নামে যেসব অমঙ্গল সাধিত হচ্ছে তাতে লেখকের দুঃখ-বেদন। অভিযোগ একধরনের শ্লেষ-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের সৃষ্টি করে। বার্ণড'শর[৬] মত তিনিও বিশ্বাস করেন 'সুপারম্যান'দের অভাবেই সাধারণ নাগরিকের এই দুঃখ ও দুর্দশা। বার্ণডশ'র মত মনোজ বসুও এখানে খানিকটা প্রচারক হয়ে উঠেছেন।

মনোজ বসু জীবনের এক অসীম আনন্দ ও কল্যাণে নিত্যবিশ্বাসী। সেই বিশ্বাসে অভিজ্ঞতার ধারায় য-কিছু চিত্তের সান্নিধ্যবর্তী হয় অপার আগ্রহে তাকে চেতনার গভীরে সঞ্চারিত করে যথামূল্য যাচাই করে দেখেন। "পথ কে রুখবে?"—এর মূল বক্তব্য হল দুই-বঙ্গের বাঙালীর মধ্যেকার কৃত্রিম অভৌগোলিক বিভেদ কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে অখণ্ডতা অনিবার্য।

গ্রন্থপ্রকাশের পর তিন বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতে লেখকের উপলব্ধি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অরুণোদয় উভয় বঙ্গের আন্তর সৌহার্দের পরিচয়পত্র। ভ্রাতৃত্বের মাল্যবন্ধনে বাঁধা পড়ল হিন্দু ও মুসলমান। জঙ্গীশাসকের রক্তচক্ষু, নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচার পারেনি মিলনের দাবি নস্যাৎ করতে। তৃতীয়নয়ন দিয়ে লেখক যেন ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক পরিণতি ভাষা-আন্দোলনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আপন বিশ্বাসের মাটিতে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রত্যয়-দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন: "দুর্যোগের ফাঁক পেয়ে হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ওদিকে একাকার হয়ে গেল।" সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত ভবিষ্যৎবাণী করলেন: "বিনিময় আর এক দফা আসছে—যে যার জিনিষ দেখেশুনে ফেরত নেবে।"

৬। ব্যক্তিগত সাক্ষাতে লেখকের মুখে শুনেছি, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিকদের মধ্যে বার্ণডশ'র রচনা তাঁর অধিক পছন্দ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সামন্ততন্ত্রের পিরামিড ঃ

বাংলা কথাসাহিত্যের মানচিত্রে জমিদার সম্প্রদায় একটা বিরাট স্থান অধিকার করে আছে। ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টির সামাজিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

> "গত দুই তিন শত বৎসরের দেশকে বুঝিতে হইলে এই জমিদারদিগকে বুঝিতে হইবে। তাহাদেরই কেন্দ্র-বিকীরিত শক্তি দেশের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।"[১]

দেশের প্রাণশক্তি ও কেন্দ্রস্থলের আধার জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতি সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মত মনোজ বসুও কৌতূহল বোধে উদ্দীপ্ত। তারাশঙ্কর ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-পরিবারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ ও বিরোধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছবি এঁকেছেন[২]। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের ট্রাজেডি মনোজ বসুকে আকর্ষণ করেনি। তাঁর দৃষ্টি ছিল সামন্ততান্ত্রিক পিরামিডের চূড়ার দিকে।

জমিদার সম্প্রদায়ের শত শত বৎসর পূর্বেকার দস্যুতা, লুণ্ঠন পরায়ণতা, দুর্ধর্ষতার যে সব কাহিনী কিংবদন্তীর মত প্রচলিত, হারিয়ে-যাওয়া জীবন-সম্পদের সার্থক প্রতিবেশ রচনার জন্য লেখক সেগুলি গ্রহণ করেছেন। বাংলা-দেশের দীর্ঘপ্রসারিত বিল ও চরকে ক্ষেত্র হিসাবে নিয়েছেন। সমগ্র কৃষি-সভ্যতা এই সব বিল ও চরকে ঘিরে। উপন্যাসে এরা জীবন্ত সত্তা বিশেষ। মাটি ও মানুষের সম্বন্ধ দেহ-মনের ন্যায় ঘনিষ্ঠ।

"শত্রুপক্ষের মেয়ে" কোম্পানী আমলের প্রথম যুগে বাংলাদেশে জমিদারি পত্তনের সময়কার কাহিনী। শতাধিক বৎসর পূর্বে বনজঙ্গল-পরিবেষ্টিত নদীমাতৃক গ্রাম-বাংলা ছিল জমিদারদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের স্থান।

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৩য় সং — পৃ. ৪৩৭)

২। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু-চোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল। —আমার কালের কথা।

জমিদারি স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে আছে লোমহর্ষক নিষ্ঠুরতা, দস্যুতা ও শঠতার বহু সহস্র কাহিনী। উপন্যাস-লেখক সেই অতীত কালের ছবি এঁকেছেন। অতীত-প্রীতি থেকে উদ্ভব হয়েছে এক জাতীয় রোমান্টিকতা।

অতীত কালের পটভূমিতে আঁকা বাংলার জমিদারতন্ত্রের ছবি তাঁর ঐতিহ্য-প্রীতির নিদর্শন। এই সকল চিত্র মনোজ-মানসের আরো একটি দিক ব্যক্ত করে। তিনি হলেন গ্রাম-জীবনের শিল্পী। সুখ্যাত গ্রাম্য পরিবেশের অভ্যন্তরে তিনি খুঁজেছেন জীবনের সমগ্রতা। সভ্যতা-বিকাশের আদিক্ষেত্র হল গ্রাম। গ্রামপ্রীতি ঐতিহ্যপ্রীতিরই নামান্তর। বউভাসির বিল, ডাকাতের বিল, ঘাড়া-নেড়ির মাঠ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রামীণ ইতিহাসের ভিত্তি স্বরূপ। এইসব স্থানের নামকরণের পশ্চাতে সাধারণ লোকসমাজে প্রচলিত যে সব বিশ্বাস ও রোমাঞ্চকর গল্প আছে, লেখক জমিদার-সম্প্রদায়ের জীবনধারার সঙ্গে তাদের একসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন। ফলে কাহিনীর গতিবেগ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি জমিদারদের আভিজাত্যাভিমান, আত্মমর্যাদাজ্ঞান, দৃপ্ত পৌরুষ, অফুরন্ত প্রাণ-প্রবাহের গৌরবময় অতীতকে রাজোচিত বিশালতা দান করেছে।

তারাশঙ্করের রচনায় এই দৃপ্ত জীবনাবেগ সৃষ্টির তেমন কোন চেষ্টা নেই। জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বিরোধের দ্বান্দ্বিক পটভূমিটি সমাজের পৃথক দুটি শ্রেণীর। একজনের জীবনধর্মের সঙ্গে অন্যজনের জীবনাদর্শের মিল নেই। দ্বন্দ্বের ফলে, একপক্ষের জীবন ক্ষয় হচ্ছে। জমিদারতন্ত্রের অবক্ষয় বোঝানোর জন্য অতীত ঐশ্বর্যের সমারোহে তিনি বর্তমানকে চিত্রিত করেছেন। জীবনের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও যন্ত্রণাকে তীব্র করে তোলার জন্য অতীতকে দরকার হয়; তেমনি আবার সান্ত্বনার প্রলেপ রূপেও তার ব্যবহার আছে। মনোজ বসুর সঙ্গে তারাশঙ্করের রচনার পার্থক্য প্রকরণগত ও আদর্শগত।

মনোজ বসু নিঃসন্দেহ রোমান্টিকধর্মী লেখক। তারাশঙ্কর এবং রবীন্দ্রনাথের (ঠাকুর্দা, যোগাযোগ) মত তিনি সামন্ততন্ত্রের অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান রশ্মির নিষ্প্রভ মৃত্যুশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ দেখেন নি। অরুণোদয়ের দীপ্ত জীবনরাগ বাস্তবের মরণশীল জীবনবেদনাকে উপেক্ষা করে এক বিচিত্র ভাবলোক সৃষ্টি করে। সমস্যাজটিল জীবন-পরিবেশের প্রতি মনোজ বসুর একধরণের অনীহা আছে। জীবনের বৃদ্ধির দিকটাই লেখকের কাম্য জগৎ। তাই সংঘর্ষজর্জর বর্তমান অপেক্ষা অতীত ঘটনায় রোমাঞ্চরস আস্বাদন তাঁর কাছে অনেক প্রেয়। জীবন উপভোগের মূল্য সম্বন্ধে

লেখক সচেতন। "শুক্লপক্ষের মেয়ে" উপন্যাসে সেই উপভোগকেন্দ্রিক জীবন-সমস্যার রূপায়ণ করেছেন মনোজ বসু।

আলোচ্য উপন্যাসে তেমন শ্রেণীদ্বন্দ্বের ছবি নেই। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভূ-স্বামী নরহরি চৌধুরী ও শিবনারায়ণ ঘোষের প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে কেন্দ্র করেই গল্পাংশ গড়ে উঠেছে।

উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে জনবসতি-বিস্তারের প্রথম যুগের কাহিনী। গ্রাম-বাংলা তখনও পূর্ণায়তরূপ পায়নি। বসতির ভিতর দিয়ে তার প্রসার সবে আরম্ভ হয়েছে। মানবজীবনের উপর প্রকৃতি-পরিবেশের একাধিপত্য। জমিদারদের ভীমকান্ত স্বভাব এই পরিবেশের ফল। নদীর জোয়ারভাঁটার তরঙ্গোচ্ছ্বাস, তার দুর্দমনীয় প্রকৃতি, মানুষের চিন্তা কর্ম ও ধর্মের সঙ্গে উপন্যাসে অভিন্নরূপ লাভ করেছে।

শিবনারায়ণ ঘোষ এবং নরহরি চৌধুরী দুই প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত। এঁদের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির কোমলতার মধ্যে শ্যাম ও শ্যামা রূপের যে বিরোধাভাস আছে, তা-ই উক্ত দুই চরিত্রের মধ্যবর্তী আদর্শগত ব্যবধান। এই বিভেদ আশ্রয় করে লেখক কাহিনীটি উপভোগ্য করে তুলেছেন; আদিম বন্য প্রাণোচ্ছলতার দুর্বার আবেগটি ভালবাসা ও বিরাগের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। এক কোটিতে আছেন শিবনারায়ণ অন্য কোটিতে নরহরি। শিবনারায়ণের প্রশান্ত গম্ভীর বৈষ্ণব ভাবুকতা ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। বিপরীত মার্গের চরিত্র নরহরির রক্তে জমিদার সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা; ক্রোধের বীভৎসতা, লোভের নির্লজ্জ নগ্নতা তাঁকে সদাসর্বদা তৃষ্ণার্ত করে রাখে। অফুরন্ত জীবন-তৃষ্ণার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা মনোজ বসুর স্বধর্ম নয়। গোড়াতেই তিনি নরহরিকে এই সম্বন্ধে সজাগ করেছেন। শিবনারায়ণের জবানীতে বললেন :

> "সব মানুষই বেঁচে থাকতে চায়—সবারই বাঁচবার অধিকার রয়েছে। একের লোভ বিশ্বগ্রাসী হলে আর দশজনের সর্বনাশ হয় তাতে।... মানুষের লোভ বেড়ে চলেছে—লোভের জায়গা হচ্ছে না বলেই চারদিকে এত অশান্তি।"

মানুষ এই বাস্তব সত্য বিস্মৃত হয় বলেই অশান্তিময় জীবন পরিবেশের উদ্ভব হয়।

সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের নিবিড় সম্পর্কটিকে লেখক দ্বান্দ্বিক

পটভূমি রূপে ব্যবহার করেছেন। ইষ্টদেবতা শ্যাম ও শ্যামার বিরোধকে অবলম্বন করে তীব্র নাটকীয় গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে কাহিনীতে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব কাহিনীর উপজীব্য হলেও বৈষ্ণবরসাপ্লুত অনুরাগের মধুবন্ধনে বাঁধতে পারার সাংকেতিকতা এর মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু বাংলার আত্মধর্ম কেবলমাত্র আনন্দের ও অধ্যাত্ম-অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার আত্মার বীরধর্মের স্বরূপ শাশ্বতকাল থেকে বাঙালীর জীবনে প্রচ্ছন্ন ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসে বাংলার সেই বীররূপের মহিমাকে লেখক এক জীবন্ত রূপ দিয়েছেন।

প্রকৃতির রুদ্ররোষে নাজিরঘেরি তালুকের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে শিবনারায়ণ ঘোষ বাস উঠিয়ে সপরিবারে প্রেমভোগে যাচ্ছিলেন নৌকা করে। শ্যামগঞ্জের নরহরি চৌধুরী অন্ধকার রাত্রে ঝড়ের মত জল-ডাকাতি করার জন্য শিবনারায়ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পর্যুদস্ত হয়। শিবনারায়ণের সরল সহজ বৈষ্ণবীয় জীবনযাপনের অন্তরালে রয়েছে বাঙালি-আত্মার বীরধর্মের দুর্বার তেজ, দুর্নিবার শক্তি ও সুগভীর আত্মমর্যাদাবোধ। আত্মরক্ষার্থে এক মুহূর্তে শ্যামের বাঁশি লাঠিতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণব অনুভবের মাধুরিমা ক্ষুণ্ণ হয় না একটুও। হয় না বলেই প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হলেন তাঁরা দু-জনে।

অপর পক্ষে, নরহরি-চরিত্র তন্ত্রসাধকের মতন দৃঢ় কঠিন ব্যক্তিত্বের দ্বারা চিহ্নিত। সমগ্র উপন্যাসে প্রেমানুভবের বাস্তব অভিজ্ঞতা মধুস্নিগ্ধ রসরূপ ধারণ করেছে। আত্মসমর্পণের মহিমা এখানে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নরহরি চেয়েছিলেন, শিবনারায়ণ তাঁর বন্ধুত্বের আনুগত্য মেনে চলবেন। তাঁর বৈষ্ণবীয় বিনয় এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে সহজ সরল ব্যবহার নরহরিকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। আপন চরিত্রের দীনতা সংকীর্ণতা তাঁকে ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত করে। মহাকালীর মন্দিরে শিবনারায়ণের অনুপস্থিতি নরহরির আত্মমর্যাদার উপর আঘাত করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ নরহরি প্রতিশোধ স্পৃহায় অধীর হলেন। ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল মাধবদাস বাবাজীর আখড়ায়। শিবনারায়ণের কন্যা মালতীকে ভাবী পুত্রবধূ করার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করলেন নরহরি। শিবনারায়ণের চরিত্রে বৈষ্ণবীয় সহিষ্ণুতা—তাই নরহরির ক্রোধের প্রতিহিংসা চান না তিনি। সর্বস্ব সমর্পণ করে তিনি পেতে চান প্রেমময় তাঁর ইষ্টকে।

শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর নরহরির কোপদৃষ্টি পড়ল শিবনারায়ণের মঠ-

বাড়ির উপর। সৌদামিনীর সঙ্গে চলল তাঁর চরম প্রতিপক্ষতা। শক্তি আর দর্পের অহঙ্কারে অন্ধ নরহরি শিবনারায়ণের সমস্ত তালুক দখল করে পরিতৃপ্তি চাইলেন। কিন্তু তৃষ্ণার দহনে শুধু নিজেই দগ্ধ হলেন, নরহরির দম্ভ পরিণামে হাহাকারে পরিণত হল। সৌদামিনীকে তিনি বলেন, "সন্দেহ হচ্ছে আমার মৃত্যু হয়ে গেছে।" অগ্নিশপ্ত তৃষ্ণায় নরহরির কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠেছে। সমস্ত বিজয় পরাজয় বলে মনে হচ্ছে তাঁর। অন্তরেও একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেছেন। নিজেরই বিরুদ্ধে আজ তাঁর বিদ্রোহ। তাই প্রতিপক্ষ সৌদামিনীর দীন কুটিরে অতিথি হতে কোন দ্বিধা থাকে না মনে। স্বেচ্ছায় তিনি বৌভাসির বিল অনুগত লাঠিয়ালদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিলেন। নিঃসংকোচে সুবর্ণলতার সঙ্গে কীর্তিনারায়ণের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন সৌদামিনীর কাছে। এখানেও দ্বন্দ্বের একটি প্রচ্ছন্ন ছদ্মবেশ—প্রকৃতিতেই কেবল আলাদা। তাই শিবনারায়ণের পুত্র কীর্তিনারায়ণকে জামাইরূপে বরণ করে নেবার সময়েও পুরাতন প্রতিপক্ষ মনোভাব সংগ্রামের সৃষ্টি করল। নরহরির এই মনোভাব কীর্তিনারায়ণের মনেও সঞ্চারিত হয়। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' সুবর্ণলতা স্ত্রী হলেও কীর্তিনারায়ণ তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে সেই পুরাতন বিরোধের জের নয় এ জিনিস, কীর্তিনারায়ণের স্যাডিষ্টিক মনোভাব থেকে এর উদ্ভব। সে কারণে সুবর্ণলতাকে স্ত্রীরূপে না ভেবে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে সে মনে করছে। কীর্তিনারায়ণের কাছে সুবর্ণলতার পরিচয় হল সে শত্রুপক্ষের মেয়ে।

কীর্তিনারায়ণের অন্তরে ধূমায়িত বিক্ষোভ-বিদ্রোহ অহংকার দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যে অভিষিক্ত করে লেখক শান্তিপূর্ণ সমাধান করলেন। সেজন্য সুবর্ণলতার সঙ্গে কীর্তিনারায়ণকে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। প্রেমাস্পদের কাছে সুবর্ণলতার ছল-করা পরাজয়-বরণ, আত্মসমর্পণ, বিনোট খেলা, ফুল ছুঁড়ে বিজয়ীকে অভিনন্দন জানানোর মধ্যে দিয়ে সমগ্র পরিবেশটা উপভোগ্য রমণীয় রূপ লাভ করেছে। দাম্পত্যপ্রেমের মাধুর্যে ঘটনা রসায়িত করে লেখকের বিরোধ-উত্তরণের এই প্রচেষ্টা— এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর কবিধর্ম। দাম্পত্য প্রেমের মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণতা-- "শত্রুপক্ষের মেয়ে" উপন্যাসে লেখক এই জীবনরস আস্বাদনের পক্ষপাতী। উপাখ্যানের অন্তে পরিতৃপ্ত লেখক বলছেন: "বিনোট চলিতে থাকুক, এ কাহিনীর আমি এইখানে আপাতত ছেদ টানিয়া দিলাম। ইহারা সুখে

থাকুক—রূপকথার শেষে যে রকমটা হইয়া থাকে। আমার তো মনে হইতেছে, রূপকথাই শুনাইয়া আসিলাম এতক্ষণ ধরিয়া।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জীবন ও প্রকৃতি :

গ্রামের মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখকের বহুমুখী আগ্রহ ও কৌতূহল পরিচিত পরিবেশের বাইরে অচেনা অজানা জীবন ও জগৎ নিয়ে ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস সৃষ্টি করে। মাটি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা নিয়ে তিনি আঁকলেন বঙ্গোপসাগরের অদূরবর্তী জলজঙ্গলের প্রান্তীয় মানুষগুলোর অভিনব জীবনযাত্রা। বাল্যে ও কৈশোরে দেখা দিগন্ত-লীন "বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষগুলোর দুঃখসুখ আশাউল্লাসের" নিবিড় পরিচয়গত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকেও লেখক তাদের আহরণ করেছেন।

> "গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয়···কাঠ কাটতে মধু ভাঙতে জীবিকার শতবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায়, বাঘ-কুমির সাপের কবলে পড়ে—তার মধ্যে কত জনে আর ফেরে না। জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, বনবিবি, ও বাঘের সওয়ার গাজি কালুর রাজ্য রহস্যময় সুন্দরবন ছোটবেলা থেকে আমায় আকর্ষণ করত।·· সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস (জলজঙ্গল, বন কেটে বসত) ও কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি। কোন কোন অংশ একেবারে বনের ভিতরে খালের উপর নৌকোয় বসে লেখা।"[১]

বাংলার মাটি নদনদী ও মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকার ফলেই চরিত্রগুলি জীবন্তরূপ লাভ করেছে। অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা এই মানুষদের জীবন। বাদার সান্নিধ্যে তারা পেয়েছে অর্ধ-আরণ্যকতা (semiwilderness)। জলজঙ্গল (১৩৫৮), বন কেটে বসত (১৩৬৮) উপন্যাসদ্বয় সুন্দরবনের অরণ্যচারীদের প্রায় অজানা কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। সাহিত্যে সৃষ্ট হয়েছে এক নতুন ভৌগোলিক পরিবেশ।

১। ঝিলমিল- পৃ. ১৬৮

মানব সমাবেশের চিত্র অনিবার্যভাবে দেশকালের স্বরূপ ব্যক্ত করে। অচেনা অজানা মানুষগুলোর জীবনরহস্য দেখতে ও দেখাতে গিয়ে লেখকের দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়েছে গ্রাম থেকে বৃহত্তর দেশে। তার এক কোটিতে আছে ভূমিব্যবস্থার ফলে ধ্বংসমুখী সামন্ততন্ত্র, শিল্পাঞ্চলের ক্রমপ্রসার, বাণিজ্যিক বিস্তার, এবং কৃষিনির্ভর অর্থব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ সমাজের নিঃস্বতা ও দারিদ্র্য। অন্য কোটিতে আছে জীবন ও জীবিকার তাগিদে ভাগ্যান্বেষী মানুষের ভাগ্য-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরন্তর সংগ্রাম ও অভিযান।

ব্যক্তিমানুষের গৌরবের প্রতি মনোজ বসু অত্যধিক আস্থাশীল। সমাজে ও দেশের মাটিতে সাধারণ মানুষের এক অপরাজেয় রূপ আঁকতে গিয়ে দেশ ও কালের অবস্থাও উদঘাটিত হয়েছে। দু'একটি রেখার টানে উজ্জ্বল হয়েছে জীবন ও জীবিকার সমস্যা। কৃষি প্রচেষ্টা দুর্বল বলেই গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি তাকে গ্রামছাড়া করেছে। ভাগ্যসন্ধানী মানুষের কেউ চেনাগণ্ডির সড়ক ধরে এসেছে শহরে, শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্র-ভূমিতে; আবার কেউ কেউ গেছে লোকালয়ের বাইরে নির্জন অরণ্যভূমিতে।

'জলজঙ্গল' ও 'বন কেটে বসত' উপন্যাসদ্বয়ে মানুষের প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব সীমার বাইরে রহস্যময় বাদাবন হয়েছে লেখকের রচনার বিষয়বস্তু। 'বন কেটে বসত' উপন্যাসে জীবিকান্বেষণ প্রয়াস বাদাবনের প্রতি আকর্ষণের কারণস্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। শহরে সমৃদ্ধি থাকলেও তার প্রতি লেখকের স্বভাবজাত একটা ক্ষুব্ধতা আছে। গগনের কর্মপ্রয়াসকে শহর পরিবেশে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। মনোহর ডাক্তারের বেনামীতে আপন মনের ক্ষুব্ধতাই লেখক প্রকাশ করেছেন:

> "বলি আছে কি শহরে? গাদা গাদা পোড়া ইট—রসকষ যা-কিছু হাজারলক্ষ মানুষ আগেভাগে শুষে মেরে দিয়েছে। (পৃ. ১৯)

পদীরাণীর মত সরল পল্লীবালাকে জীবিকার জন্য আত্মসম্ভ্রম বিক্রি করে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্য সবার জন্যে উন্মুক্ত। দাক্ষিণ্যের হাত বিস্তার করে আছে সে। শুধু চলে আসার অপেক্ষা। বাদার বাসিন্দা প্রকৃতির সন্তান জগন্নাথের মুখ দিয়ে সেই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে:

> "জগন্নাথ হেসে বলে, খুঁটোয় বাঁধা গরু তোমরা। ভিটে বেড় দিয়ে চক্কোর মার। আরে, বেরিয়েছ তো আবার কেন সেই খোপে ফিরবে? ডাঙারাজ্যে মানুষ কিলবিল করে। জায়গাজমি টাকাপয়সা সকলে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে।... বুঝি শোন বড়দা, ডাঙার দেশ নয়—ভাঁটি

ধরে তরতর করে নেমে যাবে গাজির নাম নিয়ে।…কত বড় দুনিয়া। মানুষজন এখনো সেদিকে জমতে পারেনি—তুমি গেলে তুমিও দিব্যি জমিয়ে নেবে।”

বাদার জঙ্গলে “মা-লক্ষ্মী” ভাণ্ডার জমিয়ে রয়েছেন। তথাপি, এই দুর্গম বাদায় “ঘরবসত ছেড়ে সহজে কে আসতে চায়? আসে পেটের জ্বালায়। ফাটকের দুয়ার থেকে পিছলে এসে পড়ে কেউ কেউ পুলিশের হাত এড়িয়ে। কেউ আসে সমাজের তাড়া খেয়ে। যতদিন বন থাকে, ততদিন বেশ ভাল। …বসত জমলে তখন' যতরকম বায়নাক্কা।” মানুষের বাদারাজ্যে বসবাসের এই হল কাহিনী। 'জলজঙ্গল' 'বন কেটে বসত'এর পূর্বে লেখা হলেও মানুষের বাদায় আসার কাহিনী এবং জনপদ-বিস্তারের বিশ্বাসযোগ্য 'তথ্যনির্ভর কোন বিশ্লেষণ সেখানে নেই।[২]

দুর্গম বাদা অঞ্চলের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের অভ্যন্তরে গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। চরিত্রগুলিও আরণ্য প্রকৃতির প্রতিবেশের সঙ্গে একসুরে বাঁধা। পরিচিত নিসর্গ পরিবেশ, গাছপালা ইত্যাদির সঙ্গে তাদের যোগ আছে। এককথায়, মাটি জল আর মানুষ একাকার হয়ে আছে এই উপন্যাসে — জল ও জঙ্গল জীবন্ত মানুষের পাশাপাশি চরিত্ররূপে ফুটে উঠেছে। সবটা মিলিয়ে লেখক সৌন্দর্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট নরনারী নিসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

“বন কেটে বসত” উপন্যাসে বাদাবনের অধিবাসীদের চরিত্রধর্মে প্রকৃতির এই স্পর্শ থাকলেও স্বাদে আলাদা ভাব। “জলজঙ্গলে”র চরিত্রগুলি শুরু থেকেই তীব্রভাবে জীবন্ত। লেখকের রোমান্টিক আবেগ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রচণ্ড গতিশীল। কোথাও থামবার অবসর নেই। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পরবর্তী ঘটনার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। “বন কেটে বসত” উপন্যাসের আঙ্গিক সংগঠন এরূপ নয়—ঘটনা এবং জীবনপ্রবাহ মন্থর এখানে। বিরাম-বিশ্রামের অঢেল অবকাশ। কোন কিছুতেই তাড়া নেই। পরবর্তী ঘটনার সম্পর্কে নেই ব্যাকুল আগ্রহ। “জলজঙ্গলে”র তুলনায় “বন কেটে বসত”এর জগন্নাথ, বলাই, পচা, রামেশ্বর, শশী, মহেশ অনেক বেশি মার্জিত এবং নাগরিক গুণসম্পন্ন। সর্বোপরি, বাদাবনের অধিবাসীসুলভ প্রেম ও প্রতিহিংসা, দয়া ও

২। “মাটিকে ভিত্তি করে মানুষ সভ্যতা গড়েছে, ভেঙেছে, আবার গড়েছে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে করেছে চাষআবাদ, ক্ষেতখামার…।” বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

দৌরাত্ম্য, উপকার ও উপদ্রব প্রভৃতি বিপরীতমুখী প্রবণতা "জলজঙ্গলে"র মত এখানে ততদূর আরণ্য নয়। পোষ-মানা নগরজীবনের সান্নিধ্যে এসে তারা কথঞ্চিৎ নিষ্প্রভ। নায়ক পরিকল্পনাতেও এই পার্থক্য প্রবল। 'জলজঙ্গল'এ বিশেষ মানুষই পেয়েছে নায়কত্বের গৌরব, কিন্তু 'বন কেটে বসত'এ সুনির্দিষ্ট কোন নায়ক-চরিত্র নেই। অদৃষ্ট এবং প্রকৃতিপরিবেশই সমস্ত ঘটনার নিয়ামক। এতৎসত্ত্বেও "জলজঙ্গল"এ প্রকৃতিধর্মিতা 'বন কেটে বসত' অপেক্ষা যেন বেশি জীবন্ত। কিন্তু আঞ্চলিকতার ছবি শেষোক্ত উপন্যাসে বেশি প্রত্যক্ষ।

আঞ্চলিকতা বলতে যা বোঝায়, মনোজ বসুর উপন্যাসে তারও কিছু স্বাক্ষর আছে। বিল, মাটি ও গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। গ্রাম বলতে যশোহর জেলা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি বোঝেন। শরৎচন্দ্র যেমন হুগলী জেলার গ্রাম্য পরিবেশকে তাঁর রচনার প্রধানতম পটভূমিরূপে নির্বাচন করেছিলেন, তিনিও তেমনি যশোহর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে গ্রহণ করেছেন গল্পের পরিবেশ রচনায়। তবু তার রচনায় আঞ্চলিকতা প্রধান হয়ে ফুটে ওঠেনি। পারেনি আঞ্চলিক জীবন যাত্রার সঙ্গে চরিত্রগুলির জীবনাচরণ-পদ্ধতি একেবারে অভিন্ন হতে। প্রকৃতপক্ষে, আঞ্চলিকতা সৃষ্টির কোন সচেতন প্রয়াস লেখকের নেই। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে চরিত্র ও ঘটনা প্রতিষ্ঠিত করাই লক্ষ্য তাঁর। তাই ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়া কাহিনীর সঙ্গে অঞ্চলের অন্য বিশেষ যোগসূত্র নেই।

'জলজঙ্গল' এবং 'বন কেটে বসত' উপন্যাসদ্বয়ে বাদা অঞ্চলের জীবনায়নে লেখকের আন্তরিকতা উল্লেখযোগ্য। বাদার অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনরীতি ও জীবিকা, গোষ্ঠীগত বিশ্বাস, প্রথাবদ্ধ জীবন, সংস্কার, আচরণ এবং তৎসম্পর্কীয় বিশ্বাসযোগ্য নানা অতিলৌকিক আধিভৌতিক গল্প, রূপকথা উপকথা কাহিনীকে রসসিদ্ধির পথে নিয়ে যায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এরই যথার্থতা নির্ণয় করে 'কল্লোলযুগে' লিখলেন :

> "কল্লোল যে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছে শহরের ইট কাঠ-লোহা-লক্কড়ের মধ্যে, মনোজ তাই খুঁজে পেয়েছে বনে বাদায় খালে বিলে, পতিতে আবাদে। সভ্যতার কৃত্রিমতায় কল্লোল দেখেছে মানুষের ট্রাজেডি। প্রকৃতির পরিবেশে মনোজ দেখেছে মানুষের স্বাভাবিকতা।" (পৃ. ৩১৬)

আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গে হার্ডির সাফল্য মনোজ বসুর রচনায় স্মরণীয়। হার্ডির উপন্যাসে ballad tale-এর প্যাটার্ন মনোজ বসুর উপন্যাসে রূপকথা-উপকথার

ঢঙে বিবৃত। এই সূত্রের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে একটা অঞ্চলের মানুষের বিচিত্র জীবনযাপনের বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার সংস্কার। এক কথায় গোটা আঞ্চলিক জীবনযাত্রা। ঐতিহ্যসম্পন্ন সমাজের প্রাচীন গোষ্ঠীগত অনুশাসন এবং জীবনধারা ও বিভিন্ন বিশ্বাস দুকড়ির আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আদিম মানবসমাজের গোষ্ঠী-পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে সহজেই তাকে এবং মহেশকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু তারা কেউই বনওয়ারীর (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা) মত কঠিন হাতে সমাজকে পরিচালনা করেনি। কিংবা প্রাচীন সংস্কার-শাসিত জীবনের নিয়মকানুন রক্ষার জন্য অতন্দ্র প্রহরীরূপে কাজ করে না। মনোজ বসুর সঙ্গে তারাশঙ্করের পার্থক্য এখানে। অন্তঃশক্তি দ্বারা চালিত হয়ে মনোজ বসু কাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত গতিবেগের মধ্যে আঞ্চলিক জীবনের রূপ ও রঙকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

জীবিকা ও জীবনের ক্ষেত্রে মানুষের প্রাগৈতিহাসিক রূপটি বাদাঅঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনস্বভাবে বিদ্যমান। কেতু ও তার সঙ্গী-সাথিরা বন্য প্রাণীর মত বনে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কে চলাফেরা করে। চরিত্রধর্মও বন্য-প্রাণীর মত হিংস্র, আক্রমণমুখী। বাদাবনে "মানুষ ও জীবজানোয়ারে তফাৎ নেই—তারা নিতান্ত আপনাআপনি।"—এই বনকে তারা জীবনের একমাত্র আশ্রয় ভেবে আঁকড়ে ধরে, জীবনের উপকরণ আহরণ করে বন থেকে। সুতরাং "বনের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কিসের?" বাদাঅঞ্চল জননীর মত প্রতিপালন করে তাদের। জননীর ক্রোলে শিশু যেমন নির্ভয়, বাদাবনে জীবিকা আহরণের কাজে তারাও নির্ভীক তেমনি।

অরণ্যের আদিম পটভূমিতে জীবন ও জীবিকার জন্য কঠিন আত্মপণ সংগ্রাম এবং স্বভাবগত নির্ভীকতা অর্থনৈতিক সূত্রবদ্ধ জীবনের যে ইতিহাস বিবৃত করে, তা বাদাঅঞ্চল-বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষী সত্তার সঙ্গে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের এই মাখামাখি কেতু উমেশ দুকড়ি মধুসূদন রায় (জলজঙ্গল), জগন্নাথ বলাই পচা রামেশ্বর মহেশ (বন কেটে বসত) ইত্যাদির ভিতর প্রত্যক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, বাদাঅঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারার প্রচ্ছন্ন রহস্য, বনবিবির মাহাত্ম্য-কথা, অরণ্যের মোহিনী মায়ার ছলনা, জিনপরীর আশ্চর্য ক্ষমতা, অতিপ্রাকৃতের রহস্য প্রভৃতি গল্প উপ-কথা-রূপকথার প্রকৃতি-সম্পন্ন গাঢ়বর্ণ এবং আঞ্চলিকতায় সমৃদ্ধ। দুকড়ির কণ্ঠে ঐতিহ্যময় এই সনাতন বিশ্বাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসের ভিতর।

বাদাবনের অধিবাসীদের চরিত্রধর্মেও রয়েছে প্রকৃতির স্পর্শ। 'জলজঙ্গলে'র

নায়ক কেতুচরণ প্রকৃতিরই মনুষ্যরূপ। প্রকৃতি "পাথর কুঁদে জীবন্ত দানব করেছেন তাকে।" শক্তিতে, তেজে, দুঃসাহসে, বুদ্ধিতে "ডোরাকাটা চিতা-বাঘের মত।" বাদাবনের মেয়েদের জীবনধর্মিতাতেও ঘটেছে এই নিসর্গায়ন। ইস্পাতের মত গায়ের রঙ তাদের। চলনে "দোয়েল পাখির নাচের ভঙ্গি।" তাদের "হাসির তোড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে জোয়ার-লাগা দেহের যৌবন।" এই প্রকৃতিসুলভ প্রাণধর্মিতা বাদারাজ্যের অধিবাসীদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। শহরের শৌখীন ধনী পরিবারের ছেলে মধুসূদন রায় এখানে এসেছেন মাটির ডাকে। "ঘরবাড়ি মাঠগ্রাম নদীনালার বৈচিত্র্যে বুনন-করা বাংলাভূমিকে" আবাদ আর জনপদ দিয়ে নিজ হাতে সাজিয়ে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। এখানকার বনপ্রকৃতির মানুষগুলোর মত তাঁকেও এজন্য কঠোর সংগ্রাম করে টিঁকে থাকতে হয়। লোকালয়-গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে মধুসূদন বাদাবনের প্রেমে পড়েছেন। প্রকৃতিসত্তার এইরূপ মানুষী রূপায়ন 'জলজঙ্গলে'র প্রতিটি চরিত্রে। সর্বাধিক হয়েছে কেতুর চরিত্রে। জলে ও জঙ্গলে সে সবচেয়ে স্বাভাবিক। মৃত্তিকার আদিমতম সন্তান সে। শক্তিতে, দুঃসাহসে, প্রেমে, দয়ায়, হিংস্রতায়, নিষ্ঠুরতায় সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিজ। "বাদাবনের বাঘ হল কেতুচরণ।" গোটা অরণ্যভূমিই যেন একটা চরিত্র। Envoy'এর জনৈক পত্রিকা-ভাষ্যকার এই সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন : The Jungle, which like a mistress enjoys its inhabitants' love and hate at the same time, is the real hero and the real villain of the story.

বাদাবন প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি। "জলে আর জঙ্গলে, জঙ্গলে আর পশুপাখী-কীটপতঙ্গে ভারি মিতালি। শত শত বৎসরের দিনরাত্রি প্রতিমুহূর্তে তাদের উদ্দাম কথাবার্তা ও মেলামেশা চলেছে।… বাঘ ঘুরে বেড়ায়, কুমির রোদ পোহায়, হরিণশিশু খেলা করে।" আদিম পরিবেশের সুন্দর, শান্ত, স্নিগ্ধ বন্যরূপের বর্ণনা যেন একটি চিত্ররূপময় গীতিকবিতা।

প্রকৃতির এই আদিম নিকেতনের অরণ্যমর্মরে নিত্যকালের মানবমনের বাসনাগুলিও যেন মর্মরিত হয়—লেখক তাকে যাথার্থ্য করে তুলবার জন্য এঁকেছেন নানা অভিনব চরিত্র। বাদাবনের মানুষ কেতু, উমেশ, গোলপাঁচু, গুলিপাঁচুদের কাছে এই স্বাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ছন্নছাড়া, স্নেহ-প্রেমহীন জীবনে তারা কিছুই পায় নি, অরণ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের জীবন হয়েছে বনের বাঘের মত- শয়তানি শঠতা ও হিংস্রতায় নির্মম। তারাও কিন্তু অন্য সাধারণ

মানুষের মত ঘরসংসারের জন্য প্রত্যাশী, তারা স্নেহ প্রেমের কাঙাল। ঘটনা-সংস্থাপনের কৌশলে, নাটকীয়তার আকস্মিক চমকে, জীবনচৈতন্যের বৃহত্তর দর্পণে তাদের এই গূঢ় গভীর সত্যরূপ ধরা পড়ে গেছে। দুর্লভ হালদারের কুৎসিত ছেলেটাও তাদের জীবনে আসে দেবদূতের মত। তার উৎকট কান্নায় অতিষ্ঠ হয়ে কেতু তাকে জলে ফেলে দেবার কথা ভেবেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই হৃদয়াবেগে অভিভূত হয়ে বুকে আগলে ধরেছে। সোপার মত হালকা, কিম্ভূতকিমাকার রক্তমাংসের দলাটা নিয়ে লেখক বাৎসল্যের এক মধুর আলেখ্য রচনা করেছেন। গৃহজীবন ও নীড়ের জন্য ক্ষুধিত মানুষগুলির স্নেহমমতায় সম্পর্ক লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বাদাবনের বাঘদের স্বভাব ধীরে ধীরে কোমল নম্র হয়ে আসে। আবেগে অনুরাগে কেতুচরণ জড়িয়ে ধরে জোৎস্নাভূষণকে। মরুভূমির মত শুষ্ক জীবনে ছেলেটি মরূদ্যানের মত তাদের জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও সম্বল। জোৎস্না-ভূষণও প্রকৃতির এই অর্ধসভ্য সন্তানদের পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছে, তাদের অকৃপণ স্নেহ আর আদর পেয়ে সে কান্না ভুলে গেছে। ছেলেটিকে প্রসন্ন ও খুশি রাখার জন্য দুর্ধর্ষ মানুষগুলির ছেলেমানুষির অন্ত নেই। এই আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি তাদের জীবনের প্রকৃতিমর্মিতার দান। জঙ্গলের ভিতরও নিত্য চলে এই জীবন-উৎসব—"ছল ছল হাসিরহস্য হয় সুগোপন ছায়াচ্ছন্নতায়। সূর্য দেখতে পায় না, চাঁদ তারা দেখে না।"

মন তাদের প্রাপ্তির আনন্দে ভরে গেছে। হারানোর ভয়ে তারা বিচলিত। তাই, দুর্লভ ছেলে নিতে এলে উমেশ তাকে নিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করে, কেতুচরণ টাকার পণ নিয়ে দরকষাকষি করে, নানা অছিলা করে ফিরিয়ে দেয় তাকে। অবশেষে, সন্তানের স্বত্বাধিকার থেকে দুর্লভকে চিরতরে সরিয়ে দিয়ে, তাকে হত্যা করে তারা এক শান্তিপূর্ণ অজানা গৃহজীবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। নীড়হীন মানুষের গৃহজীবনের প্রতি এই আসক্তি উপন্যাসের পৃষ্ঠায় চিত্রায়িত পরম জীবনসত্য।

বাদাঅঞ্চলের আরণ্য পরিবেশের আর এক কাহিনী—'বন কেটে বসত'। উপন্যাসদ্বয় মিলে একটি পরিপূর্ণ আঞ্চলিক জীবনবৃত্ত রচনা করেছে। 'জলজঙ্গল' বাদাবনের কাহিনী, 'বন কেটে বসত' বাদার ইতিহাস। বাদায় মানুষের আগমনের পশ্চাতে আছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং গ্লানিময় ব্যক্তিগত জীবন সমস্যা। গগনের ভাগ্যান্বেষণের সূত্র ধরে লেখক তার বিশ্লেষণ করেছেন। ধনীর দুলাল মধুসূদন রায়ের আগমন উপলক্ষ্য করে 'জলজঙ্গলে'

অনুরূপ কোন সত্য উদ্ঘাটিত হয় না। 'বন কেটে বসত' উপন্যাসের এই স্বাতন্ত্র্য সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিতে পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি।

গগনকে অনুসরণ করে পাঠক বাদারাজ্যে আসেন। গগনের ভাগ্যান্বেষণের সূত্রে সমস্ত কাহিনী বিধৃত। তৎসত্ত্বেও এই উপন্যাসের নায়ক সে নয়। বস্তুত উপন্যাসে কোন নায়ক নেই, বলা চলে। থাকলে, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ সে নায়ক।

স্বার্থসন্ধানী মানুষ বিস্তীর্ণ জঙ্গল ধ্বংস করে মানুষী সভ্যতা বিস্তার করে চলেছে। জগন্নাথের মত সরল নির্লোভ শিশুপ্রকৃতির লোকে মিলেমিশে বন কেটে বসত নির্মাণ করে। তারপর লোভী, স্বার্থপর, দস্যু-মানুষের দল এসে তার স্বত্ব ভোগ করে। গগন এবং নগেনশশী, টোনি চক্রবর্তীর মত নীচ ষড়যন্ত্রী মানুষরা পরস্পর দুধে আমে মিশে যায়। আঁটির মত পরিত্যক্ত হয় জগা পচা বলাইয়ের দল। অথচ এদের পরিশ্রমে, বাদারাজ্য মানুষ বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠেছে। জলজঙ্গল পরিবেষ্টিত মনুষ্যহীন রাজ্যে জীবন ও জীবিকার জন্য তাদের কঠিন সংগ্রাম, বলিষ্ঠ কর্মোদ্যম, সরল আত্মবিশ্বাস, মাছ-ধরা, নৌকা-বাওয়া, ভেড়ি-বাঁধা, বেপরোয়া উদ্দাম জীবনোচ্ছ্বাসের মধ্যে এক অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে ওঠে। নগেনশশী, টোনি চক্রবর্তী, প্রমথ, নিবারণের হঠাৎ আগমনে প্রকৃতির এই শান্তিপূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন রাজ্যের অফুরন্ত আনন্দউল্লাসে ছেদ পড়ে যায়। বিনোদিনী, চারুবালা বাদারাজ্যে এক নতুন জীবনের সূচনা করে। অনভ্যস্ত জীবনযাত্রা বাদার মানুষদের মুগ্ধ করলেও তারা অন্তরের কোন আকর্ষণ অনুভব করে না। তাই, লোকালয়ের বাইরে মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতির পরিবেশে নতুন করে নীড় রচনার উদ্দেশ্যে আবার নৌকো ভাসায় তারা প্রকৃতির মতই স্বাধীন তারা—মুক্তজীবনের অভিলাষী। লোভ এবং বন্ধনের অধীন নয় বলেই প্রকৃতিতে তারা এই রকম বেপরোয়া ও ছন্নছাড়া। প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ চরিত্রের সার্থক রূপায়নের প্রয়াস থেকেই জলজঙ্গল পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি প্রধান চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সাফল্যের মূলে আছে লেখকের রোমান্টিক ধর্ম, যার ব্যাপ্তির মধ্যে ফুটেছে উপন্যাসের আঞ্চলিকতা।●

পল্লীর প্রতি লেখকের গভীর ভালবাসা থেকে এক নতুন জীবনদর্শনের সূত্রপাত। পল্লীপ্রকৃতি এবং মানুষ যেন পরস্পরে সহযোগী হয়ে জীবনের পূর্ণতা অর্জন করেছে। সেইজন্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্র পল্লীর টানে যেমন শহর থেকে গ্রামের মধ্যে ফিরে আসে (আমার ফাঁসি হল), তেমনি মনের মানুষ

খুঁজতেও কখন কখন তারা গ্রামে এসে পড়ে (এক বিহঙ্গী)। গ্রামের মধ্যে জীবনকে ফুটিয়ে তোলায় লেখকের অনায়াসলব্ধ দক্ষতা।

'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসে সহৃদয় শিল্পীর গ্রামবাংলার প্রতি যে বিশেষ মমতা আছে, অতিপ্রাকৃতের রোমাঞ্চঘন পরিবেশেও তা দুর্লক্ষ্য নয়। 'আমি' চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক নগরের প্রতি বিতৃষ্ণাভাব প্রকাশ করেছেন। পরিবর্তে কামনা করেছেন এক প্রশান্ত বিস্তৃত মুক্ত স্বাধীন জীবন। কটাক্ষ করেছেন নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতাকে। শহরের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মানুষ হারান তার মনের আকাশ, পঙ্গু করে আপন চিত্তবৃত্তিকে।

শহরের ছেলে হলেও 'আমি' চরিত্র গ্রামকে ভালবাসে। এই ভালবাসা মানস-বিলাসিতা নয়। গাছপালা, নদী, মেঘের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে গান গায়, কবিতা লেখে। গ্রামের সংস্পর্শে এসে অন্তরে যে ভাবাবেগের উদ্বোধন হয়, শহর পরিবেশে তার অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ নেই। পূজোর ছুটিতে শহরে এসে অজ্ঞাতপূর্ব উপলব্ধি লাভ করে সে। "এত পেয়ারের শহর—এখন একটা দিনে হাঁপ ধরে আসে। সারবন্দি যত ইটের খাঁচা, পোকামাকড়ের মত মানুষ তার মধ্যে কিলবিল করে। খটখটে বাঁধারাস্তা-গুলো জুতোর তলায় যেন মুগুর মারছে প্রতি পদে। বিশ্রী, বিশ্রী।" প্রকৃতপক্ষে গ্রাম-প্রকৃতি 'আমি' চরিত্রের জীবনের মতই সত্য। কিংবা জীবনেরই এক বিকল্প। 'আমি' চরিত্রের ভাবকল্পনায় এই নিসর্গভাবনার প্রতিফলন এক অত্যাশ্চর্য রূপ লাভ করেছে।

ভাইপো টুনুর বালক-হৃদয়ের আত্মপ্রসারণ শহরের কৃত্রিম পরিবেশে অসম্ভব। অন্তরের দিক দিয়েও তাকে বন্দী এবং নিঃসঙ্গ মনে হয় 'আমি'র। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে বেড়ে ওঠে বলেই তাদের জীবনে একটা মুক্ত স্বচ্ছন্দ রূপ আছে, যা কলকাতার ছেলেরা কখনও পেতে পারে না। এই আক্ষেপে মন বিষণ্ণ হয় 'আমি'র। গ্রামের তুলনায় শহরের জীবন যে কত শূন্য ও রিক্ত, লেখক 'আমি' চরিত্রের অনুভূতির মধ্য দিয়ে তা ব্যক্ত করেছেন। "আহা, ঘুড়ি নিয়ে মাঠের এপার-ওপার ছুটোছুটি করে না, পাকে ঝাঁপায় না, গাছের মগডালে উঠে ডাল বাঁকিয়ে জামরুল পাড়ে না, বিলের আ'ল বেয়ে ছোট্ট ছাতা মাথায় গুটগুট করে নেমন্তন্ন খেতে যায় না ভিন্ন গ্রামে। কী-ই বা পাচ্ছে জীবনে!" গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানে যে বিচিত্র জীবনপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, 'আমি' চরিত্র তাকে সমস্ত দেহমন দিয়ে অনুভব করে। মানুষের পরিপূর্ণতা একমাত্র প্রকৃতির সাহচর্যেই সম্ভব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অতিপ্রাকৃত ঃ

প্রেতলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের বার্তা-বিনিময়ের গোপন সুড়ঙ্গপথটি বিভূতিভূষণের রচনায় সার্থক শিল্পগৌরব লাভ করেছিল ; মনোজ বসু "আমার ফাঁসি হল" উপন্যাসে তাকেই আবার শিল্পরূপ দিয়েছেন। ভিন্নতর উভয়ের শিল্পধর্ম, এবং জীবনদর্শনের মধ্যেও গভীর পার্থক্য আছে। মৃত্যুচেতনা থেকে বিভূতিভূষণের পরলোকতত্ত্বের উদ্ভব। মৃত্যু সম্পর্কে অনুরূপ কোন উপলব্ধি মনোজ বসুর জীবন-চেতনার অঙ্গীভূত হয়নি। উপনিষদের আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং জন্মান্তরবাদের প্রতি বিভূতিভূষণের বিশ্বাস মনোজ বসুর কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে না। নিছক গল্পরস সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থেকে "আমার ফাঁসি হল" উপন্যাসের পরিকল্পনা। বলতে পারি, লেখকের "ছায়াময়ী" গল্পই সম্প্রসারিত হয়েছে "আমার ফাঁসি হল" উপন্যাসে। মৃত্যুর পরে আত্মা ইহজগতের বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারে না। অক্ষয় তৃষ্ণা নিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ায় বাতাসে। বিভূতিভূষণের কাছে মৃত্যু এক পারলৌকিক তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। মনোজ বসুর কাছে মৃত্যু জীবনরস আস্বাদনের অঙ্গরূপে আবির্ভূত।

কাহিনীর মূল, অতিপ্রাকৃত রহস্যরস আস্বাদন। "জন্মের পর থেকে বেঁচে ছিলাম অথবা ফাঁসির পরেই বেঁচে উঠলাম, কার কাছে খাঁটি জবাব পাই?" —এরই জবাবের সূত্রেই সাহিত্যায়ন এগিয়েছে অসংখ্য জিজ্ঞাসায়। মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থার এক অজ্ঞাতপূর্ব কাহিনী এই উপন্যাসে যে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে তা রোমান্সরসে পরিপূর্ণ। বিভূতিভূষণের সঙ্গে লেখকের জীবনদর্শনের পার্থক্য এই উপন্যাসে সুস্পষ্ট হলেও এক জায়গায় তাঁদের পরস্পরের মিল সুগভীর। বিভূতিভূষণের মত মনোজ বসুও মৃত্যুর আনন্দরূপ উপলব্ধি করেছেন।

মৃত্যু জীবনের পূর্ণচ্ছেদ নয়, মৃত্যুর পরে জীবন আবার এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনস্মৃতি চারণা করার অদ্ভুত ক্ষমতা পায়। এইদিক দিয়ে "আমার ফাঁসি হল" ও "দেবযান" উপন্যাসের আদর্শগত মিল আছে। কিন্তু "দেবযান" উপন্যাসের পরিকল্পনায় দেখি, আত্মা

দেহরূপ ত্যাগ করলে বিভিন্ন স্তর পর্যায়ে বিন্যস্ত হয় ; এবং কৃতকর্ম অনুযায়ী আত্মা নিম্নগামী ও ঊর্ধ্বগামী হয়। এই বিশেষ তত্ত্বের যথাযথ বিন্যাসের অসংগতি দেবযান উপন্যাসের ব্যর্থতার কারণ। বিভূতিভূষণের মত মনোজ বসুও পার্থিব প্রেম ও স্নেহভালবাসার প্রতি অপরিসীম আকর্ষণ অনুভব করেন। বিভূতিভূষণ অপেক্ষা মনোজ বসু মর্ত্যমমতা ও মানবপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন অধিক। তাত্ত্বিকতা পরিহার করার জন্যেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। গল্পের সম্ভাব্যতা বিচারের অবকাশ নেই এখানে ; উপন্যাসের কক্ষপুটে দেখি, জীবন ও ম ণ দিয়ে ঘেরা একটা বেষ্টনী। মৃত্যুর পরপারে বসে 'আমি' চরিত্র তার স্বাদ নিচ্ছে। মৃত্যু আতঙ্কের না দুঃখের ? বাস্তবের চেয়ে মৃত্যুর জগতে মানুষ কি বেশি সুখী ? বিভূতিভূষণের "দেবযান"এর যতীনের মত 'আমি' চরিত্রেরও মনে হয় মৃত্যুর পরে কি আরো বেশি জীবন্ত ও সুখী সে ? মৃত্যু এদের উভয়ের জীবনে পূর্ণচ্ছেদ নয়, মৃত্যুর পরপারে আছে এক সুন্দর প্রশান্ত জগতের রহস্যময় অবস্থান। যার সংবাদ লোকসমাজে অজ্ঞাত।

লেখকের পরিবেশনা গুণে সমগ্র কাহিনী উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, রোমান্স ও বাস্তবের সমন্বয়ে এগিয়েছে সাহিত্যায়ন। অনুভূতি কখনো লঘু রোমান্সের স্বচ্ছ সলিলে সফরীধর্মী, কখনো বা বাস্তব-চেতনায় রহস্যসুন্দর।

'আমি' চরিত্রের বিরাটগড় আগমন উপলক্ষ করে একদিন জীবন-ট্রাজেডির সূচনা হয়েছিল। মৃত্যুর পরপারে বসে সেই প্রতারিত জীবনের যে গল্প সে বলে, তা লেখকের মর্ত্যমমতার সূত্রেই বিধৃত। এই মর্ত্যপ্রীতি প্রকৃতিলালিত পল্লীমানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রদ্ধা ও কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

লেখকের প্রকৃতিপ্রেমে এমন কতকগুলি লক্ষণ ফুটে উঠেছে, যেগুলি অসহায় মানবভাগ্যের প্রতীক। এই উপন্যাসে লেখক নায়কের দুঃখের ইতিহাস বর্ণনা করেননি, কিংবা নায়কের ভাগ্যবিপর্যয়ের পিছনে নিয়তির ক্রূর চক্রান্তের ছক এঁকে দেখাননি। ঘটনাগুলো কিন্তু এমনভাবে ঘটেছে যা থেকে নিয়তির প্রভাব প্রতীয়মান হয়। বলতে পারি, প্রেতলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের বার্তা-বিনিময়ের গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে নিয়তি এসেছে চম্পার ছদ্মবেশে। বিরাটগড়ের গোলাবাড়ীতে তার সেই ফাঁদ পাতা—তার পরে সেই ফাঁদের ফাঁস 'আমি' চরিত্রের গলায় গিয়ে পড়েছে।

এই উপন্যাসে মনোজ বসুর প্রকৃতিপ্রীতি রোমান্সসৃষ্টির এক অভিনব

কৌশল। এক ব্যর্থ প্রেমকাহিনীকে অতিপ্রাকৃতের রহস্যে আচ্ছন্ন করে আখ্যানভাগকে তিনি রোমান্টিকধর্মী করেছেন। বিদেহী তরুণী চম্পার প্রণয়তৃষ্ণা, মানুষী প্রেমের উত্তপ্ত নিবিড় স্পর্শআকাঙ্ক্ষার লোভকে কেন্দ্র করে এক উপভোগ্য প্রণয়বিধুর কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে।

দস্যুর হাতে আকস্মিক মৃত্যুর জন্য চম্পার বিয়ের সাধ পূর্ণ হয়নি। বিরাটগড়ে 'আমি' চরিত্রের আবির্ভাব চম্পার বিদেহী জীবনে প্রেমের সঞ্চার করে। জীবনতৃষ্ণার এই পরিণতি চিত্রণ উপন্যাস-লেখকের উদ্দিষ্ট। মানুষের প্রেমের লোভে আবার বেঁচে উঠবার আকুতি চম্পাকে পেয়ে বসেছে। মানুষের কায়া ধরে কখনো বা মানুষের দেহে আপনার অশরীরী ছায়া বিস্তার করে অতৃপ্ত জীবনপিপাসা চরিতার্থ করে সে। প্রেতপুরীতে শুধুই তৃষ্ণার্ত হাহাকার, অপূর্ণ ভোগ নিয়ে বেদনা। চম্পা তাই বলে: "কুৎসিৎ লাবণ্যের গায়ে কতদিন ছায়া হয়ে ঘুরেছি।...ওই মেয়ে যা নয়, তাই সাজিয়ে দেখিয়েছি। লোভে পড়ে করেছি যদি দুটো ভালবাসার কথা বল, যদি একটু ছোঁয়া দাও, একবার যদি আলিঙ্গনে বাঁধ। আমার ছায়ায় লাবণ্যের তুমি ওই রূপ দেখেছিলে।"

চম্পা প্রতারণা করলেও প্রেতপুরীতে মৃত্যু বেদনাদায়ক নয়। এমন কি আত্মার কষ্ট পর্যন্ত নেই সেখানে। আছে নিরুদ্বিগ্ন অমেয় আনন্দ। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বাস্তব পৃথিবীর ব্যথা বেদনা, দুঃখ-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে ওঠা যায়। প্রেতাত্মা প্রভাস বলে 'দিব্যি আছি, বড্ড স্ফূর্তিতে রয়েছি। সব ভার-বোঝা মাথা থেকে নেমে গেছে। শরীর হাল্কা, মনও তাই। এত আমরা জীবনে পাইনে।' "দেবযানে"ও এই উপলব্ধি এক অনির্বচনীয় শিল্পরূপ লাভ করেছে। তাই দেখি, চম্পা দয়ালহরি প্রভাস, 'আমি' ভিন্ন সকলেই, জীবনের এক পরিণতিতে রূপান্তরিত। সেই অবস্থা হল 'বায়ুভূত'। এখানে কালের হস্তস্পর্শ নেই। সবই পরিবর্তনহীন। কারো সম্পর্কে বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, স্পৃহা—কিছুই নেই। মৃত্যুলোকে দেহহীন জীবন প্রেতাত্মাদের কাছে যত প্রিয়ই হোক, লেখকের জীবনদর্শনের প্রতিভূ চম্পা ও 'আমি' চরিত্র। প্রেতলোকের অসহনীয় অবস্থার প্রতি তাদের বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণাই প্রকাশ পায়। চম্পা বলে: "মাংস চাই, রক্ত চাই, মাটির উপর পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতে চাই। বাতাস হয়ে ভেসে ভেসে আর পারি নে।" 'আমি'চরিত্র ফাঁসির অব্যবহিত পরে ঠিক এই উপলব্ধি লাভ করে। নিস্পন্দ দেহটা লক্ষ্য করে বলে: "থুতু ফেলছি, থুঃ থুঃ—থুতু পড়ে না তো মুখ দিয়ে। লাথি মারব ওই কুৎসিত দেহটার ওপর... ছুঁতে পারিনে, পায়ের স্পর্শ পাইনে। বায়ুভূত হয়ে গেছি।" এই তীব্র

হাহাকারের ভিতর দিয়ে লেখকের মানবপ্রীতি ও পৃথিবীপ্রীতি অভিব্যক্ত হয়েছে।

"আমার ফাঁসি হল" উপন্যাসে বড়দের উপযোগী ভৌতিক গল্প শোনানোর প্রতিশ্রুতি থাকলেও ভৌতিক গল্পের ভয় লাগানো রহস্যে তা ব্যাপক ও গভীর নয়। অতিলৌকিক জগতের সাংকেতিকতায় গল্পরস পূর্ণ হলেও কোন দুরূহ জটিল পারলৌকিক তত্ত্বের দ্বারা তা ভারাক্রান্ত নয়। প্রেতলোক ও মনুষ্য-লোককে আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত করাই হল মনোজ বসুর কবিপ্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহকপোতের মঞ্জু কূজন ঃ

মনোজ বসুর অনেক উপন্যাস পারিবারিক জীবনরসে সমৃদ্ধ। সেখানে পারিবারিক জীবনছায়ায় মধ্যবিত্ত জীবনচর্যার ঘনিষ্ঠরূপ ফুটে উঠেছে। যুগগত ক্ষয় অবসাদ অর্থনৈতিক দুর্দশা জীবনচর্যাকে দুর্বল পঙ্গু করে রাখলেও নৈরাশ্য এবং হতাশার মধ্যে পথ হারাননি লেখক। স্নেহ প্রেম-ভালবাসার মাধুর্য দিয়ে আঁকলেন মানবের কল্যাণস্নিগ্ধ পারিবারিক জীবনের প্রসন্নমধুর রূপ। রোমান্সের মুরলী বাজিয়ে আলাপ করলেন বিলম্বিত লয়ে।

গার্হস্থ্য-জীবনের নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে অস্তিত্বের চরিতার্থতাকে লেখক প্রধান করে দেখেছেন। নিঃসঙ্গ নির্বাধ আকাশে উড়ে বেড়ানোয় তাঁর তৃপ্তি নেই। সমষ্টিবোধ সর্বজনের কল্যাণময় জীবনভূমিতে টেনে আনে তাঁকে। জীবনের সুলভ অভিজ্ঞতাগুলি—প্রচুর প্রাপ্তিতেও যাদের সম্পর্কে আমাদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, পারিবারিক জীবনের শান্ত শীতল ছায়াতলে লেখক তাদের চিত্রপটে আঁকলেন। উৎকট, উদ্ভট সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার বীজ বপন করে এখানে তিনি ছবির হারমনি বিপন্ন করেন না। রোমান্টিক স্বপ্নাবেশ এবং মানবিক প্রত্যয় মিলে অপূর্ব জীবনরাগের সৃষ্টি করে।

মানবচরিত্রের গোপন গভীরে সঞ্চরমান শিল্পীচেতনা প্রধানত নারীর মনোভাবকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করেছে। প্রেম ও বাৎসল্য নারীর সহজাত হৃদয়ধর্ম। লেখক নারীস্বভাবের চিরন্তন গৃহআকাঙ্ক্ষা ও বাৎসল্য-এষণাকে রোমান্সের কৌমুদীরাগে স্নিগ্ধ লাবণ্যময় করে তোলেন।

প্রসঙ্গত বলা বলা যায়, শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রও মনোজ বসুর মত গৃহলোভাতুর। কিন্তু বিষয়নির্বাচন এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁদের মধ্যে পার্থক্য প্রবল। শরৎচন্দ্রের নারীর মধ্যে সমাজ সংস্কারের দ্বন্দ্ব এবং পারিবারিক বিরোধ। প্রেমে আত্মদানের পথে কিংবা বাৎসল্য প্রকাশের পথে কেবলই হৃদয়বৃত্তিগত সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। অজস্র বন্ধনপীড়িত প্রেমচেতনা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ করে যখন বাইরের বাধা উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়, তখন অন্তরের চিরন্তন সংস্কারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে। এমনি করেই তাঁর প্রেম বিরোধ ও অনিশ্চয়তার পথ ধরে যাত্রা করে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের টানা পোড়েনে নারীর বাৎসল্যের মহিমা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে জীবনরসের ব্যঞ্জনায় তরঙ্গিত হয়েছে।' শরৎচন্দ্রের এই পদ্ধতির সঙ্গে মনোজ বসুর দৃষ্টিভঙ্গির কোন মিল নেই। মনোজ বসুর নায়ক-নায়িকারা সামাজিক সংস্কার ও সংঘাতের বাইরে প্রেমের মুক্ত রূপে প্রকাশ পায়। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দুটি উন্মুখ প্রাণ ছোটে সকল নিয়মশৃঙ্খলা-মুক্ত প্রেমের বেদীতে আত্মদান করতে। মনোজ বসুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আপাতদৃষ্টিতে যাকে মিল বলে মনে হয় তা হল আদর্শ এবং জীবনবোধের। রচনাধর্ম কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির মিল নয়।

রোমান্সকে মনোজ বসুর উপন্যাসে সাধারণ লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যায়। কোথাও কোথাও এই রোমান্স বাস্তবের সঙ্গে সুসমন্বিত হয়ে উদ্ভাসিত করেছে জীবনের রহস্যসুন্দর মূর্তি। রোমান্সপ্রিয়তার জন্যই মনোজ বসুর উপন্যাসে অনেক সময় কাহিনীর অবলম্বন নরনারীর প্রণয়দ্বন্দ্ব। পূর্বরাগের পটভূমিকায় আকর্ষণ বিকর্ষণের টানাপোড়েনে প্রেম মধুর ও মিলনান্তক হয়ে ওঠে। পূর্বরাগ আবার দুই জাতের—বিবাহপূর্ব এবং বিবাহোত্তর। মনোজ বসুর দাম্পত্যচিত্র প্রেমসর্বস্ব। বাৎসল্যরসে ভিয়ান করে কখন কখন সে প্রেম গার্হস্থ্য জীবনধর্মের উপযোগী করে গঠন করা হয়েছে।

মনোজ বসু যথার্থই গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রকর। তাই দেখি, "আগস্ট ১৯৪২"এর বিক্ষুব্ধ রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে লেখক বেশীক্ষণ আবিষ্ট থাকতে পারেন না। ক্লান্ত হয়ে পড়েন। রোমান্টিক চেতনা রাজনৈতিক ঘটনাকে পিছন থেকে দাম্পত্যজীবনকে মুখ্য সম্পদ করে তোলে কাহিনীর আদি ও অন্তে। এই দুই অংশের উপাখ্যান মূলত চন্দ্রা ও শিশির এবং যূথী

ও মহিমের দাম্পত্য জীবনকে অবলম্বন করে। রাজনৈতিক ঘটনাবলী সৃষ্টি করে তখন পারিবেশিক উত্তাপ।

"এক বিহঙ্গী" গার্হস্থ্য জীবনের মধুর গল্প। পারিবারিক জীবনের স্নেহ-ভালবাসা লেখকের রোমান্টিক কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। চাকুরির সন্ধানে মিহির গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে। তাকে নিয়ে কাহিনীর গোড়াপত্তন। তার সরল সাদাসিধে গ্রাম্য আচরণ ও কথাবার্তা শহরের মেয়ে অনীতার কাছে খুব কৌতূহলের ব্যাপার। এই কৌতূহলই পূর্বরাগে রূপান্তরিত হয়ে মিহিরের প্রতি অনুরক্ত করে তাকে। লেখকের সরস কৌতুকপ্রিয়তা অনীতার প্রাণোচ্ছল স্বভাবের সঙ্গে সাধারণভাবে মিশে যাওয়ার ফলে জীবন-উপভোগের ক্ষেত্র হয়েছে মাধুর্যময়।

'এক বিহঙ্গী' উপন্যাসের বিষয়নির্বাচনে মনোজ বসুর সুগভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃস্নেহবঞ্চিত ধনীর মেয়ে পিতার স্নেহে আদরে প্রশ্রয়ে পালিত। দুঃখ কি বস্তু, জানেনা সে। অনীতা লেখকের পুরোপুরি রোমান্টিক সৃষ্টি। মুক্ত বিহঙ্গ সে। দুইপক্ষ বিস্তার করে রোমান্সের স্বপ্নরাজ্যে সে বিচরণ করে। বর্ষার ভরা নদীর মত টলমল করছে তার যৌবন। স্রোতের জলের মত অস্থির তার মন। নিজের কাছে নিজেই সে একটা রহস্য। আপন মনের খবরই ভাল করে জানে না সে। অনীতার এই মনন-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন জটিল মনস্তত্ত্বের অবতারণা করেননি লেখক। কিংবা philosophy of sex বা কামতত্ত্বের কোন ধার ধারেননি।

অনীতার জীবন ও মননের সমস্যা আবরণমুক্ত করতে গিয়ে লেখক গ্রামের মানুষ আশ্রয় করেছেন। এর মূলে রয়েছে গ্রামের প্রতি অসীম মমত্ব। গ্রামেই আছে জীবনের স্বাভাবিকতা। শহরের জীবন কৃত্রিম। শহরজীবনের প্রতি লেখকের বিরূপতা প্রকট হয়ে উঠেছে অলোক ও মিহিরকে ভিন্ন পরিবেশে স্থাপন করে উভয়ের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ-বিশ্লেষণের মধ্যে। নাগরিক জীবনের ঔজ্জ্বল্য এবং চমৎকারিত্বে অলোক যতই আকর্ষণীয় হোক, আত্মধর্মে দুর্বল সে। অপরপক্ষে, মিহিরের শান্ত নম্র আচরণ সন্ধ্যাদীপের মত আত্মপ্রত্যয়েও ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। শহরের মানুষের সঙ্গে গ্রামের মানুষের এই মানসিক বৈষম্য লেখকের কাছে সাতিশয় কৌতুকপ্রদ। অনীতার সম্পর্কে অলকের আচরণ অনেকটা ফ্রেমে-বাঁধা। অনীতার মনের মিটার মেপে অলককে চলতে হয়। অনীতাকে বিচার করা বা তার পথ থেকে নিবৃত্ত করানোর মত দৃঢ় ব্যক্তিত্ব অলকের নেই। নাগরিক কৃত্রিমতায় অলকের চরিত্র আড়ষ্ট। এ হেন

চরিত্র অনীতার জীবনে নিতান্তই বেমানান। এ প্রেম কোন কল্যাণই সূচিত করে না, জীবনকে মাধুর্যে অভিষিক্ত করার পথেও অন্তরায়। কামনার জৈবিক তীব্রতা ক্ষণস্থায়ী, বাসনার মানবিকমাধুর্য অবিনশ্বর। অনীতার জীবনাদর্শের সার্থক রূপ দেবার জন্য মিহিরের মত দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রের প্রয়োজন। গ্রাম থেকে লেখক যেন ছেঁকে এনেছেন মিহিরকে। মিহিরের ভিতর কৃত্রিমতা নেই, নিজের সঙ্গে তার নেই কোন প্রবঞ্চনা। গ্রামের মতই সে খোলামেলা, সাদাসিধে। শহরে এইরূপ চরিত্রগুণ দুর্লভ। তাই প্রথম দেখাতেই অনীতার মন ছুঁয়ে যায়। অনুরাগরঞ্জিত হয়ে সে বলে : "ছেঁড়া বস্তায় খাস, চাল"।

অনীতার ভাল-লাগা এগিয়েছে তির্যক পথে। প্রচণ্ড জেদি খেয়ালি মেয়ে হয়েও মিহিরের নির্দেশকে সে অবজ্ঞা করতে পারে নি। মিহিরের ব্যক্তিত্ব তাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করেছে। সমস্ত ওলট-পালট করে দিয়ে সে নাটকীয়ভাবে বিয়ে করে মিহিরকে। এই বিয়েয় মনের আবেগ যতখানি ছিল, ততখানি ছিল না বিচারবোধ। অচিরেই সংকট সমস্যার সৃষ্টি হল তাদের দাম্পত্যজীবনে। এর মূলে রয়েছে অনীতার খামখেয়ালিপনা ও মিথ্যা আভিজাত্যের মোহ। কল্যাণ ও শ্রী-মণ্ডিত গার্হস্থ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে তার আচরণের অসংগতি ছিল পরম বাধা। অলকের সঙ্গে বিয়ে হলে অনীতার মানস-পরিবর্তন সম্ভব হত কি-না সন্দেহ। কারণ, অলকদের মত অভিজাত পরিবারে ক্লাব, থিয়েটার নিয়ে অষ্টপ্রহর মাতামাতি মেয়েদের পক্ষেও ফ্যাশান বলে গণ্য। গৃহবধূর স্নিগ্ধ লাবণ্যময় কল্যাণীরূপ অলকদের পরিবারে গড়ে ওঠা কঠিন। মনোজ বসু প্রধানত ঘরোয়া জীবনের রূপকার। মেয়েদের প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য গার্হস্থ্যজীবনধর্মের মধ্যেই নি প্রত্যক্ষ করেছেন। অনীতার অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা সংশোধনের জন্য মিহিরের মত প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলিষ্ঠ স্বভাবের পুরুষেরই প্রয়োজন।

অনীতা মাতৃহীন হওয়ার জন্য তার প্রকৃত স্বরূপ কেউ বোঝেনি। পুরুষের মত বাইরের জগৎ নিয়ে মেতে থাকে সে—মন রয়ে গেছে ফাঁকা। বাইরের চাঞ্চল্য দিয়ে ভরিয়ে রাখে ফাঁকটা। মিহিরের ভালবাসা এবং বিয়ের বন্ধনও রাতারাতি পরিবর্তন আনতে পারে নি। বন্ধন-অসহিষ্ণু মন পাড়াগাঁর পরিবেশে অস্থির হয়ে ওঠে। বাপের জন্য মন চঞ্চল হয়। ফুলশয্যা মিটবার আগেই সেখান থেকে সে পালিয়ে আসে। বাড়ি ফিরে দেখল পিতা নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মটা প্রথম অনুভব করল সে। কিন্তু তখনও রূপটা স্পষ্ট নয়, অবচেতন মনে কেবল

একটা ছায়া পড়ছে। ক্লাব, থিয়েটার আমোদ-স্ফূর্তি দিয়ে নিজেকে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু মনের শূন্যতা কেবল বেড়েছে তাতে। অলকের চোখ দিয়ে লেখক দেখালেন তাকে : "আগেও অনীতা দেবীকে কত দেখেছি—এত হাসতে দেখি নি কখনো। পাগলের মত হাসছেন।" অনীতার অন্তর্দ্বন্দ্বের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মনোবিজ্ঞানের আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মনের রিক্ততা একদিন অবশেষে চিনিয়ে দিল তার প্রকৃত স্থান। সে নারী, ঘরেই সে যথার্থ রূপে শোভমান হবে। স্থানচ্যুত হওয়ার জন্য ক্লান্ত, অতৃপ্ত সে। সোনারপুরে সংসার রঙ্গমঞ্চে গৃহবধূর ভূমিকায় জীবননাট্যের যে অভিনয় হয় অনীতা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করেছিল তাতে। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সে খুঁজে পেল আপনার স্বক্ষেত্র। অন্তরের ফাঁকিটা পরিষ্কার হয়ে ফোটে চোখের সামনে। এতদিন এমনি পথই চেয়েছিল বলেই অভিনয় এত জীবন্ত হয়েছিল। নকলে আর আসলে তফাৎ ধরার উপায় ছিল না। মেকি নিয়ে এতকাল খেলা করার জন্য মন তার অনুতপ্ত। মিহিরের কাছে খেদোক্তি করে বলে :

> "আজকে নতুন করে ভাবছি। আমার পড়াশুনো, নাচ, গান, অভিনয় দৌড়ঝাঁপ, সাঁতারের যশ···কিন্তু চারদিকে ছড়ানো এলোমেলো যশে কেমন যেন মন ভরে না।" অনুরাগের মধুবন্ধনে বেঁধে লেখক কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

> "সহসা চোখ সজল হয়ে ওঠে। 'আমার মা ছিল না। ঘরসংসার কখনো চোখে দেখি নি—সংসারটাকে অতি তুচ্ছ ভেবে এসেছি বরাবর। ···আমার মা নেই, ভালো কথা বলে শাসন করার কেউ নেই—তাই আমি এমন হয়েছি।"

'বকুল' উপন্যাসেও জয়ন্তীর এই একই পরিণতি দেখি।

"বৃষ্টি বৃষ্টি" শুধু মিলনমধুর প্রেমকাব্য নয়। হাস্যরসিক লেখকের মন কৌতুক ও স্বতঃস্ফূর্ত হাসির রসধারায় প্লাবিত। সমাজ সচেতন লেখকের বাস্তবনিষ্ঠা হাসির উপাদানকে ব্যঙ্গমধুর উপকরণে রূপান্তরিত করে। চেনা জিনিস অভিনব মূর্তিতে আবির্ভূত হয়।

লেখকের এই ব্যঙ্গপ্রিয়তা বিভিন্ন ধারায় নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত। এই সবের মধ্যে প্রধান হল—বিশ্বেশ্বরের ইতিহাসপ্রীতি,

ঐতিহাসিক গবেষণা, আত্মসমাহিত নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য, সংসার অনভিজ্ঞতা প্রভৃতির কৌতুকাবহ চিত্র। তাঁর রচিত "ভারত ইংরেজ" গ্রন্থের মত অখ্যাত, ফুটনোট-কণ্টকিত পরম জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বাজার সৃষ্টির জন্য 'যুগচক্রের' সম্পাদক ও প্রকাশক কর্তৃক কৃতান্ত-সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন। লেখক মানুষের আন্তরিকতা-স্পর্শহীন ফাঁকি-ত্রুটি, সমবেদনাস্নিগ্ধ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণাগ্রে বিদ্ধ করে জীবনসত্যকে প্রকাশ করেছেন। বাগাড়ম্বরময় বক্তৃতাবহুল সম্বর্ধনা-সভার অন্তঃসারহীনতা ও হৃদয়হীনতার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হল ইরা ও তার মা সরমা। আঘাতে অপমানে ব্যথিত ইরার কথাবার্তা হাসির আবরণে ঢাকা ব্যঙ্গের তলোয়ার। কৃতান্তের মত ধড়িবাজ লোকও অসহিষ্ণু হয়ে মনের গোপন কথা ব্যক্ত করে :

> "বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি, দাদা নিজে ছাড়া কজন মানুষ পড়েছে? আমাদের যে গায়ের জ্বালা। ফর্মার পাহাড় হয়ে আছে, হৈ-হৈ করলে তবু যদি দু-দশ জনের নজরে পড়ে, দশবিশখানা বিক্রি হয়ে যায়।"

হাস্যরসের উপাখ্যান উপস্থাপন কৌশলের গুণে, wit ও humour এর অক্ষয়তূণে পরিণত হয়েছে। বিশ্বেশ্বরের মত আত্মভোলা মানুষকে কাহিনীর মধ্যভাগে রেখে লেখক সমাজ-মানুষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। স্বাধীন ভারতের গণপ্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষ করে প্রার্থীরা পরস্পরের উদ্দেশে পাঁক ছোঁড়াছুড়ি করে, বিভিন্ন অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনা নিয়ে ব্ল্যাকমেল চলে—অম্বুজাক্ষ, সাধন মিত্তির, কৃতান্তকে অবলম্বন করে লেখক তার এক নিখুঁত হাস্যকর বাস্তবচিত্র এঁকেছেন। অজ্ঞ নিরক্ষর সমাজে গণতন্ত্রের ধাপ্পাবাজি অপর্যাপ্ত হাস্যরসের উপাদান—লেখকের ক্ষুরধার ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে তাই ব্যঞ্জনাময় হয়েছে। হাস্যরসের সঙ্গে কোনরকম করুণরস সমাবেশ এখানে লেখকের উদ্দেশ্য নয়।

হাস্যরসের স্রোতে ইরা ও অরুণাক্ষের প্রেম গা ভাসিয়ে অবশেষে কূলে অবতরণ করে। প্রতিবেশের সঙ্গে অভিন্ন হয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের প্রেম-কাহিনী। নাটকীয় আকস্মিকতা, উৎকণ্ঠা, ক্লাইম্যাক্স, অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের বিচিত্র সমন্বয়ে লেখক ডাকবাংলোয় প্রৌঢ় অম্বুজাক্ষ ও প্রৌঢ়া সুহাসিনীর প্রায়বিস্মৃত প্রেমের আলেখ্য রচনা করেছেন। তেমনি সৃষ্টি করলেন পুত্র অরুণাক্ষ ও নব-পুত্রবধূ ইরার সঙ্গে অপরিচিত প্রৌঢ় দম্পতির মিষ্টিমধুর অনুরাগসিক্ত কলহ এবং পরিচয়ের মধুবন্ধন। তীব্র নাটকীয় গতিবেগ সম্ভাব্য অসম্ভাব্যতার সীমারেখা

মুছে দিয়ে এক মিলনান্ত উপসংহারে পরিণত হয়। নববধূ ইরার সান্নিধ্যে অম্বুজাক্ষের সমস্ত রাগ ও অভিভাবকত্বের আত্মশ্লাঘা মুহূর্তে বাৎসল্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

প্রেম সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব ধারণাকে আশ্রয় করে "প্রেমিক" উপন্যাসের সৃষ্টি। প্রেম একটি হৃদয়গত অনুভূতি ; মানব-মানবীকে আশ্রয় করে তার বিকাশ। দেহের দৌত্য নিশ্চয় দরকার হয়—"কি দিয়ে বোঝাব প্রেম যদি দেহ রহে নিরুত্তর।" দেহাশ্রয়ে প্রেমের চরম আনন্দ হলেও সেটা পরম প্রাপ্তি নয়। প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এমন এক অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টি করে যার দ্বারা ব্যক্তিস্বরূপের সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্যটিও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। "আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের, ভালবাস প্রেমে হও বলী, চেয়ো না তাহারে"—প্রেমের এই দ্বিমূর্তির সার্থক বিকাশ ঘটেছে প্লেটোর দর্শন-চিন্তায়।

মনোজ বসুও এই উপন্যাসে প্রেমের দ্বৈতসত্তার স্বরূপ উদঘাটন করতে চেয়েছেন। ফোটাতে চেয়েছেন প্রেমের অন্তর্নিহিত কল্যাণধর্মকে। আবার প্রেমের স্থূল দিকটিও উপেক্ষা করেন নি। প্রেমের দুই রূপ অরিন্দম এবং কমলমুকুলের প্রেমে অভিব্যক্ত। অরিন্দমের প্রেম সংকীর্ণ, আত্মমুখী, দুর্বল। সাধারণ প্রেমের ধর্ম হল, সন্দেহপরায়ণতা ঈর্ষাপরায়ণতা, প্রতিদ্বন্দ্বী-মনোভাব। অরিন্দমের চরিত্রে প্রেমের এই স্থূল দিকটাই প্রকাশিত। অপর-পক্ষে, কমলমুকুলের প্রেম- আত্মত্যাগের মহানুভবতায় সুন্দর। আপনাকে সে শুধু দিতে চায়, পেতে চায় না কিছুই। প্রেমাস্পদের আনন্দ এবং পূর্ণতা তার কাম্য। সে চায় ইভার বিজয়মুকুট অক্ষুণ্ণ রাখতে। বন্ধু হয়েই সে ভালবাসা দিতে চায়। অরিন্দম তাই বলে, "তোমায় সে ভালবাসে। আমার উপকার করে ভালবাসা সে তোমাকে পৌঁছে দিয়েছে।" প্রেমময় কমলমুকুলের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় ইভারও হৃদয় পূর্ণ। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার বন্ধুত্ব, তার প্রেম।

প্রেমের সুস্থ সমাজসম্মত রূপ অঙ্কনকেই লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই কোনরকম বিপথগামিতা তাঁর কল্পনায় আসে নি। ইভার স্বাতন্ত্র্যদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র "প্রেমিক" উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। ইভা তার জীবনের দুই প্রেমিককে এক করে দেখেছে। তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করেছে সে। অরিন্দমের স্ত্রী এবং প্রেমিকা সে। প্রেমিকা কমলমুকুলেরও। "প্রেমিক"

উপন্যাসে এই এক আশ্চর্য সংঘটন। একই সঙ্গে ইভা দুই পুরুষকে ভালবাসে। সঙ্গ ও সাহচর্য দেয়। অথচ সেজন্য কোন আত্মদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না তাকে। কিংবা সমাজ-সভ্যতা ইভার এইরূপ ভালবাসার বিরুদ্ধেও নয়। ইভার স্বভাবগত সংযম শুচিতাবোধ সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে নিয়েছে তাকে। দুটি প্রেমিক পুরুষের জন্যই তার সমান উদ্বেগ। উভয়ের রোগমুক্তির জন্য সে জীবনোৎসর্গে উন্মুখ। দু'জনের প্রতি তার সমান মমতা, সমান ভালবাসা। লোকচক্ষে অবশ্য প্রভেদ আছে। একজন তার স্বামী, অন্যজন বন্ধু। একই প্রেমের দু'পিঠ তারা। কমলমুকুলের মেয়ে সোনিয়ার অকালমৃত্যু দুই বন্ধুর জীবনেই অভিশাপ এনেছে। দু'জনকেই পঙ্গু করেছে দেহে ও মনে। আশা ভঙ্গের বেদনায় স্নায়বিক পীড়নে সেবিব্রাল থ্রম্বসিসে একজন পঙ্গু, অন্যজনের বাৎসল্যহীন জীবন মরুরিক্ত ধূসরতায় সমাচ্ছন্ন। কমলমুকুলের উদ্যমহীন জীবন জরায় শীর্ণ, অনুভূতিহীন। এদের প্রাণহীন, আনন্দহীন স্থবির জীবনকে প্রেম দিয়ে সেবা দিয়ে জাগাতে চেয়েছে ইভা। প্রেম মমতা ও সহানুভূতির নীরব বিনিময়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত "প্রেমিক" উপন্যাস লেখকের এক আশ্চর্য সৃষ্টিকর্ম। ইভা প্রেমের জন্য অসামান্য ত্যাগ, দুঃখবরণ করেছে, মানুষের সন্দেহ নিন্দা কুৎসাকে তুচ্ছ করেছে। প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ কল্যাণরূপে ও মহিমায় ভাস্বর তার চরিত্র।

মনোজ বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন তিনি অত্যন্ত অনুভূতিশীল এবং স্নেহপ্রবণ। স্নেহময় স্বভাব থেকেই বাৎসল্য রস উৎসারিত। মনোজ বসুর বাৎসল্য মূলত অনুভূতিপ্রধান। শিশুর অনাবিল সারল্য, প্রসন্ন হাসি, অর্থহীন প্রগলভতা অনুভূতির রসে জারিত হয়ে রূপময় হয়ে উঠেছে।

বাৎসল্য তাঁর লেখনীতে দুটি ধারায় প্রকাশিত। শিশুর সঙ্গে নারীর একাত্মবন্ধন থেকে বাৎসল্যের উদ্ভব। আর, পুরুষের ছন্নছাড়া জীবনের রিক্ততা ঘোচাতে বাৎসল্যের বিকাশ ঘটেছে। মনোজ বসুর রচনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, অনূঢ়া নারীর বুকে তিনি মাতৃস্নেহের সঞ্চার করেন। পরের ছেলের মা হয়ে ওঠে বাঙালী নারী কোন এক অজানা সহজাত বৃত্তির প্রভাবে। বকুল, রূপবতী, সেতুবন্ধ, রানী, নিশিকুটুম্বে এরই বিভিন্ন মনোরম রূপায়ন।

অপর নারীর গর্ভজাত সন্তানকে অবলম্বন করে মনোজ বসু বহুক্ষেত্রে বাৎসল্য রস সৃষ্টি করেন। এদিক থেকে শরৎচন্দ্রের শিল্পধর্মের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনোজ বসুর এই মাতৃস্বরূপ শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বেশি

পরিমাণে হৃদয়ধর্ম ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। মাতৃত্ব নারীর চরিত্রধর্ম। দেহে নারীত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে 'মা' হয়ে ওঠে সে। মাতৃত্বের এই স্বরূপ উন্মোচনে লেখক নারীর পাঁচ অবস্থার ছবি এঁকেছেন। কুমারী মেয়ের মাতৃত্ব (বকুল), প্রেমিকা নারীর মাতৃত্ব (সেতুবন্ধ), বিধবা নারীর মাতৃত্ব (রূপবতী), অন্যের গর্ভজাত সন্তানের প্রতি সন্তানবতী নারীর মাতৃত্ব (রানী), বারবনিতার মাতৃত্ব (নিশিকুটুম্ব)।

জননী ও সন্তানের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভালবাসা, সূক্ষ্ম আকর্ষণ, স্নেহের অব্যক্ত মর্মকথা হৃদয়ের উত্তাপেই শিশু অনুভব করে। 'বকুল' উপন্যাসে মনোজ বসু অব্যক্ত মাতৃধর্মের মর্মকথা ব্যক্ত করেছেন। কুমারী মেয়ের মাতৃত্বের হৃদয়গ্রাহী চিত্র 'বকুল'এ শাশ্বত নারীধর্মের এক প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

'বকুল' উপন্যাস পারিবারিক জীবনের রোমান্টিক কাহিনী। অমরেশের তরুণী স্ত্রীর অকালমৃত্যু তার সুমধুর দাম্পত্য জীবনের উপর যতিরেখা টানলেও পূর্ণচ্ছেদ টানে না। এক ধনী-দুহিতার সঙ্গে অমরেশের পুনরায় বিয়ে হয়। লেখকের উদ্দেশ্য, বাৎসল্যের মধুর আলেখ্য রচনা করা। জয়ন্তীর নারীত্বকে উন্মোচিত করা।

অমরেশের প্রথমা স্ত্রী সন্তান প্রসবান্তে মৃত্যুবরণ করে। ধাত্রী মনোরমা (কুমারী) সদ্যোজাত রক্তমাংসের দলা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে পায় মাতৃত্বের স্বাদ। বাৎসল্যে ছাপিয়ে ওঠে তার বুক। মাতৃহীন নবজাত শিশু বকুলকে অমরেশের কাছে প্রত্যর্পণ করতে বুক ফাটে তার। নারীর এই মাতৃপ্রকৃতি অঙ্কনই লেখকের উদ্দেশ্য। কুমারী মেয়ের মধ্যেও এই মাতৃমাধুর্য রয়েছে।

ধনীর ঘরের আদরের মেয়ে জয়ন্তী নারীর মাতৃত্বকে যতই ঘৃণার চোখে দেখুক, সেটা তার মর্মের কথা নয়। বিধাতা বোধহয় আড়ি পেতে শুনেছিল জয়ন্তীর কথা। মাতৃত্বের সব যন্ত্রণা ভোগ করেও সে পেল না মা হওয়ার অধিকার। স্বামীর অমঙ্গল-কামনা বিধিলিপিরূপে দেখা দিল জীবনে। "জ্বালা দিয়ে গেল—বুকের মধ্যে দাউদাউ করবে চিরজীবন।" (পৃ. ৭৬)

জীবনে সত্যিকারের পরিপূর্ণতার প্রশ্নটি জয়ন্তী দাম্পত্যজীবনে অস্বীকার করে নি। তবু বিধাতার রোষে সামান্যেই ফুরিয়ে গেল সে। শূন্যতার অবসাদে অবসন্ন তার মন। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ভুলতে বাইরের উচ্ছৃঙ্খলতা সে পাথেয় করল। "ব্যর্থ জননী···উর্বশী হয়ে উদয় হল।" কিন্তু

তাতে মন ভরল না। জয়ন্তীর এই অস্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যে ছিল না সৌন্দর্য ও কল্যাণের স্পর্শ। এ জিনিস মনকে শুধু দহনই করে, পরিতৃপ্ত করে না। অন্তরব্যাপী এই হাহাকারের মধ্যে সে লাভ করল বকুলকে। প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে ভরে উঠল মন। বকুলের জীবনে সহসা-আবির্ভূত জয়ন্তীর এই বুক উজাড়-করা স্নেহ ও ভালবাসা যতই আন্তরিক হোক মনোরমার সঙ্গে তার পার্থক্য অনুভব করে বালকহৃদয়। একজনের স্নেহ-আদর ত্যাগে মহৎ, অন্যের ভালবাসা আবেগে সুন্দর। জয়ন্তীকে তাই সে মাসির আসনে বসিয়ে মনোরমাকে মা বলে ডাকে। অনূঢ়া নারীও মাতৃত্বের অধিকারিণী হতে পারে, এই জীবনসত্যের বাণীরূপ "বকুল" উপন্যাসে।

'বকুল' উপন্যাসে জয়ন্তীর মাতৃত্বের যে উপলব্ধি "সেতুবন্ধ" উপন্যাসে তা-ই এক মনস্তাত্ত্বিক রূপ লাভ করেছে। পূর্ণিমার জীবনবিকাশের সূত্রে কাহিনী গড়ে উঠেছে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার [illegible] গ্রামের মধ্যে পূর্ণিমা নিযুক্ত হয়েছিল তার নারীত্বকে পুরুষের মত বহির্জীবনে সে প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব চায়। অভাব-অনটনের জন্য অথচ তারিণীবাবুও তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মনে মনে কেউ [illegible] শাসন স্বীকার করতে পারে নি। পূর্ণিমার অগোচরে তাই তাপস, [illegible], অণিমা, বঙ্কু তারিণী, তরঙ্গিণীকে নিয়ে পৃথক এক সংসার গড়ে ওঠে। পূর্ণিমা সেখানে কেউ নয়। সংসারকে সে শুধু দিয়েছে, পায় নি কিছুই। পূর্ণিমার সেজন্য ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সবলজ্ঞানে সংসারকে ভালবেসেছে সে। তাপসের বিয়ের [illegible] জানতে প[illegible] সংসার-যজ্ঞের সমিধমাত্র সে। হতাশা পূর্ণিমার জীবনকে বিতৃষ্ণ করে তোলে না, কিংবা কারো প্রতি বিক্ষোভও সৃষ্টি করে না। সমস্যার স্বরূপ উন্মোচনের জন্য লেখক একটি শাখা-কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এর ফলে, কাহিনী হয়েছে রোমান্টিক ও নাটকীয়। নাটকীয়তার আকস্মিক চমক অনেক অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব করেছে। উপন্যাসের সংহতিও কিছু পরিমাণে বিপন্ন হয়েছে তাতে। চরিত্রগৌরবও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পূর্ণিমার পুরুষের গায়ে পড়ে ভাব-জমানো, ও লোককে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টার মধ্যে তার দেবীত্ব থেকে সাধারণ মানুষে অবতরণের চেষ্টা। বাবার হীন সন্দেহ এবং প্রশ্ন ধ্যানকে হেলাভরে উপেক্ষা করার জন্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এবং সকলের চোখের উপরে বিজয়ীর বেশে ঘুরে বেড়ানোর জন্য সহকর্মী শিশিরকে সে বিয়ে করল। এ

ক্ষেত্রে পূর্ণিমার ইচ্ছাটাই বড, শিশিরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য দেওয়া হয় নি। জীবনসংগ্রামের কঠোরতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে শিশির চরিত্রও চমৎকার। কিন্তু পূর্ণিমার কাছে সে একটি শিশুর মত। পূর্ণিমার সূর্যকরোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পাশে শিশিরের ব্যক্তিত্ব সন্ধ্যাতারার মত স্তিমিত। পূর্ণিমার চালিত যন্ত্র সে। এমন কি নিজের মনের কথাটুকু পূর্ণিমার সম্মুখে বলার মত পৌরুষ তার নেই।

পূর্ণিমা চরিত্রে একটি তির্যক ভাব লক্ষ্য করা যায়। সংসারে যারা অবহেলা দেখিয়েছে, তাদের সে প্রতিপক্ষ বলে ভাবে। নিজের পরাজয় তাদের কাছে গোপন রাখার জন্য সে সতর্ক। শিশিরকে আকস্মিক বিয়ে করার মূলে ছিল এই মানসিকতা। অকস্মাৎ শিশির তার পূর্বপক্ষের মাতৃহীন মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হলে চরম নাটকীয় সংকট সৃষ্টি হয়। ঘটনার গতিবেগ ত্বরান্বিত করার জন্য এবং পূর্ণিমার মানস-বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য লেখক এইসব ঘটনাকে কাজে লাগিয়েছেন। শিশিরের কন্যার উপস্থিতি স্বজনদের কাছে পরাভবের ভীতি প্রবল করে তুলল; অত্যন্ত বিপন্নবোধ করতে লাগল পূর্ণিমা। শিশুকন্যার অস্তিত্বই তার কাছে অসহ্য। কিন্তু এত বাহ্য। বড় ভগিনী অনিমার আকস্মিক আগমন উপলক্ষে যে নাটক তাকে করতে হল তাতে মনের মধ্যে অনুভব করল এক নূতন সত্তার পদধ্বনি। নীড় রচনার মনসিধানায় মনোজ বসু অদ্বিতীয় শিল্পী। খুব ধীরে ধীরে মনের পাপড়ি খুলে ধরেছেন লেখক—পূর্ণিমার অভিনয় এখন নিজেরই সঙ্গে। বাইরের কাঠিন্য শুধু হেরে যাওয়ার আশঙ্কায়। মনের বাধাটুকু নিঃশেষে ভাঙার জন্য লেখক বাইরে থেকে একটা ঘটনা চাপিয়ে দিলেন। শিশির ও তার মেয়ে মামা অবিনাশের আশ্রয়ে গিয়ে উঠল। পূর্ণিমার মনে তখন বিশ্বগ্রাসী এক সন্তানবাৎসল্য তীব্র আকার ধারণ করল। কখনও যে সন্তানের জননী হয় নি, এখন সন্তানের জন্য তার জননী-হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। নারীর এই সন্তান-আকাঙ্ক্ষা তার প্রকৃত হৃদয়ধর্ম। পূর্ণিমার জীবনে ও মননে সংঘাত হল প্রবল। স্বপ্নের মধ্যে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া ও হৃদয় চাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

নারীকে গৃহজীবনে প্রতিষ্ঠা লেখকের কাম্য। সন্তানেই তার আশ্রয়। হৃদয়ের কোমলতা, ত্যাগের শক্তি, সেবাপরায়ণতা না থাকলে 'মা' হওয়ার যোগ্যতা হয় না। পূর্ণিমাকে তাই আহত করার প্রয়োজন ছিল। আঘাত-সংঘাতের মধ্যে সে উপলব্ধি করে তার বিস্মৃত নারীত্বকে। লেখক পূর্ণিমার

দর্পচূর্ণ করে, তাকে কাঙালা করে, মা-হারা কুমকুমের মাতৃরূপে উত্তীর্ণ করেছেন।

'রূপবতী' উপন্যাসে বিধবা নারীর মাতৃত্বের অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে এক অসুস্থ অসামাজিক পরিবেশে। কিন্তু মাতৃত্বের পবিত্রতা তাতে ব্যাহত হয়নি। মাতৃধর্মের সঙ্গে তার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব মাতৃত্বের মহিমাকে আরো উজ্জ্বল করেছে। রাধারানী সমাজ ও মানুষের ঘৃণার পাত্রী হয়েও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি কখনো। কুমারী আরতির গর্ভপাতের চেষ্টা তার নারীমনকে আতঙ্কিত করে। উদ্বেগে অধীর হয়ে সে বলে, "আরতির গর্ভে যা এসেছে, তোমরা যদি খোঁচাখুঁচি না কর, শিশু হয়ে একদিন জন্ম নেবে। বড় হয়ে মানুষ হবে। স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি মাম', আমি তোমাদের খুনোখুনির মধ্যে নেই।" রাধারানী মা-জননীর কাতরতাই ফুটেছে তার কণ্ঠে। সাগ্রহে আরতির কলঙ্ককে নিজের জীবন অলঙ্কার বলে সে গ্রহণ করল। জননীর ত্যাগে, দুঃখে মহীয়সী। আরতির অবৈধ শিশুপুত্রকে সব গ্লানির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সে সবহারা হল। লোভী মানুষের বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে কাঁদে তার মাতৃত্ব। দেহে ও মনে শুচি-অশুচিতার দ্বন্দ্ব রাধারানীর চরিত্রে এক অসহায় নারীর মর্মস্পর্শী ট্রাজেডি। রাধারানীর নিদারুণ মানস যন্ত্রণার স্বরূপটি একটি আঁচড়ে আঁকলেন লেখক :

> বেয়াদপি কাণ্ড ঘটে গেল আজকে। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। ...অস্থির দীপক বালিশের উপর মাথাটা ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করে। চোখের জল মুছিয়ে দেবে, একটু আদর করবে ছেলেকে—তার উপায় তো নেই। ছোঁয়া যাবে না। ডুব দিয়ে আসবে রাধারানী, কিন্তু এই রাত্রে ছেলে একলা ফেলে যায় কেমন করে? স্নান হবে না, সমস্তক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র মুখের সান্ত্বনা দেবে যতক্ষণ না দীপকের ঘুম এসে যায়। (পৃ. ১০৮)

মাতৃত্বের শুচিতা রক্ষার এই আশ্চর্য নিষ্ঠা পতিত নারীকে শ্রদ্ধার পাত্রী করে তোলে।

আবার গর্ভে সন্তান ধারণ করেও কোন কোন নারী মা হতে পারেনি। কুমারী তরুণীর অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে এই বাধা প্রবল। 'রূপবতী' উপন্যাসের আরতি অবৈধ শিশুপুত্র দীপকের জন্য একজাতীয় স্নেহ ও মমতা বোধ করে। কিন্তু তাকে স্বীকার করে নেবার মত মানসিক শক্তি নেই

আরতির। এর কারণ অবশ্য সামাজিক অনুদারতা। বাধা অতিক্রম করে দীপককে আপন সন্তান বলে গ্রহণ করা আরতির পক্ষে সম্ভব না হলেও প্রত্যাখ্যানও সে করেনি। ছলনার আড়ালে আপন মাতৃত্বকে সে পোষণ করে বলে সংঘাত তার ক্ষেত্রে প্রচণ্ডরূপ ধারণ করেনি।

কিন্তু 'রানী' উপন্যাসে এই সংকট-সমস্যা এক তীব্র আকার ধারণ করে। জানি না, 'রূপবতী'র দীপকের 'রানী'র দীপকের সঙ্গে কতদূর নৈকট্য। তবে, উভয় দীপকই অবৈধ সন্তান। ভিন্ন পরিবেশে তারা পরস্পরের সম্পূরক এবং এক সম্প্রসারিত সত্তা। 'রূপবতী'র দীপকের শেষকে 'রানী'তে চরম করে তোলা হয়েছে। 'রূপবতী'র দীপককে গ্রহণ করার মধ্যে নেই মাতৃত্বের সংঘর্ষ, 'রানী'তে সংঘর্ষকে প্রকট করে তোলা হয়েছে। সমস্যার স্বরূপ উদঘাটনের জন্য 'রানী' আখ্যায়িকায় দুই নারী চরিত্রের বিরোধী ভূমিকা—একজন যৌবনের ভ্রান্তিতে পদস্খলিতা, মাতৃত্বের গৌরবে বঞ্চিতা (মঞ্জুপ্রভা), অন্য জন স্নেহাতুরা সন্তানবৎসলা মমতাময়ী জননী (বিনোদিনী)। এই দুই বিপরীত আদর্শের সাহায্যে লেখক নারীচরিত্রের বৈচিত্র্য বুনন করেছেন কাহিনীতে।

কুমারীজীবনের কলঙ্কতিলক দীপকের প্রতি সুগভীর মমতাবশত তার সমস্ত ব্যয়ভার বহনের জন্যেই কি মঞ্জুপ্রভা মরণোন্মুখ রোগগ্রস্ত রাজা উদয়নারায়ণকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছে? না, তার বিত্ত এবং আভিজাত্যের লোভই তার কাছে প্রধান ছিল? এই দুই প্রশ্ন? কারণ, উদয়নারায়ণকে বিয়ে করার পিছনে কোন দাম্পত্য জীবন চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষা মঞ্জুর ছিল না। মাতৃত্ব এবং বিত্ত—দুই বিরুদ্ধধর্মী জীবনাদর্শের মধ্যে কোনটি তার স্বধর্মের অঙ্গীভূত—তারই পরিচয়ের জন্য লেখক একের পর এক বাহ্যঘটনার অবতারণা করে অন্তরপ্রবণতা চিহ্নিত করেছেন। মঞ্জুপ্রভার কাছে মাতৃত্ব অপেক্ষা রানীত্ব অনেক বেশী প্রিয়।

'রানী' নাম বজায় রাখার জন্য মঞ্জুপ্রভা সদাসতর্ক। দীপকের প্রবেশে সেখানে সংঘর্ষ বাধতে পারে, এই আশংকায় দীপককে সে শত্রু বলে ভাবে। হিংস্র নাগিনীরূপ তার আচরণে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সে তখন আর নারী নয়, জননী নয়—রানী। দীপকের চরম সর্বনাশ করতেও তার বুক কাঁপে না, কোন দুর্বল হৃদয়াবেগে শিথিল হয়না মন। রানী নামের আড়ালে মঞ্জুপ্রভা তার মাতৃসত্তাকে অনেক কাল আগেই সমাধিস্থ করেছে।

নারীর যথার্থ পরিচয় মাতৃত্বে। মঞ্জুপ্রভা মা হয়েও পারনি মাতৃত্বের

গৌরব এই খেদ শূন্যজীবনের করুণ পরিণতি। 'রানী'র পরিকল্পনা দুই বিপরীত মুখী। একদিকে আছে ব্যর্থতার মাধুরী, অন্যদিকে প্রাচুর্যের মহিমা। বিনোদিনীর মাতৃত্বের মহিমার পাশে (বিনোদিনীর গর্ভজাত সন্তান না হয়েও দীপক তার আপন সন্তান হয়ে উঠেছিল) মঞ্জুপ্রভার মাতৃরূপ যান্ত্রিক, স্নেহহীন আচারসর্বস্ব। উভয়ের বাৎসল্যের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য দুই বন্ধু দীপক আর অলককে দুই বিপরীত [illegible]টিতে স্থাপন করে লেখক তাদের পূর্ণতা ও ব্যর্থতাকে জীবন সমালোচনার [illegible] ন্যস্ত করেছেন।

বারবনিতার বাৎসল্যের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'নিশিকুটুম্বে'। বাঙালী নারীর বাৎসল্যের অপরূপ মহিমা, পরের ছেলের যে মা হয়ে ওঠে কোন এক অজানা সহজাত বৃত্তির প্রভাবে। লেখক তারই আবেগভরা জয়গান করেছেন 'নিশিকুটুম্ব'র সাহেব চরিত্রের মুখ দিয়ে।

দশম পরিচ্ছেদ

বিধাতাপুরুষ ঃ

এক কালের সামাজীন দারিদ্র্য নিষ্পেষণ থেকেই লেখক বোধহয় বিশ্বপ্রবাহের মূলে এক অমোঘশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন—যা একান্ত রূপে জীবনবিনাশক, ক্রুর এবং নিষ্ঠুর। এই থেকে লেখকের নিয়তি ভাবনার জন্ম।

মনোজ বসুর কাছে জীবন প্রকাশমান। দারিদ্র্য, অথনৈতিক দুর্দশা, মানুষের প্রবঞ্চনা, সমাজের নিষ্ঠুরতা ও শত্রুতায় এই বিকাশ ব্যাহত হয়। মানুষ চেষ্টা করেও অনেক সময় বাধা উত্তীর্ণ হতে পারে না—অন্তরাল থেকে বিধাতাই যেন শত্রুতা করেন। জীবনের প্রচেষ্টাকে কখনও ছোট করে দেখেন নি তিনি। অদৃষ্টকে পরাজয়ের প্রয়াস তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে শীর্ষকরূপে প্রতিফলিত।

'রূপবতী' উপন্যাস পরিকল্পনার পশ্চাতে আছে লেখকের এক স্মৃতিময় অতীত। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন এতে একজন জানা মহিলার জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। পাড়ায় বদনাম ছিল তার, অন্য সকলের মত লেখকও ছোটবেলায় তাকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। আকস্মিক ভাবে একদিন জানতে পারলেন তার অজ্ঞাত জীবনরহস্য। নিয়তির বিরুদ্ধে সে

প্রাণপাত লড়াই করেছে। কিন্তু জিততে পারেনি। পঙ্ককুণ্ড থেকে মুক্তি ঘটল না তার জীবনে। লেখক-মন করুণায় ভরে উঠল। মমতা-মাখানো অনুভূতির নিবিড়তায় সেই মহিলা রাধারানী রূপে কবিমানসে জন্ম নিয়েছে।

'রূপবতী'র কাহিনী পরিবেশনেও স্মৃতিচারণার ঢঙটি অক্ষুণ্ণ। রাধারানীর করুণ দুঃখময় মৃত্যুতে লেখকের অনুভূতি আলোড়িত হয়েছে। Flash back-এ স্মৃতিরোমন্থন করে তিনি রাধারানীর অদৃষ্ট-নিপীড়িত জীবনের গল্প শোনালেন।

রূপ-রাণী রাধারানী সদ্যফোটা ফুল। সেই রূপ অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। নেপথ্যে অদৃষ্ট তার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। পিতার মৃত্যু, মামার বাড়ি আশ্রয় গ্রহণ, স্বামীর অক্ষমতা এবং নৌকাডুবির ফলে তার আকস্মিক অপমৃত্যু, মুরারী উকিলের লাম্পট্য তাকে দ্রুত সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়। রাধারানীর জীবনবিপর্যয়ের নায়ক মুরারী উকিল। রক্তপিপাসু নেকড়ের মত মুরারী রাধারানীর কৌমার্য ছিঁড়ে খায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরুপায় আত্মসমর্পণের গ্লানি রাধারানীর মনে অগ্নিদাহের সৃষ্টি করে। তাই সে "ডুব দিয়ে দিয়ে কলঙ্কের কালি ধুয়ে সাফ-সাফাই করে।" পাপবোধের সঙ্গে ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবিটি সুস্পষ্ট সরলরেখায় অঙ্কিত হয়ে লেখকের শিল্পকল্পনার বলিষ্ঠতা এখানে মহিমময় হয়ে উঠেছে।

রাধারানীর জীবননাট্য ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে পরিণতির অভিমুখে। লেখকের অদৃষ্টবাদী জীবনদর্শন উপন্যাসে প্রকট হয়ে পড়েছে। "দুনিয়ার সবাই ভাল রইল, আরতি ভাল, রাধিই কেবল ভাল থাকতে পারল না।"

রাধারানীর জীবনের দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়াল তার রূপ আর রক্ত-মাংসের নারীদেহটা। দৈহিক পবিত্রতা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে সহজলভ্য ভাবে; চায় দেহের উপর আধিপত্য। ভাল হয়ে বাঁচার সুযোগ কেউ দিতে চায় না। বিধাতাপুরুষও দেবে না সে অধিকার। আরতির অবৈধ সন্তান এসে তার সৎ-জীবন কামনার স্বপ্ন আরও ব্যর্থ করে দেয়।

> "কাশীতে খোকার মাস্টার মাইনে শোধ করে নিয়েছে, বাড়িওয়ালা বাড়িভাড়া আদায় করেছে। হীরক নিয়েছে ডাক্তারি ফি। একটা ভাণ্ডার থেকেই সমস্ত।"

রাধারানীর দুঃখজর্জর জীবনের দুঃসহ বেদনা হার্ডির টেসের মত— The woman pays her debt not by what she does but what she

suffers. সমাজ নয়, মানুষের সৃষ্ট প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে রাধারানীর ব্যক্তিত্বের অন্তর্সংঘাত এই উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য।

রূপবতী রাধারানীর রাহুগ্রস্ত অদৃষ্ট ঘরে-বাইরে একই রূপ। গৃহ-জীবনের স্নিগ্ধ ছায়াতেও রাধারানী সমস্যা বিশেষ। আইবুড়ো অবস্থায় সে ছিল আরতির বিয়ের বাধা, মায়ের দুশ্চিন্তা, মামার গলগ্রহ, শান্তিলতার ঈর্ষার বস্তু। তারপর সব খুইয়ে যখন বিধবা হয়ে এল সে তখন সন্ধ্যার চক্ষুঃশূল হয়ে উঠল; মামা-মামার হল ঘৃণার পাত্র। দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়ার মূলে যে সমাজশক্তি রয়েছে, তার নির্মমত্ব অঙ্কনের সময় সংশিল্পীর সমাজচেতনা-লব্ধ মানবিক বিদ্রোহ রূপবতী উপন্যাসে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে শ্লেষে এক অপূর্ব বাস্তব জীবনধর্মী শিল্পরূপ লাভ করেছে।

রাধারানীর একাকিত্ব ও সহায়হীনতার সুযোগ নিয়ে মাংসলোভী পশুরা চুপিসারে আসে রাতের অন্ধকারে। তাদের সাধুতার ছদ্মবেশ, মুখোশ-পরা ভদ্রতাকে ব্যঙ্গ করে রাধারানী বলে—

> "আমি তো নষ্ট মেয়েমানুষ। নিজের ঘরে দোর দিয়ে ঘুমোচ্ছি। তোরা সব দিনমানের ঋষিপুত্তুর রাতে এসে ভূতের উৎপাত লাগাস। গোবর-জল ছিটিয়ে যে কূল পাই নে সকালবেলা।"

কখনও বা সরল কৌতুকের পথ ধরে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। কাশীনাথ তর্কতীর্থ নিষিদ্ধ কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে লিচুর ডাল ভেঙে কাঁটাতারে পড়লেন, হাস্যধারার মধ্যে তখন বিদ্রূপ উপচে উঠেছে। বস্তুত যে সমাজে রাধারানীর কোন মূল্য নেই, সবাই ঘৃণা করে এড়িয়ে চলে তাকে, পাপ ঢাকতে সেখানেই আবার রাধারানীর দরকার বেশি। মা হারাণ মজুমদার মেয়ের কেলেঙ্কারী ঢাকার জন্য রাধারানীর সামাজিক দুর্নাম এবং অপবাদকে স্বার্থরক্ষায় কাজে লাগালেন। রাধির কণ্ঠস্বরে তখন শ্লেষ ছাপিয়ে ওঠে: "মন্দ মেয়েরও দরকার পড়ে তোমাদের।"

রাধির জীবননাট্যের বেদনাময় পরিসমাপ্তির কালে মানুষের মমতাহীনতা ও কপট ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে লেখকের ঘৃণা-বিদ্রোহ উপন্যাসটিকে এক মহৎ শিল্পরূপ দান করেছে। বিগতযৌবন শ্রীহীন দেহটাকে নিয়ে পশুর কাড়াকাড়ি দেখানো হয়েছে। মানুষ-পশু আর জঙ্গলের পশুতে প্রভেদ নেই, এই জীবনসত্যের প্রতিষ্ঠাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য। শিল্পীর শ্লেষ-মাখানো ভাষায় ফুটেছে তাদের অভিন্ন স্বরূপ:

> "লুব্ধ হয়ে আছে তারা (শিয়াল, শকুন), গুটি গুটি এগুচ্ছে। সুযোগ

পেলেই এসে ধরবে। তার সেই রূপময় যৌবনে নাগরেরা যেমন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত দেহের উপর।"

নিয়তি নিপীড়িত জীবনের আর একটি করুণ বলি 'মানুষ গড়ার কারিগর'-এর মহিম চরিত্র। লেখক ব্যক্তিগত শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। মনোজ বসুর বস্তুসচেতনতা এই উপন্যাসে কোন আদর্শবাদ সৃষ্টি করে না। বরং স্থির আদর্শের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক সংগ্রাম প্রবলতর করে দেখিয়ে উপন্যাসে তিনি সংকট-সমস্যার অবতারণা করেছেন।

মহিমের আদর্শবাদ ও তার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরাজয় দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। সাতুঘোষের অসৎ ব্যবসায়ে মহিম টিকে থাকতে পারে নি। আদর্শবাদের সঙ্গে লেখক উত্তরোত্তর বাস্তব জীবনের প্রবল সংঘাত সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের কালচেতনায় প্রসারিত বিপর্যস্ত জীবন মেরুদণ্ডহীন। শিক্ষকদের আদর্শহীনতা, নীতিহীনতা, ফাঁকিবাজি, নোংরামি, ইতরামির সঙ্গে সাতুঘোষের খুব একটা পার্থক্য নেই। সমাজে সর্বব্যাপী ভাঙন। মহিমও এই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু তার উঁচু আদর্শবাদ এবং সততা অন্যান্য শিক্ষক থেকে তাকে পৃথক রূপে দেখায়। একমাত্র মহিম ব্যতীত অন্য সব চরিত্রই যুগস্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে। মহিমই কেবল আলাদা। কিন্তু যুঝতে যুঝতে একসময় হীনবল হয়ে পড়ে সে। নিজের অজ্ঞাতেই আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে সে সহকর্মীদের দলে নেমে আসে, তাদের সঙ্গে মিশে যায়।

সমাজের সর্বনাশা ভাঙনের রূপটি বেশি করে দেখাতে গিয়ে লেখকের মনে তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনই প্রশ্ন জাগেনি। বিভিন্ন অর্থনৈতিক দুর্দশা মহিমের জীবনকে অক্টোপাশের মত চেপে ধরেছে। তাকে আদর্শচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে যেন বিধাতাপুরুষও লিপ্ত। লেখক নৈরাশ্যবাদী এখানে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে নেই জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত। মানুষের এতবড় সর্বনাশ নিয়ে নিয়তিরূপী কাল যেন বিদ্রূপ করেছে।[১]

১. 'আঙ্কল টমস কেবিন'-এর সমগোত্রীয় সর্বকালের উপন্যাস— 'শিক্ষক' পত্রিকা এবং 'হেডমাস্টারস্ এসোসিয়েশনের বুলেটিন' এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষ গড়ার কারিগর ঃ

শিক্ষকতা দিয়ে মনোজ বসুর কর্মজীবনের শুরু। সাউথ সাবার্বান ইস্কুলে যখন শিক্ষক ছিলেন, তখনকার নানা অভিজ্ঞতা তাঁকে এই উপন্যাস রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে।

> "আমি একটা বই লিখতে চাই ইস্কুল নিয়ে। খানিকটা আক্রোশ নিয়ে বইকি। কলেজে পড়া সেরেই ঢুকি, বেরিয়ে এলাম তখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছি। যৌবনের প্রতিটি মধুভরা দিনমানের অপমৃত্যু ঘটেছে কলকাতার একটি ইস্কুলের চতুঃসীমার মধ্যে। ছিলাম জনৈক সাধারণ মাস্টার।...ইংরাজি চল্লিশে শুরু—বিশ বছর পরে আমি ধরো-ধরো করেছি।...বিদ্যাগার বলব না, মানুষ গড়ার কারখানা। নিচের ক্লাসের মেশিনের ভিতরে ছেলেগুলোকে ফেলে ধাপে ধাপে নানান ক্লাস ঘুরিয়ে একদিন তৈরি মাল বাজারে ছেড়ে দেওয়া। আমি জনৈক কারিগর ছিলাম সেই কারখানায়।...মহামতি কত চাণক্য ও চার্চিল দিবানিদ্রাটা দুপুরের ক্লাসে সেরে নিয়ে রাত্রে ও সকালে গুপ্ত-অধ্যাপনা অর্থাৎ প্রাইভেট টুইশানিতে ছুটোছুটি করেন, দুর্ধর্ষ কত হিটলার কলে-কৌশলে কারখানার কর্তা হয়ে বসে কারিগরবর্গকে নাস্তানাবুদ করেন —পরিচয় পেলে চমৎকৃত হবেন।"

দিয়েছিলেন। প্রচ্ছদপটও তাৎপর্যপূর্ণ। মলাটের সামনে ও পিছনের ছবিতে একই মানুষের রূপান্তর। সামনের ছবিতে একটা বিরাট মানুষের ছায়া সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে আছে অগণিত ছোট ছোট মানুষ। মহিমমাস্টার প্রথম জীবনে যে উঁচু আদর্শ নিয়ে চলতে চেয়েছিল দীর্ঘ মানুষটির উচ্চতা তারই ব্যঞ্জনা। তারপর জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষটি নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেছে। পিছনের মলাটে সেই ন্যুব্জ বৃদ্ধের কঙ্কালসার দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কাঁধে একটা খোলা ছাতি—টুইশানি করে ফিরছে। চারিদিকে জীবনোল্লাসে মত্ত নবনারীরা।— ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানা।

"মানুষ গড়ার কারিগর"-এ লেখক এই "চমৎকৃত হওয়ার" খবর পরিবেশন করেছেন। শিক্ষকতাকালে স্বল্প বেতনভুক শিক্ষকদের দুরবস্থার যে দৃশ্য দেখেছেন এবং নিজেও যার একজন শিকার ছিলেন, উপন্যাসে তারই বাস্তব আলেখ্য রচিত হয়েছে। লেখকের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল সহকর্মী শিক্ষক-বন্ধুদের ছবি—"লাঞ্ছনা আর নিষ্পেষণের চাপে ন্যুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ; ভবিষ্যৎ নেই, বার্ধক্যের সম্বল নেই, বিশ্রামের অবকাশ নেই - নিরুদ্যম গতানুগতিক নিয়মে দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছেন।" মূলে, তাঁদের সীমাহীন দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাঁরা শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। জীবন সম্পর্কে তাঁদের কোন দৃঢ় প্রত্যয় নেই। নেই কোন আশা। পেটের দায়ে আদর্শহীন, নীতিহীন তাঁরা। উচ্চাশাবর্জিত আত্মকেন্দ্রিক এই শিক্ষকদের জীবন-ট্রাজেডি রচনা করতে গিয়ে তাঁদের প্রতি সর্বসাধারণের সমবেদনাহীনতা ও ঔদাসীন্য লেখককে ভাবনায় আকুল করে তুলেছে।

শিক্ষকের হাতে ভবিষ্যৎ সমাজদেহ নির্মাণের ভার, ভাবী-নাগরিক সৃষ্টির দায়িত্ব। মানুষ সভ্যতার রূপকার বলে যাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধার্হ, তাঁদেরই উপেক্ষিত অবহেলিত দীন জীবনযাপনের এক অদ্ভুত আলেখ্য 'মানুষ গড়ার কারিগর।' পরিবেশই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের সমাজবিরোধী হতে বাধ্য করে। আদর্শের দোহাই দিয়ে শিক্ষকদের উপোস করিয়ে রাখার অপকৌশল লেখককে ক্ষুব্ধ করেছে। নীতিবাগীশদের অভিযোগ-তিরস্কারের জবাব দেবার জন্যেই যেন গ্রন্থের পরিকল্পনা।

শিক্ষকদের উঞ্ছবৃত্তির জন্য দায়ী কারা, দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে প্রলোভন কি ভাবে তাঁদের জীবনভিত্তি ভেঙেচুরে দিচ্ছে, সমকালের জটিল অর্থনৈতিক পরিবেশের পটভূমিতে স্থাপন করে লেখক এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চিত্রাঙ্কিত করেছেন। ছেলেদের মঙ্গল বিধানের অভিপ্রায় নিয়ে মহিম এসেছিল বিদ্যাগারে। "দেবশিশুর মত অপাপবিদ্ধ হাজারলক্ষ ছেলে বিদ্যার কারখানা থেকে ডাক্তার, উকিল, সিনেমা-আর্টিষ্ট অথবা চোর বাটপাড রূপে বেরিয়ে এসে কুল পবিত্র ও জননীদের কৃতার্থ "করছে তারা। আপনার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও মহিম পারেনি তার আদর্শ রক্ষা করতে। এই সর্বনাশের জন্য উদ্বেগ ও বেদনা পাঠককে মুহ্যমান করে।

মহিমকে সামনে রেখে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মূল্য আবিষ্কার করা লেখকের উদ্দেশ্য। করালীকান্তবাবু, রামকিঙ্করবাবু, সলিলবাবু, গঙ্গাপদবাবু, দিব্যেন্দুধর দাশ, চিত্তরঞ্জন গুপ্ত, সেক্রেটারি অবিনাশ চাটুজ্যে প্রভৃতির মধ্য

দিয়ে শিক্ষকসমাজের গতি-প্রকৃতির একটা পূর্ণ পরিচয় দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র পরিচালক-সমিতি অভিভাবক নিয়ে যে শিক্ষা-কাঠামো, তার ফাঁকি গলদ ভণ্ডামি হৃদয়হীন কর্তৃত্ব সমস্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে এক রকম হওয়ায় সহজেই তাঁরা এক পরিবারভুক্তের মত হয়ে যান। অস্বাস্থ্যকর শিক্ষা-পরিবেশে মানুষগড়ার কারিগরদের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখনী কিন্তু ব্যঙ্গে বিদ্রূপে ভর্ৎসনায় কঠোর হয়ে ওঠেনি। শিক্ষকসমাজের প্রতি সহানুভূতিতে লেখকের হৃদয় আর্দ্র।

উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত। কিছু কিছু ঘটনা ও চরিত্র স্মৃতিভিত্তিক। শিক্ষকদের প্রায় সবাই লেখকের চেনা। একেবারে নিজের মানুষ। নিজে শিক্ষক ছিলেন, বলেই হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে এঁকেছেন শিক্ষকদের দীপ্তিহীন কীর্তিহীন জীবনের পরাভবের ছবি।

ব্যক্তিমানুষের ভূমিকার প্রায় বিলোপ ঘটছে ইদানীং; মানুষ বিরাট কালসত্তারই অঙ্গ। দেশ-কালের এই ছায়ার উপরেই মানুষগড়ার কাহিনী প্রসূত। মানুষের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত ব্যক্তিত্বের পরাভব এবং অখণ্ড কালসত্তার সঙ্গে তার অভিন্নতা দেখানো হয়েছে কাহিনীতে। পরিবেশ তাকে সহকর্মীদের দলে নামিয়ে এনে একপরিবারভুক্ত করেছে। এই বিশেষত্ব উপন্যাসটিকে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত করেছে।

'মানুষ গড়ার কারিগরে' কিন্তু মানুষ-গঠনের ছবি নেই। আছে শিক্ষা-কারখানার কাঁচামালের কথা, আর কারিগরদের জীবনসংগ্রামের ইতিহাস। আছে অর্থনৈতিক জীবনের বিপরীতে আদর্শ টিকিয়ে রাখার সমস্যা। কিন্তু পূর্ববর্তী রচনা "নবীন যাত্রা" (১৩৫৭) উপন্যাসে শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

সাত্রাদলের পিতৃমাতৃহীন অনাথ মূর্খ ছেলেটিকে শিক্ষিত ও মার্জিত রূপে গড়ে তোলা নিয়ে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়, তারই সমাধান সূত্রে লেখক প্রসন্ন মাস্টারের গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে নির্মল হালদারের গান্ধীজী-প্রকল্পিত গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বুনিয়াদি শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার করে প্রচলিত শিক্ষার দোষ-ত্রুটি নির্ণয় করেছেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে লেখক বুঝেছেন, চারদেয়ালের পরিবেষ্টনীর মধ্যে শাসনের কঠিন নিয়মের বন্ধন ছাত্রদের মনে অবরুদ্ধতার সৃষ্টি করে। তা স্বাবলম্বী করে না, ছাত্রদের মধ্যে শ্রমবিমুখতা আনে; শ্রম সম্পর্কে

এক প্রকার অশ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করে। এক কথায় এই বস্তু ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পরিপন্থী। পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কেবলই বৈষম্য বৃদ্ধি করছে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই শিক্ষাধারার কোন যোগ নেই। স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্রী গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে গতানুগতিক জীবনবিচ্ছিন্ন শিক্ষার অনুসরণ করা নিরর্থক। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তব ও সফল করে তোলার জন্য দরকার শ্রেণীহীন-শোষণহীন, শ্রমভিত্তিক আদর্শ শিক্ষা-পরিবেশ। আর, এইজন্য গান্ধীজী "নঈ-তালিম" শিক্ষা-পদ্ধতিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত এই শিক্ষাপদ্ধতি।

প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর দিকে দৃষ্টি রেখে গান্ধীজী হাতে-কলমে শিক্ষাদানের বাস্তব নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বুনিয়াদি শিক্ষার বাস্তব ভিত্তি হল কৃষি, সুতা-কাটা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি। কাজের মধ্য দিয়ে আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে নিত্যনব অনুশীলনের দ্বারা শিশু শিখবে। এইভাবে শিক্ষা দিলে শিশু পরিশ্রমী ও স্বাবলম্বী হবে, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবে, শ্রমের মূল্যবোধ ও মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে। ছাত্ররা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রী করে নিজ নিজ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করবে। "শিক্ষার মধ্য দিয়া কুশলীকর্মী, দরদী সমাজসেবী ও দুঃখ সহিতে প্রস্তুত বীরযোদ্ধা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাই; বুনিয়াদী শিক্ষায় ভোগের কথা নাই, আছে সেবার কথা, স্বার্থত্যাগের কথা"।[১] স্বরাজ-স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্য গান্ধীজী চেয়েছিলেন "এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন, পরিশ্রমী, ঈশ্বরবিশ্বাসী সমাজ সৃষ্টি" করতে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিকে লেখক কার্যকর করতে চেয়েছেন।

এই কাজের জন্য তিনি নির্বাচন করেছেন জনসংগঠনকারী স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক বিপ্লবীকে। কেননা, প্রয়োজন কৃচ্ছ্র সাধনা ও কঠিন আত্মত্যাগ। নির্মল হালদার আদর্শবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শকে সে কঠিন অধ্যবসায়, ত্যাগ এবং সাধনা দ্বারা বাস্তবায়িত করেছে কুটির ইস্কুলে। পল্লী-প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে শিশুমনের মুক্তি দিয়ে সে তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সংগঠিত করে। অমূল্যর স্বভাব-সংশোধন এরই ফলশ্রুতি।

---

১. শিক্ষক—আশ্বিন, ১৩৭৬

বাইরের যে বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশ থেকে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে, শিশুর স্বভাব ও আচরণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। মন্দ স্বভাব ও আচরণের জন্য দায়ী তার চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ। অমূল্য ছোট থেকেই অনাথ, ভাল শিক্ষা পায়নি সে। স্নেহহীন জীবন তার— আদর কি বস্তু সে জানে না। পেটভাতের বদলে সে পায় যাত্রাদলের নিষ্ঠুর শাসন আর অবহেলা। এই পরিবেশে অমূল্য ভদ্র আচরণ শেখেনি—নিয়ম-শাসনের বাঁধন তার কাছে অতিশয় পীড়াদায়ক।

শিশু স্বভাবত নিষ্পাপ। পরিবেশই খারাপ করে তাকে। শিক্ষাবিদ্ জাঁ জাকুস রুশো বলেন Everything is good as it comes from the hands of the author of nature but everything degenerates in the hands of man. অমূল্যের ক্ষেত্রে অন্তত এই কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। নির্মল হালদারের হাতে তার আমূল রূপান্তর ঘটল। হাসি গাঙ্গুলির Spare the rod, spoil the child—শাসনসর্বস্ব হৃদয়হীন শিক্ষানীতি "বেত মেরে শুধু পিঠে দাগ পড়বে, মনের ওপর দাগ বসাতে পারে না।" অমূল্যর মত দুরন্ত ছেলেকে ভাল করার জন্য দরকার ভালবাসা। নির্মলের ভাষায় "স্নেহের কাঙাল সে।" ইন্দ্রাণীও পারে নি তার মনের শূন্যতা পূরণ করতে। অমূল্যর প্রতি ইন্দ্রাণীর স্নেহ ছিল ধনীলোকের শৌখিন বিলাসিতা। হৃদয়ের ছোঁয়া ছিল না বলেই ইন্দ্রাণীর আদেশ নির্দেশকে উপেক্ষা করতে অমূল্য মজা পেত।

অমূল্যর আচরণের কারণ অনুসন্ধান না করে ইন্দ্রাণী চেয়েছিলেন শুধু বাঁধতে। ইন্দ্রাণীর প্রচেষ্টায় অমূল্য তাই সাড়া দেয়নি। লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক খেত সে, সুযোগ পেলে বাক্স ভেঙে চুরি করত। অথচ এই অমূল্যই নির্মলের সান্নিধ্যে সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হল। ইন্দ্রাণীর বিস্ময়ের জবাবে নির্মল তার শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাখ্যা করে বলল, তার বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার নিয়মকানুন নেই—কড়া বাধ্যবাধকতা নেই। ছেলেরা প্রকৃতির মত মুক্ত। নিজের খুশীমত তারা পড়ে, খেলে। শিক্ষক বেত হাতে করে থাকেন না, তাদের কর্মের সঙ্গী তিনি, আনন্দের অংশীদার। শিক্ষার এই অভিনব পরিবেশ অমূল্যর নবজন্মের হেতু। অন্যের দেখাদেখি সে পড়তে লিখতে শিখেছে। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রাণীর অবিশ্বাসের পাত্র অমূল্য নির্মলের পরম আস্থাভাজন। নির্ভয়ে যে অমূল্যের হাতেই তুলে দিয়েছে বাক্সের চাবি। বিশ্বাস ভালবাসা সহানুভূতি সহমর্মিতা স্বাধীনতা শিশুর

ব্যক্তিসত্তা গঠনের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন। এমনি পরিবেশই স্বাধীন-ভারতের সমাজতন্ত্রের পথে পৌঁছানোর উপযুক্ত শিক্ষানীতি বলে গণ্য হওয়া উচিত।

নির্মলের কুঠির ইস্কুলে অমূল্যর তাই মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেছে। মলয়ের অধঃপতনের জন্য ইন্দ্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ, বসন্ত রোগাক্রান্ত প্রসন্নপণ্ডিতের প্রতি অমূল্যর কর্তব্যজ্ঞান এবং আগুন থেকে তাঁকে উদ্ধার করা প্রভৃতি ঘটনা তার মহত্ত্বের পরিচয় দেয়, তার অন্তরপুরুষের সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎকার ঘটায়।

প্রাচীন ঋষিদের মত লেখকও বিশ্বাস করেন, মানুষ অমৃতের পুত্র। পুতুলের মত তাকে কেবল গড়ে নিতে হয়। নির্মলের বকলমে লেখক আপন বিশ্বাসের কথাই শোনান :

> "ওরা বড় ভাল। আমি ভালবাসি ওদের। যা সৎ, যা শ্রেষ্ঠ তার উপর ভালবাসা ক্রমশ জাগবেই।...ওরা নিষ্পাপ। একটুআধটু হয়তো ভুল পথে যায় কিন্তু পুণ্যের দিকেই ওদের স্বাভাবিক গতি।" (পৃ.—১২১

আখ্যায়িকায় বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যের ইঙ্গিত থাকলেও ফললাভ সম্পর্কে অশোকের উক্তির মধ্যে সন্দেহও প্রকাশ পেয়েছে :

> "কলকারখানার যুগে ঠুক ঠুক করে একটু কাঠ কুপিয়ে কিংবা ঠকঠকি তাঁতে দু'খানা গামছা বুনে চতুর্বর্গ লাভ হবে, কি করে বিশ্বাস করেন আপনি? সময় ও শক্তির অপব্যয়...গরীব ছেলেদের শিল্পকর্ম বলে চতুর্গুণ দামে আপনার ইস্কুলের মাল বাজারে বিকোবে না, কিন্তু তেমন দাম না পেলে পোষাতেও পারবেন না।"

শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস লেখা সম্ভব, 'নবীন যাত্রা' না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না। ঔপন্যাসিক গুণ ব্যাহত হয়নি কোথাও। সাধারণত এ ধরনের রচনা প্রচারধর্মী হয়ে পড়ে। কিন্তু লেখকের আশ্চর্য সংযম এবং পরিমিতিবোধ উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ ও সার্থক করেছে। বাঙালী-ঘরের সন্তানস্নেহাতুরা জননীর বাৎসল্য, তাঁর উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ কাহিনীর আলম্বন বিভাব হওয়ার ফলে আদ্যন্ত তার একটা সংযুক্তি আছে—কাহিনী ও ঘটনা কোথাও বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ পায় নি। এই সার্থকতার সূত্রেই 'নবীন যাত্রা' লেখকের একটি শ্রেষ্ঠ রচনায় পরিণত হয়েছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নিশিকুটুম্ব :

নিশিকুটুম্ব বাংলা সাহিত্যে তথা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। ১৯৬৬ সালে গ্রন্থটি 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার লাভ করে। চৌষট্টি কলার একতম চৌরবিদ্যা যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে, বাংলা ভারতীয় এবং বোধহয় পৃথিবীর সাহিত্যে মনোজ বসু তার প্রথম নজির দেখালেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর এখন অবধি এবিষয়ে আর কোন উদ্যম দেখা যায় নি। মনোজ বসুতেই আরম্ভ, এবং মনোজ বসুতেই শেষ। নানা প্রাচীন গ্রন্থে অবশ্য চোরদের নিয়ে অনেক কাহিনী আছে।

বিচিত্র মানব-সম্পর্কিত কৌতূহল লেখককে "নিশিকুটুম্ব" রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। নিজ সাহিত্যকর্মের বৈচিত্র্য ও বহুমুখিনতা সম্পর্কে দিল্লীতে সাহিত্য আকাদেমি আয়োজিত সাহিত্যিক সমাবেশে (১৯৬৭ সাল, মার্চ) লেখকের ভাষণটি এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে :

> "সমাজের আদিম পাপ দুইটি চৌর্য আর গণিকাবৃত্তি। গণিকা নিয়ে পৃথিবীর নানা সাহিত্যে কালজয়ী সৃষ্টি রয়েছে, কিন্তু চৌরকর্ম নিয়ে কোন বৃহৎ সৃষ্টি আমার নজরে পড়ে নি।...উপন্যাস লিখতে বসে কয়েকটি বৃদ্ধ চোরের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের অতীত কথা শুনলাম। শুনে রোমাঞ্চ লাগে, ঘৃণ্য চৌরকর্মের মধ্যেও আশ্চর্য মানবিকতা মাঝে মাঝে তাদের জীবনে ঝলক দিয়ে গেছে।...এত কালের অনাবিষ্কৃত এক আশ্চর্য জগৎ—'নিশিকুটুম্ব' বইয়ে সেই বিচিত্র জগতের পরিচয়।...তাদের চলাচল নিশিরাত্রে...(তাদের) অলিখিত আইন আছে, সেগুলি তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। সুনিপুণ কর্মবিভাগ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা।... চোরদের মতন সাধু অতিশয় বিরল। সাধুতা দলের মধ্যে...কাঞ্চন-লিপ্সু তারা, কিন্তু কামিনীতে অনীহা।...লেখকের হাত নিশপিশ করে এমন জিনিস নিয়ে লিখতে—"

চোরেদের জগৎ ও জীবন রহস্যময়। সুকঠিন অধ্যবসায়ের মূল্যে লেখক সেইসব অজানিত রহস্য ও সত্য আবিষ্কার করেছেন :

"ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে পড়াশুনো করেছি এই বিষয় নিয়ে। যত ভিতরে ঢুকি, বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।...মহাদেবের পুত্র দেব-সেনাপতি স্কন্দ বা কার্তিকেয় চৌরশাস্ত্রের প্রবর্তক—চোরের অধিদেবতা তিনি।...বাংলার চৌরসমাজে স্কন্দ ছাড়াও এক দেবী ঢুকে পড়েছেন—কালী।...নিজে তিনি সযত্নে চুরিবিদ্যা শেখাচ্ছেন, চোরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।"

এই সব সংগৃহীত তথ্য ও সত্যের সঙ্গে লেখক অত্যাশ্চর্যভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন জীবনকে। তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন তিনি। তাই রচনার মধ্যে ঘৃণ্য চৌরকর্মের সম্পর্কে লেখকের ঘৃণা প্রকাশ পায়নি, তাদের জন্যে বরঞ্চ অসীম মমতা, ও সহানুভূতি অনুভব করেছেন। চোরদের জীবনে তাই "সমাজের আদিম পাপের" চেহারাই শুধু ফুটে ওঠেনি, পরিপূর্ণ মানবিক মহিমায় তারা ভাস্বর। মানুষকে ভাল না বাসলে এরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। এই থেকে উপেক্ষিত অবহেলিত মানুষদের প্রতি লেখকের সহজ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

রচনার কৌশলে 'নিশিকুটুম্ব' শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। জীবনের আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে সব নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে, লেখক তার সদ্ব্যবহার করেছেন। পাঠকের উদ্দাম কৌতূহল আর উৎকণ্ঠার ফাঁকে ফাঁকে তিনি চোরদের জগতের নিয়মকানুন এবং বহু অপরিজ্ঞাত তথ্য ও সাংকেতিকতার বিচিত্র-ইতিহাস উদঘাটন করে চলেছেন। বিভিন্ন ছোট ছোট জীবনকাহিনী এবং ঘটনার মধ্যে তাদের কীর্তিকলাপকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে গল্প কোথাও একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি। কিংবা থেমে থাকেনি। স্রোতের টানে প্রবলবেগে এগিয়ে চলেছে। পাঠকের কৌতূহল শুধুমাত্র চুরির ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকে না, তার চারিপাশে আমাদের অপরিচিত জগৎ ও মানুষ এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। একটা মহাকাব্যীয় জীবনের রূপ প্রত্যক্ষে আসে তখন।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাহেব। তার জীবন-বিকাশের সূত্রেই এসেছে অন্যান্য চরিত্র। এরা হল সুধামুখী, পারুল, রানী, সুভদ্রা, আশালতা, নমিতা, মধুসূদন, নটবর, পচাবাইটা, বলাধিকারী, নফরকেষ্ট ইত্যাদি। গঙ্গার ঘাটে কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে সাহেব। তার পিতৃমাতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত। কিন্তু জীবনে স্নেহবঞ্চিত নয় সে—সুন্দর সুদর্শন চেহারা সকলের মনোহরণ করে। তাকে দেখলেই অভূতপূর্ব বাৎসল্যের উদয় হয় মনে। মেয়েদের জননী

স্বভাবের কারণে সুধামুখী তাকে মায়ের স্নেহ উজাড় করে দিয়েছে। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল পিতার জন্য সাহেবের অন্তরাত্মা ব্যাকুল। এই মনোবেদনার উদ্ঘাটন হয়েছে প্রথম পর্বে। প্রসঙ্গত বেশ্যাদের জীবন-ট্রাজেডি এবং জীবন-তৃষ্ণা ও সন্তানপালন সমস্যার কথাও এসে পড়েছে। নারীর চিরন্তন গৃহজীবনের আকাঙ্ক্ষা ও সন্তান-সাধ পরিতৃপ্ত হয় না বলে পতিতারা জীবনে ভীষণ রিক্ত। রানী তাই বলে, "একটা ভিখারি মেয়ের যা আছে, তা ও যে আমার নেই।" "বুকের ভেতরটা ধূ-ধূ করছে তেপান্তরের মত"।

মানুষের হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার যারা শিকার, তাদের প্রতি লেখক সাতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন। তাদের দুঃখে মানবদরদী লেখকের মন আপ্লুত। লম্পটদের খুনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পারুল নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, "মানুষ খুন করলে তো ফাঁসি হয়। আমাদেরও খুন করছে। খুনেই শোধ যায়নি, মড়া নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে খুনেরা এসে। এতে আরও বেশি করে ফাঁসি হবার কথা।" বড় দুঃখে সুধামুখীও বলে: "আমাদের ভালবাসা জীইয়ে রাখতে কি কষ্ট যে পারুল।" পাপ নয় পাপীই হয়েছে লেখকের সহানুভূতির আশ্রয়। দের দুঃসহ যন্ত্রণায় নিষ্ফল মাথা কোটা লেখকের সমবেদনা আকর্ষণ করে। মানুষের লালসার শিকার হয়েও সুধামুখী পারুল মাতৃত্বকে বিসর্জন দেয়নি, রানী দেয়নি তার প্রেমকে।

সাহেব চরিত্রে দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব প্রবল প্রকৃত পক্ষে যা হতে চায়, পরিবেশের জন্যে তা হতে পারছে না—তারই জন্য বুকজোড়া হাহাকার সাহেবের। আবার অনুশোচনাও। দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের দ্বন্দ্বে অন্তরাত্মা ক্ষতবিক্ষত। সাহেব চোর, কিন্তু পাষণ্ড নয়। তার মধ্যে অনুভূতিশীল হৃদয় আছে। সে জন্যে মেয়েদের কান্না, শিশুদের কষ্ট সে সইতে পারে না। এমন কি যে-বাড়ি চুরি করে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে, সে বাড়ির জন্য একপ্রকার মমতা বোধ করে অন্তরের মধ্যে। এই মনোবৃত্তি চোরের নয়। নয় বলেই তার মনে এক প্রকার অস্বস্তি ও যন্ত্রণা আছে। যন্ত্রণার মূলে রয়েছে সুজীবনের প্রতি লোভ। মানুষের স্নেহ সমাদর ভালবাসায় মন এক এক সময় কানায় কানায় ভরে উঠে, তখন মানুষের মধ্যে বসবাসের জন্য সে আকুল হয়। রানীও সতী-সাধ্বী গৃহলক্ষ্মী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু অভিশপ্ত পরিবেশ সে সুযোগ তাকে দেয়নি। তাই মানুষের সমাজের প্রতি সাহেবের একটা অভিমান রয়েছে। আরাধ্যা দেবী মা-কালীর কাছে কায়মনোবাক্যে সে প্রার্থনা করে: "আমায় মন্দ করে দাও মা-জননী—একেবারে নিখুঁত

নির্ভেজাল মন্দ।" সমাজের প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সাহেবের অন্তর-সংঘাতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

লেখক কিন্তু সাহেবের কামনা পূরণ করেননি। মানুষ অমৃতের পুত্র, সে কখনও খারাপ হতে পারে না। "মানুষ জাতটারই দোষ রে। চেষ্টা যতই কর, মন্দ হবার জো নেই।" সাহেবের বেনামীতে লেখক আপন মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন : "দেখে যাদের মন্দ ভেবেছি, আজকে মনে হচ্ছে, ঢং দেখিয়ে তারা মন্দ সেজে বেড়ায়—দায়ের মুখে ভাল মূর্তিটা বেড়িয়ে পড়বে।" যেমন সাহেবের মাঝে মাঝে বেড়িয়ে পড়ত। চোর হয়েও সাহেব রাখালের স্ত্রীর গহনা গ্রাস করেনি। নমিতার গহনাও ফেরত দিয়েছে সে। "জন্মসূত্রে পাওয়া ভালমানুষী মনের মধ্যে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, চেষ্টা করেও রোধ করতে পারে না।" সাহেবের মানবিক আচরণের ব্যাখ্যা করে লেখক বলেন, "অমৃতের বেটাবেটি সব, ভালো না হয়ে উপায় আছে?" সাহেব তাই চেষ্টা করেও খারাপ হতে পারেনি।

চোর হওয়ার প্রথম দীক্ষা সাহেব পায় নফরকেষ্টর কাছে। পচা বাইটা তার আসল শিক্ষাগুরু। দ্বিতীয় পর্বে লেখক সাহেবের চৌর্যবিদ্যা-শিক্ষা এবং তার নিপুণ প্রয়োগের বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনার সমাবেশ করেছেন। চোরের কাহিনীর এমনভাবে সন্নিবেশ হয়েছে যে নিশ্বাসরুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পড়ে যেতে হয়। 'নিশিকুটুম্ব' একটি স্বতন্ত্র জাতীয় উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি এক এবং অদ্বিতীয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহামানবের সাগরতীরে :

হিন্দু-মুসলমান নিয়ে মনোজ বসু অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। স্বাধীনতাউত্তর কালে বিভক্ত-বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি লেখককে জিজ্ঞাসাকুল করে :

> "হাসতে গিয়ে হাঁ হয়ে যাই দেশ-বিভাগের গতিক দেখে।...নিরীহ গৃহস্থমানুষ হঠাৎ দেখে, দয়াদরদ-ভরা চিরকালের প্রতিবেশীদের আর চেনা যায় না। বাসভূমি রাতারাতি শুয়াল অরণ্য—হিংস্র, জীবজন্তু

চতুর্দিকে।...কত পরিবার বিনা অপরাধে উৎসন্ন হয়ে গেল। মানুষের ইতিহাসে এক অনপনেয় কলঙ্ক।''[১]

শহীদের রক্তমূল্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা সাম্প্রদায়িকতার বিষে নীল হয়ে উঠল কেন, নানা দিক দিয়ে লেখক সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে যুগ যুগ ধরে অনুকূল-প্রতিকূল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে বসবাস করার ছবি। স্নেহ-ভালবাসায় বন্ধুত্বে আপন তারা। একের সাহায্যে অন্যজন এগিয়ে আসে। অথচ, একটি রাজনৈতিক ঘোষণা রাতারাতি সমস্ত সম্পর্কের উপর যবনিকা টেনে দিল। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় লেখকের; "এক দুঃস্বপ্ন'' বলে মনে হয়।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেখক আশাহত হলেন। হতাশার কারণ অনুসন্ধানে তিনি সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিচার করেন, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জীবনযাপনের মধ্যেকার পার্থক্য। দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্মলগ্নেই রক্তাক্ত হল। "রক্তের বদলে রক্ত" উপন্যাসে লেখক মানবেতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় উপস্থাপিত করেছেন। সমস্ত ভুলভ্রান্তির হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করে জীবনের দাবি কি, তার প্রয়োজনীয়তা কি—লেখক প্রশ্নসূত্রে উত্থাপন করেছেন।

"জনতার গর্জন ওঠে...রক্তের বদলে রক্ত।

নরেশ ডাক্তারের ছোট মেয়ে ইরা...চুপি চুপি সুরেশকে বলে, ভাই কাকমণি, ওরা ঠিক বলেছে। স্টেশনে আবদুল-দাদার রক্ত দেখে এসেছি। ঘুষির পর ঘুষি মারছে, রক্ত দরদর করে পড়ছে। মাসিকে (লায়লা) আমরা কিছুতে ছাড়ব না।"

লায়লা অসহায় হয়েও বুকের মধ্যে আক্রোশ পুষে রাখে। চরম পরীক্ষার মুহূর্তে তারও মত-বদল হয়। জীবনের দাবি উপলব্ধি করে সে।

"সুরেশের দিকে চেয়ে বলে, এই বিষ মুঠোয় করে নিয়ে সাধু-খাঁর দলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার এই হাতিয়ার। ভেবে রেখেছিলাম, মরব, মেরে মরব—যারা আমার নানীকে মেরেছে, মামুকে মেরেছে, একফোঁটা নিষ্পাপ নীলুফারকে অবধি মেরেছে। কিন্তু বাঁচবার গরজ আজকে আমারও...এ জিনিষ আমি কাছে রাখব না।"

নির্মম বাস্তবকে লেখক আবেগ দিয়ে রুখতে পারেন নি। ইতিহাসের

১। ঝিলমিল—ভাষা সাহিত্য ও সংহতি পৃ. ১৩৪।

অমোঘ সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। "রক্তের বদলে রক্ত" উপন্যাসে এই সমস্যার সাহিত্যায়ন।

লাহোর মুসলমানের; হিন্দুরা তথায় অপাংক্তেয়। তাদের শেষ অস্তিত্বটুকুও যাতে না থাকে, তার ষড়যন্ত্রে সেদিনের সরকার পর্যন্ত লিপ্ত। বিদ্বেষের ফল শুভ হয়নি সাধারণ মানুষের জীবনে। "লাহোরের শোধ কলকাতা শহরে।" ঢাকাতেও। "গলায় গলায় ভাব যাদের সব সময়, হঠাৎ তারা যেন কি রকম হয়ে গেল।" পূর্বের সদ্ভাব, চেনাশোনা মাখা-মাখি ভালবাসাবাসির শেষ হল যেন অকস্মাৎ।

কিন্তু রক্তাক্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা সত্ত্বেও মানবধর্ম অমলিন। এই সত্য চিত্রায়িত করবার জন্য অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী লেখক অমলা ও নবনলিনীর উপাখ্যান ফ্লাশব্যাকে বিবৃত করলেন। দ্রুতহাতে লেখক নক্সাচিত্র এঁকে মূলসমস্যায় আলোকপাত করেছেন।

অমলা হিন্দুকন্যা হলেও তার কাকা ধর্মান্তরিত মুসলমান। তাই নরেশের সঙ্গে অমলার বিয়েয় নবনলিনীর আপত্তি ছিল। খানিকটা বাধ্য হয়েই তিনি অবশেষে মেনে নিয়েছেন। তবু অমলার সঙ্গে মনের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন তিনি। অমলার কাকা কামালউদ্দিনের নির্মল নিষ্পাপ পবিত্র স্নেহ-ভালবাসাকেও নবনলিনী সংস্কারবশে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিতেন। নবনলিনীর হিন্দুনারীসুলভ যুগযুগান্ত-লালিত সংস্কার বিশ্বাস আচারের বিরুদ্ধে অমলার আত্মমর্যাদাবোধ উপস্থাপিত করে লেখক সৃষ্টি করলেন স্বাভাবিক বাস্তব পরিবেশ। নব-নলিনীর অন্ধ কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় আচারের বিরুদ্ধে অমলা মানবিক প্রশ্ন করে: "তার চাচা নিচু এদের চেয়ে কোন বিচারে?—যে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র হতে হবে চাচার ভালবাসার পাত্রদের?" গৃহকোণে অঙ্কুরিত এই সমস্যাই সম্প্রসারিত হয়েছে ভারতীয় সমাজ তথা রাজনৈতিক জীবনে।

ইতিহাস ধর্ম আর অনুশাসন যাই বলুক, সত্য হল মানব-ধর্ম। এই দৃষ্টিকোণের মধ্যে কোথাও কোন রকম অস্বচ্ছতা নেই। লেখক আপন বিশ্বাসের সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনী মিলিয়ে দিয়েছেন বলে রচনার কোথাও দ্বিধা-জড়তা প্রকাশ পায় নি। প্রতিটি চরিত্র প্রাণবন্ত। এর কারণ, লেখকের কাছে বড় হল জীবন। যে জীবন মাথার ওপরকার আকাশটার মত বিরাট, অনন্ত রহস্যে পরিপূর্ণ। আলো, অন্ধকার, রোদ, বৃষ্টি, পাপ ও পুণ্যের

লীলায় পরিপূর্ণ এক সত্তা। লেখক অখণ্ড সত্তার আলোয় হিন্দু ও মুসলমানের কাছে জীবনের অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন।

"পথ কে রুধবে?" উপন্যাসে লেখক পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে কাহিনীর মধ্যে বাস্তব অবস্থা উপস্থাপিত করেছেন। এর এক-কোটিতে আছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-দংশন, অন্যকোটিতে আছে হৃদয়ের দাবি—অন্তরের বন্ধন।

লাহোরের পৈশাচিকতায় লীলার নারীত্ব লাঞ্ছিত, স্বামী নিহত। "বদলা চাই, বদলা চাই- বুকের রক্তের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে।" প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র নিপীড়িত মানুষের মনেই নয়—"আজাদির নামে বাংলাদেশের যে দৈন্য হল তারও বদলা চাই—লক্ষ লক্ষ মানুষের দাবি।"

সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক খড়্গাঘাতে বাঙালী জাতিকে খণ্ডিত করে দিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনেও সেই বিষ ঢুকে যাবার ভয়। হাসান, টুটুব সরল কৌতূহল, অজ্ঞান-জিজ্ঞাসা, সমাধানহীন জবাবকে জীবন সমালোচনার বিষয়ীভূত করে লেখক মানবিক সংকটের এক তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন।

সাম্প্রদায়িকতা মানুষের সহজাত ধর্ম নয়। সামাজিক পরিবেশই এর জন্য দায়ী। বাঙালীর স্বভাবের মধ্যে এই বোধটি তেমন প্রবল নয়। বাঙালীদের মধ্যে প্রতিশোধাত্মক আকাঙ্ক্ষাও জিঘাংসাময় নয়। অন্তত লেখক মনোজ বসুর দৃষ্টিতে ত নয়ই। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের দীর্ঘকালের প্রীতি-মধুর সম্পর্ক রোমান্টিক লেখকের দৃষ্টিতে এক আশ্চর্য সুন্দর মিলনাত্মক পটভূমি রচনা করে। প্রেমের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন বাঙলার মানুষ। দেখেন নি তারা কোন ধর্মের, কোন সম্প্রদায়ের। পরিচয় তাদের একটাই—তারা বাঙালী, তারা মানুষ। রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে হঠাৎ কেমন সব ঘুলিয়ে গিয়েছিল; হিন্দু ও মুসলমানের পূর্বেকার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। অসুন্দরকে দেখতে পারেন না লেখক। হিংসা ও আক্রোশের দ্বারা জীবন-সত্যের মীমাংসা হয় না। লেখকেরই প্রতিরূপ ইতিহাসের অধ্যাপক বীরেশ্বর—তিনিও এই বিশ্বাস পোষণ করেন। তাই দেখি, পুত্রবধূ লীলাকে হিংসা থেকে নিবৃত্ত করেছেন তিনি। বাংলাদেশের শ্যামল-সবুজ মাটি লীলাকে ভুলিয়ে দিল তার অন্তরের গোপন হিংসা। যে পিস্তল সে গোপনে বয়ে বেড়াচ্ছিল, আঠারো বছরের সীমায় এসে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল।

"রিভলবার কোথায় জং ধরে পড়ে আছে, খবর রাখিনে। অথচ

একটা শত্রু নেই দেখ কোনদিকে—সবাই আপন, সবাই আত্মীয়। এর চেয়ে জোরের বদলা কে কবে নিয়েছে।"

এই উপলব্ধি আকস্মিক নয়। ভুলের মাশুল গুণে স্বাধীন দেশের বংশধররা ধরে ফেলেছে মতলববাজ মানুষের কু-অভিসন্ধি। তাই পূর্বের হানাহানিতে ইস্তফা দিয়ে দেশ ও জাতি গঠনের স্বপ্নে তারা বিভোর। "এরা হিন্দু জানে না, মুসলমান জানে না, জানে শুধু মানুষ।" এই মানবিকতাই মিলিয়ে দিয়েছে দুই-বাংলার মানুষকে।

বাংলার দুই খণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় খুব বেশি তফাৎ নেই। একই ভ্রাতৃত্ববোধ উভয় দেশের মানুষের। ধর্ম নয়, জাতি হিসাবেই তাদের একক পরিচয়—বাঙালী' এই উদার অভ্যুদয়ের মুগ্ধতায় বিহ্বল লেখকের কণ্ঠ বীরেশ্বরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে—

> "আজকের যুবসম্প্রদায়, এই বিশ-বাইশ-পঁচিশ যাদের বয়স—জ্ঞান হওয়া ইস্তক হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বলে কোন কিছু সামনে আসেনি তাদের। হীনমন্যতা নেই, কোনরকম সাম্প্রদায়িকতার নিশ্বাস তারা জীবনে কখনো নেয়নি।"

হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী ও ঐক্য লেখকের কাছে সুদীর্ঘ কালের প্রত্যাশিত। ধর্মীয় আনুগত্যের নামে বিদ্বেষ ঘৃণা ও বৈষম্যের যে সূচনা হয়েছিল, তার স্খলন ছিল অনিবার্য। ঐতিহাসিক।

> "ইতিহাস ধীরগতি, কিন্তু অমোঘ।... নিজের ঠাঁই ফিরে পেতে ইহুদিদের দু'হাজার বছর লেগেছে, আমাদের তো বিশটা বছরও হয়নি এখনো। তারই মধ্যে কত কাছাকাছি এসে গেছি।"

জীবনের এক অসীম কল্যাণময়তায় লেখক নিত্যবিশ্বাসী। ইতিহাসের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে লেখক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হয়েছেন। বাংলাদেশের দুই প্রান্তে, কর্মে ও মর্মে, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মিল যত সুগভীর হবে, ততই মিলন-সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হবে।

'পথ কে রুখবে' (১৯৬৯) প্রকাশের দু'বছরের মধ্যেই স্বাধীন-বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লেখকের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব পরিণতি দান করেছে। এর মধ্যে তাঁর আশ্চর্য দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেল। প্রসঙ্গত বলব, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভক্ত-বাংলাদেশ নিয়ে অনেক লেখকই গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু মনোজ বসুর মত উভয় বঙ্গের মানুষে মানুষে মিলন-স্বপ্নে বিভোর ছিলেন না কেউই। দুই বঙ্গের মানুষ দুই পৃথক সার্বভৌম ভূখণ্ডের অধিবাসী

হলেও ভাষা ও সংস্কৃতিতে তারা একাত্ম। উভয়ের মধ্যে আছে চিরমধুর আত্মীয়তা। লেখক চিরকাল তাঁর গল্পে উপন্যাসে সেই প্রীতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে এসেছেন।

স্বাধীন-বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হিন্দু-মুসলমানের যৌথ কর্মোদ্যোগে। লেখকেরই পরিকল্পিত আদর্শের বাস্তবায়ন। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ যে কৃত্রিম এবং মিথ্যা রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীন-বাংলাদেশ এই সত্যেরই ঘোষণাপত্র। সমস্ত সংশয়মুক্ত হয়ে এখন লেখকের মত সকলেই বিশ্বাস করি, আমরা হিন্দুও না, মুসলমানও না—আমরা বাঙালী। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ মনোজ বসুর চিরকালের বিশ্বাস রূপলাভ করেছে। "দুর্যোগের ফাঁক পেয়ে হিন্দুস্থান পাকিস্তান ওদিকে একাকার হয়ে গেল।" "এজাত, ও-জাত নিয়ে এখন আর তিলেকমাত্র অভিমান নেই, কণ্ঠধ্বনিতে মালুম।" "চব্বিশ বছর (আঠারো বছরের স্থলে) আগে যে রকমটা ছিল, তাই হয়ে গেলি তোরা এই মুহূর্তে।"

অতএব স্পষ্ট বোঝা গেল, মনোজ বসু মানবতাবাদী লেখক সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরোধী। তাঁর সমস্ত রচনাই ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁর উদার মানবতাবাদের পশ্চাতে আছে বৃহত্তর আদর্শ। শান্তিবাদের প্রতি লেখকের অবিচল আস্থা রোমাঁ রোলাঁর মত মানবিকতা বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং শান্তি তাঁর এপিক উপন্যাস 'পথ কে রুখবে?'র মর্মকথা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

স্মৃতিচিত্রণ : ছবি আর ছবি

মনোজ বসুর শিল্পায়নে স্মৃতি একটা বড় অবলম্বন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা স্মৃতিপথ বেয়ে ফুটে উঠেছে বহু রচনায়। এই প্রসঙ্গে লেখকের স্বগতোক্তি হল :

> "জীবনের পদে পদে হরেক স্মৃতি কুড়িয়েছি—স্মৃতির বোঝা উজাড় করে ঢেলে তবে ছুটি।"[১]

'ভুলি নাই', 'বাঁশের কেল্লা', 'রূপবতী', 'মানুষ গড়ার কারিগর' প্রভৃতি উপন্যাসে লেখক-মনের সেই পরিচয়ের আনন্দ ও বিস্ময় ছড়িয়ে আছে। বিস্ময়

১। বেতার ভাষণ : ২৫.২.৫৯।

ও আনন্দবোধের সূত্রেই মানুষের যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তুলে তিনি পাঠকের মনে অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চার করতে উৎসাহী হয়েছেন।

'ছবি আর ছবি'তে স্মৃতির এই মূল্যবোধ আরো গভীর :

> "সেকালের এক ছোট্ট ছেলে অনন্ত বেদনার বোঝা বয়ে ঘুরে বেড়ায় শহরের দালানকোঠার গোলকধাঁধার ভিতর। নির্বাসিত সে নিজভূমি থেকে, শহরকে এতকালেও চিনল না।...ছবির গহনে পায়চারি করে সে নির্বাসনের দুঃখ ভোলে। কলমের রেখায় তার আপন মাটি আর আপন মানুষেরা ফুটে উঠেছে।"[২]

দেশ-ভাগাভাগির ফলে মনোজ বসুর শিল্পীমন গভীরভাবে অভিভূত। শিল্পী নিজেই ঐ বিযুক্ত দেশের অধিবাসীদের একজন। নিজদেশে পরবাসী হওয়ার যন্ত্রণায় মন তাঁর বিধুর। পল্লীপ্রাণ লেখকের পল্লী-বিচ্ছিন্নতা দুঃসহ। একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া সে মর্মবেদনার কোন দোসর নেই। 'ছবি আর ছবি'তে আত্মকথনের ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে সেই কাহিনী। বর্তমানকালের প্রেক্ষাপটে লেখক এক বিস্মৃত অতীতকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

দেশ-ভাগাভাগির পর সংখ্যালঘুরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হল। শিয়ালদহ স্টেশনে নানান জায়গার মানুষ যে ভাবে দিন যাপন করছে, তা লেখকের মন ছুঁয়ে যায় :

> "স্বপ্নে এসে সেই সেকাল আমায় বলে··তুমি অমৃত সিঞ্চনের মতন কালির নিষেকে আমাদের বাঁচিয়ে তোল।...সত্য জিনিষটাকে জাহির কর একালের সামনে।··তুমি সমস্ত জানো, তুমি স্বচক্ষে দেখেছ।"[৩]

সেই দেখা-জীবন "আলতো ভাবে স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়ায়।" স্মৃতিসূত্রে গাঁথা হয় 'ছবি আর ছবি'র কাহিনী।

বিশেষ কোনো ঘটনার নির্বাচন নয়, বৃহত্তর লোকালয়কে আবাহন করেছেন লেখক এই উপাখ্যানে। সেজন্য একটা বিশেষ techniqueএর আশ্রয় নিয়েছেন। স্বপ্নের রাজপথ ধরে লেখক ডোঙাঘাটায় যাবার মানচিত্র আঁকেন। বাঁধাঘাট, নাগরগোপ, সুন্দলপুর, গড়ভাঙা, হরিতলা ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গা পেরিয়ে দুর্গম পথ ভেঙে স্বগ্রাম ডোঙাঘাটায় পৌঁছন।

চলার পথে আশপাশের গ্রাম ও তার মানুষজন স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে

---

২. বেতার ভাষণ : ২৫.২.৫৯।

৩. ঐ

উঠছে। পথ চলতে চলতে লেখক সকলের পরিচয় দিচ্ছেন। চলচ্চিত্রের মত একটির পর একটি ছবি স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠছে। আর লেখক হাতে তুলি পাত্রে রঙ নিয়ে সেই দেখা-জীবন ও ঘটনার ছবি হুবহু আঁকতে আঁকতে যাচ্ছেন। মূলকাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অসংখ্য চরিত্র এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনারাশি পল্লীগ্রামের সামগ্রিক জীবনযাত্রার অখণ্ডতাকে প্রকাশ করে। পল্লীর রূপ, রঙ, জীবন, ঐতিহ্য, বিচিত্র জীবনযাপন-পদ্ধতি দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। তাই অসংখ্য মানুষের গল্পে সমৃদ্ধ 'ছবি আর ছবি'। লেখকের দৃষ্টিকোণ এখানে ট্যুরিস্ট-গাইডের মত। পরিবেশ রচনার গুণে গ্রামের মানুষের সরল আচার আচরণ, কৌতুকপ্রিয়তা, ভোজন-ক্ষমতা, লোক-লৌকিকতা, বংশ-মর্যাদার প্রতিযোগিতা, পল্লীর নানা রহস্যবৈচিত্র্য ও আধিদৈবিক কাহিনী বিশিষ্ট রসমূল্য লাভ করেছে। প্রত্যেকটি ছবি স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত, পৃথক পৃথক ফ্রেমে তাদের বাঁধাই করে রাখার মত। কিন্তু কোন একটি বিশেষ জীবন-কাহিনী সুপরিণত রূপ পায় নি। ফলে, এর ঔপন্যাসিক শিল্পমূল্য হয়তো ব্যাহত হয়েছে। স্মৃতি রোমন্থনের আনন্দই এখানে প্রধান।

আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় এক ধরনের অনির্দেশ্য ভাবাবেগ লেখকের উপর সঞ্চারিত হয়। দুঃখ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, সমস্যাজড়িত মানুষদের জীবন এবং পারিপার্শ্বিক তাঁর মনোভূমিতে আবেগকম্পিত অনুভূতির সৃষ্টি করে। এক আশ্চর্য জীবনমহিমা উপলব্ধি করেন লেখক। কিন্তু নিরাসক্ত ভাবে তিনি আনন্দ সৃষ্টি করতে পারেন নি ; চরিত্রগুলির সঙ্গে এককালে অন্তরঙ্গতা ছিল বলে মাঝে মাঝে আপনার উপস্থিতি জানান দিয়ে তাদের অংশীদার হয়ে গেছেন। ফলে, জীবনের বিরাট পটভূমিকায় লেখককে পাঠক বড় আপনার করে পায়। অতীত ঘটনার স্মৃতিচারণা হলেও লেখক নিজে চলন্ত ঘটনার দ্রষ্টা রূপেই প্রকট হয়েছেন।

মনোজ বসুর স্মৃতিচারণায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার মধ্যে গতির দ্রুততা নেই—একটা ঢিলে-ঢালা ভাব সর্বত্র। তাড়া নেই, তাগিদ নেই—রসিয়ে রসিয়ে গল্প করে যাওয়া। এর ফলে, গল্প-পরিবেশনে একটা বৈঠকী মেজাজ পরিলক্ষিত হয়। এবং স্মৃতিই হয়েছে গল্পের একমাত্র অবলম্বন। স্মৃতিচারণা কালে দুই কালের ব্যবধান এবং দেশকালের পার্থক্য সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা উপলব্ধি করা যায়। স্মৃতি আর কল্পনার ঢেউয়ে দুলছে সমগ্র কাহিনী। অতীতকে ফুটিয়ে তোলার চেয়ে তার সঙ্গে লেখকের

অন্তরাত্মার নিগূঢ় যোগাযোগটাই নিবিড় হয়ে ফুটেছে। তারই অনুভূতি বর্ণাঢ্য হয়েছে।

মনোজ বসুর স্মৃতির প্রকৃতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে আছে স্বকীয় অনুভূতিজনিত তীব্র ভাবাবেগ, অন্যদিকে আছে মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ও মানবিক অভিজ্ঞতা।

> "গভীর রাতে এক একদিন তারা যেন মিছিল করে আসে। আলতোভাবে স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়ায়।…শুধু মানুষগুলি নয়—গাছপালা, গরু বাছুর, খালবিল, সুখদুঃখ, আশা-উল্লাসে ভরা আমার সেকালের গ্রাম, আর সমস্ত অঞ্চলটা।"[৪]

জন্মভূমি ডোঙাঘাটা তার আশপাশের অঞ্চল এবং মানুষের সঙ্গে লেখকের নাড়ীর যোগ। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছন্দে ঘোরাঘুরির কোন বাধা ছিল না। ছোটবেলা থেকেই তিনি অনুভূতিপ্রবণ; গ্রামের শোভা-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হত তাঁর কবি-মন। শৈশবের বিমুগ্ধ কৌতূহল ফুটে উঠেছে তাঁর অসংখ্য রচনায়। যে ডোঙাঘাটায় তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে, তার স্মৃতি মনোজ বসুর সমস্ত অন্তর জুড়ে। "সৈনিক" উপন্যাসের পাতায় লেখক জীবনস্মৃতির কিছু আলপনা এঁকেছেন। "জলজঙ্গল" এবং "বন কেটে বসত" উপন্যাসে টেনেছেন তার দিগন্তবিস্তৃত প্রতিরূপ। পল্লী-গ্রামের মুগ্ধতার স্বাদ এসেছে 'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসেও। আর সমগ্র জীবনের স্মৃতি নিয়ে পরমোজ্জ্বল 'ছবি আর ছবি'। যে সব উপাদান-উপকরণ ঔপন্যাসিক-জীবনের নেপথ্য-প্রেরণা জুগিয়েছে, 'ছবি আর ছবি' উপন্যাসে স্মৃতিবিধৃত সেই সব মানুষ ও ঘটনাব ছবি। আনন্দ ও বিস্ময়বোধেব তরঙ্গে ভেসে উঠেছে ডোঙাঘাটা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতি।

স্মৃতিচিত্রণ হিসাবে 'ছবি আর ছবি' সার্থকতার দাবি রাখে। স্মৃতি থেকে আহৃত চরিত্রগুলি সবই চিত্রধর্মী। মনোজ বসুর উপন্যাসে এমন অনেক চরিত্র দেখা গেছে, মূলকাহিনীর সঙ্গে যাদের যোগ সামান্য। এমনি সব চরিত্র স্মৃতিচিত্রণের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। বহুবিচিত্র মানুষের সমাবেশে স্মৃতিচিত্র সার্থক হয়ে উঠেছে।

৪। বেতার ভাষণ : ২৫. ২. ৫৯

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সত্তরের নায়ক ঃ আমি সম্রাট

মনোজ বসু জীবনানুসন্ধানী শিল্পী। বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও লেখকের জীবন-অন্বেষণের বিরাম নেই। আমাদের জীবনের চারপাশে যে ক্লেদ-গ্লানি জমেছে, লেখক মন তার জন্যে বিচলিত। দরদী মন নিয়ে তিনি দেখেছেন সমস্যার স্বরূপ খুঁজেছেন তার উৎস। উৎসুক লেখকের দৃষ্টির সম্মুখে আছে একটি জাগ্রত জীবনবোধ। গোর্কির ভাষায় উক্ত জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় ব্যক্ত করা যায় :

> "যদি প্রশ্ন করা হয় আমি কেন লিখতে শুরু করলাম, আমি উত্তর দেব ক্লেশকর বিবর্ণ জীবনের তাড়নায়, এবং এত-কিছু দেখেছিলাম যে না লিখে পারছিলাম না বলে।"

কারণ, "সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ তা পৃথিবীব্যাপী অসন্তোষ ও বিদ্রোহের প্রতীক।"[১] এই চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভে সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত তরুণ সমাজ। সমাজের অনাচারে অত্যাচারে বিবেকহীনতায় তারাই বেশি ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, অতৃপ্ত এবং অসহিষ্ণু। বিভ্রান্ত যুবসমাজের সামনে নেই কোন আশার জগৎ, বিশ্বাসের আশ্রয়। অন্তরে বাইরে ভীষণ নিঃস্ব তারা। উত্তেজনা দিয়ে তারা শূন্যতা ভরিয়ে রাখে। ভুলতে চায় মনের গ্লানি, জীবনের হাহাকার, অপ্রাপ্তির বেদনা, শূন্যতার যন্ত্রণা। সমাজের এই অবক্ষয়, জীবনের এই রূপ শুধু জটিল নয়—বর্ণ-বৈচিত্র্যেও অসামান্য। হতাশাক্লিষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষুব্ধ আত্মঘাতী এই তরুণদের সম্পর্কে আজকের ঔপন্যাসিকদের অন্তহীন ঔৎসুক্য। সত্তর দশকের উপন্যাসে এরাই পেয়েছে নায়কত্বের গৌরব।

তারুণ্যের বিচ্ছিন্নতাবোধ, শূন্যতাবোধ উপন্যাসের কাহিনী-প্রকরণ হলেও কাঠামো সৃষ্টিতে সফল ঔপন্যাসিক নিজ নিজ পথ আবিষ্কারে ব্রতী। প্রত্যেকের রচনাই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত, আপন জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত। বিমল কর

১। চতুরঙ্গ—শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩ : ভারতীয় ঐতিহ্য— অধ্যাপক হুমায়ুন কবির।

(যদুবংশ), রমাপদ চৌধুরী (এখনই), গৌরকিশোর ঘোষ (তলিয়ে যাবার আগে), সমরেশ বসু (বিবর, প্রজাপতি), বুদ্ধদেব বসু (পাতাল থেকে আলাপ, রাত ভোর বৃষ্টি), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (ঘুণপোকা, পারাবার), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (স্রোতের সঙ্গে), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (অরণ্যের দিনরাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী, জীবন যে রকম), মতি নন্দী (দুঃখের বা সুখের জন্য), বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (নিশীথ ফেরী) প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে অবক্ষয়িত জটিল সমাজের ও মরুরিক্ত জীবনের ধূসরতা।

মনোজ বসুর 'আমি সম্রাট' (অমৃত—শারদীয়, ১৩৭৭) এই শ্রেণীর উপন্যাসের অন্তর্গত হয়েও সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যর্থতাজনিত উপলব্ধির পটে শূন্যজীবন-পরিণামকে তিনি দেখেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টি ও রীতিতে।

ব্যক্তির অন্তর্জগতের পঙ্কিলতা, অস্থিরতা, অস্তিত্বচিন্তা প্রভৃতির সঙ্গে বাইরের নিয়মের যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই ব্যক্তি স্পষ্ট হয়। (যথা : নিশীথ ফেরী—বরেন গঙ্গোপাধ্যায়)। মনোজ বসুর 'আমি সম্রাট' উপকরণ সম্বন্ধে ঐসব উপন্যাসের এক তালিকাভুক্ত হলেও ধর্মের দিক দিয়ে পৃথক।

বাইরের ঘটনা তাঁর চোখে কোন কদর্য পাপের চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয় না। জীবন ও সমাজের জটিলতা অনিশ্চয়তা ব্যর্থতা তাঁর সৃষ্ট নায়ককে আশাহত করেনি, সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করেছে বারংবার।

ঘটনা-নির্বাচনের মধ্যে মনোজ বসু যৌবনের অপরাজেয় পৌরুষের আরতি করেছেন। মুমূর্ষু তারুণ্যের সম্পর্কে মনোজ বসুর ঔৎসুক্য নেই। সচেতনভাবে তিনি সামাজিক ইতরতা ও স্থূলতা পেরিয়ে এক উপভোগ্য রোমান্টিক জীবনরসের পরিবেশন করেছেন। মানুষের অবিচার, বিবেকহীনতা, দুর্নীতিপরায়ণতা তরুণদের কি ভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তাদের পতনের জন্য আত্মহননের জন্য কতখানি দায়ী, এই উপন্যাসে লেখক তা দেখিয়েছেন। পূর্বোক্ত লেখকদের উপন্যাসের অন্তর্বিশ্লেষণ 'আমি সম্রাট'এ নেই। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে অনতিপ্রচ্ছন্ন বিষাদমিশ্রিত কৌতুক ও নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টির পরিচয়। অরুণেন্দুর শুষ্ক জীবনউদ্যান গার্হস্থ্য জীবনধারায় সিক্ত। তাই বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতাবোধ, বিষাদ, অন্তঃসংলাপ (যা এই শ্রেণীর উপন্যাসের সম্পদ) 'আমি সম্রাট' উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত। ক্লাইম্যাক্স ও অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের বিচিত্র সংমিশ্রণে-বোনা কাহিনী ঘটনার গতিবেগকে কখনও সুউচ্চে তুলেছে, কখনও নিম্নাভিমুখী করেছে। এই রচনাকৌশল লেখকের বক্তব্যকে করেছে ব্যঞ্জনাময়। উদ্‌ভ্রান্ত অরুণেন্দুর তারুণ্য কেবলই খুঁজে

বেড়িয়েছে চরিতার্থতার ক্ষেত্র। যাত্রাপথে পদে পদে সে অকুশাহত হয়েছে; তবু থামেনি। বরঞ্চ উদ্দীপ্ত হয়ে আরো কঠোরতর সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়েছে।

গার্হস্থ্য জীবনের কথাকোবিদ মনোজ বসু পারিবারিক জীবনছায়ায় একালের হতাশাগ্রস্ত তারুণ্যের সমস্যাজটিল রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। এর এক কোটিতে আছে বাঙালী-ঘরের স্নেহ-মমতাময় মধুর প্রীতির ছবি। অন্য কোটিতে সংসারের এলাকা বহির্ভূত বাস্তব জীবন ও পরিবেশ। মানুষের লোভ, বিবেকহীনতা, অমানবিকতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বার্থপরতা, বিচারহীনতা, রাজনৈতিক কুচক্র, অর্থনৈতিক দুরভিসন্ধিতে ভারাক্রান্ত সমাজ। এই অনিশ্চয়তা-কম্পিত জীবনের পটভূমিতে লেখক বাংলাদেশের কর্মহীন তরুণদের আবিষ্কার করেছেন।

শূন্যমূল জীবনে বেকারত্বের দুর্বিষহ অভিশাপ মনোজ বসুর শিল্পীমনের দরদ ও সহানুভূতির স্পর্শে ভাস্বর। লেখক অরুণেন্দুর বেকারত্ব ঘোচানোর জন্য চেষ্টার কসুর করেননি। কর্মসংস্থানের জন্য এম. এ. পাশ থেকে আরম্ভ করে জার্নালিজম, মেকানিজম, সর্টহ্যাণ্ড, মোটরড্রাইভারী পর্যন্ত সে শিখেছে। এমন কি খোশামুদির ব্যাপারেও সে সবিশেষ পটু। কিন্তু আত্মরক্ষার সব রকম কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প এবং প্রচেষ্টা আশার প্রদীপকে বারবার উসকে দিয়েছে। কিন্তু তৈলহীন দীপাধার প্রদীপ্ত হলনা তাতে। মাথুস এণ্ড হেণ্ডারসন অফিসের বড়বাবু কাশীনাথ করের মেয়ে পলিকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে ঐ অফিসের গঙ্গাধর মুখুজ্যের খালি জায়গাটি দখল করার পরিকল্পনা শুধু রোমান্টিক নয়, প্রত্যয়দৃপ্ত জীবনসংগ্রামেরও স্বাক্ষর।

অরুণেন্দুর চাকরীর সব ব্যবস্থা যখন পাকা, অকস্মাৎ দুর্দৈবরূপে আবির্ভূত হল সহপাঠি ভূপেন। আশাহত অরুণেন্দুর দুঃসহ মানসিক অবস্থা লেখক ক্লাইম্যাক্স ও অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের ভাবদ্বন্দ্বের দোলায় সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে পরিস্ফুট করেছেন। "একটা চাকরী করে মা-ভাইকে একটু সোয়াস্তি দেবার" চেষ্টা ভূপেনের কারচুপিতে ওলোট-পালোট হয়ে গেলে অরুণেন্দু নিজের সঙ্গে আর খাপ খাওয়াতে পারে না। নিজেকে এবার একেবারে বিচ্ছিন্ন একক বলে ভাবে। পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও বিদ্বেষে সে প্রতিশোধ-চঞ্চল। উমেদারির ঘৃণ্য অবস্থার অবসান বলে কিছু পরিমাণে মুক্তির স্বাদও সে পাচ্ছে।

"উমেদারির শেষ। কারো খোশামোদের ধার ধারিনে। যেটা ইচ্ছে

করতে পারি। মনের ভিতরের কথা মুখে আনতে আটক নেই। ইতরকে মহৎ কালোকে ফর্সা বলতে হয় না। ভাবনাচিন্তা দায়দায়িত্ব ফাঁকা হয়ে গেছে। ইচ্ছে হলে উড়ে বেড়াতে পারি বোধহয়।"

অগ্নিদাহী জ্বালার কিঞ্চিৎ উপশমের জন্য পলির গায়ের কালো রঙ নিয়ে অরুণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। দোকানের খাতা লিখবার জন্যে ডাকতে এলে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয় মানুষটাকে। "ঘাড় হেঁট করে বেড়ানোর গরজ ফুরিয়েছে, কাউকে কেয়ার করিনে এখন।" অরুণেন্দুর আকস্মিক পরিবর্তন জয়ন্ত ও [illegible]দমোহনকেও অবাক করে। কথোপকথনের মধ্যে পাঠক আমরাও পাচ্ছি সুতীব্র নাট্যোৎকণ্ঠা।

আত্মপ্রতিষ্ঠার সবরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে অরুণেন্দুর জীবনে যে শূন্যতাবোধের উদ্ভব, তাই তাকে আত্মহননের পথে অনিবার্য বেগে ঠেলে দিল। শুধুমাত্র ঘটনার এই পরিণতির ছবি আঁকাই লেখকের উদ্দেশ্য নয়— সমস্যার গভীরে তিনি অবতরণ করতে চেয়েছেন। অরুণেন্দুর মানুষী সত্তাকে জীবনবাদী শিল্পী হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তারুণ্যের পরাজয় মৃত্যুর সমতুল্য। এই অর্থে অরুণেন্দুর মৃত্যু আগেই হয়ে গেছে। এর পর যে বাঁচা সে শুধু মানুষের উপর বিদ্বেষ হিংসা ক্রোধ ঘৃণা নিয়ে জোর করে অস্তিত্বের ঘোষণা। তারুণ্যের এই জীবন্মৃত রূপ মনোজ বসু দেখতে চান নি, দেখাতেও চাননি। "সম্রাট হবো আচার্যঠাকুর গুণেপড়ে বলে দিয়েছিলেন, ফলে গেল তাই।" মর্মদাহী ব্যঙ্গের কশাঘাতে লেখক আমাদের নিদ্রিত অন্তর-সত্তাকে চাঙ্গা করে তুললেন।

আশা নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুণেন্দু নিজেই তৈলহীন জীবন-প্রদীপখানি এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়েছে। তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি বা সম্রাট-সত্তা এই নিষ্ঠুর গ্লানিময় পরিবেশে আর কিছুতেই বাঁচতে পারে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অরুণেন্দু আত্মহত্যা করেছে। নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক চক্রান্ত-যন্ত্রের সমিধ হয়েছে যে সমাজব্যবস্থায়, তাকে সে ক্ষমা করে নি। ন্যায়ধর্মের কাছে সে নালিশ করে গেছে "আমার মৃত্যুর জন্য রাজ্যশুদ্ধ দায়ী, কেবল আমি ছাড়া—"

ঘটনার চরম পৌঁছে দিয়ে লেখক কিন্তু আমাদের কোন নতুন বাণী শোনাতে পারেন নি ; পারেন নি নৈরাশ্যজর্জরিত জীবন আশ্বাস-বিশ্বাসে ভরিয়ে তুলতে। শুধুমাত্র সমাজব্যবস্থাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন। পাঠকের মনে এক বিরাট শূন্যতাবোধ ছাড়া আর কিছু তিনি দিতে পেরেছেন

বলে মনে হয় না। দেবার নেইও কিছু। অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের এক শোচনীয় পরিণতি উদঘাটিত করেছেন তিনি।

আলোচনা শেষ করার আগে বলব, মনোজ বসু যুবসমাজের অসন্তোষ ও পতনের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে কাহিনীর যেখানে দাঁড়ি টেনেছেন— অন্যান্য লেখকবৃন্দ সেখান থেকেই শুরু করেছেন তাঁদের কাহিনী। ফলে তাঁর রচনায় আত্মক্ষয়কারী জীবনযন্ত্রণার বীভৎসতার কোন ছবি নেই। ইঙ্গিতে, আত্মহত্যার ঘটনায়, প্রত্যক্ষ হয়েছে তা। এই উপন্যাসে মনোজ বসুর বিশেষত্ব, জীবনের জটিলতাকে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে তিনি বস্তুজগতের স্থূলতা রূঢ়তা ইতরতাকে টেনে এনে আখ্যায়িকাকে বিকৃত জীবনভাবনার অংশীদার করেননি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ছোটগল্প ঃ

মনোজ বসু অজস্র বহুবিচিত্র গল্প লিখেছেন। তাঁর লেখনী আজও অক্লান্ত, অনুভূতি তীক্ষ্ণ, দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্তির জন্য বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সংগ্রামের সময়ে তিনি ঐ বিষয় নিয়েও রসোত্তীর্ণ বহু গল্প লিখেছেন। সামান্য পরিসরে তাঁর ছোটগল্পের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ছোটগল্পের উপরেই বিপুলায়তন গ্রন্থ হতে পারে। এখানে আমরা যথেচ্ছ কয়েকটি গল্প নিয়ে সামান্য পরিচয় দিচ্ছি।

অনেক সাহিত্যিকের মত মনোজ বসুও সর্বপ্রথম গল্প লেখেন। তাঁর প্রথম গল্প "নতুন মানুষ" (পিছনের হাতছানি), 'বিচিত্রা'য় ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর পরের বছর বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় "বাঘ"। "বাঘ" মনোজ বসুর সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই দুই গল্পের মধ্যে লেখকের জীবনদর্শন এবং শিল্পস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আঙ্গিক রচনায় লেখক-মানসের শিল্পরীতির বিশেষ ভঙ্গিটি "বাঘ" গল্পে অতুলনীয় ভাষারূপ লাভ করেছে। "বাঘ" গল্পকে তাই তাঁর সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশের সিংহদ্বার বলে অভিহিত করা যায়।

দেখা যাক, "বাঘ" গল্পের ভিতর ঘটনা-নির্বাচনে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি জীবন-রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবগত প্রবণতা এবং জীবন ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর ধারণা বা সিদ্ধান্ত কতখানি যথার্থ হয়ে উঠেছে।

গ্রামোফোন যন্ত্রের আকস্মিক আগমন উপলক্ষ করে নতুন জীবন-তরঙ্গের সৃষ্টি হল গ্রামে। এই নতুন যন্ত্রটি সম্বন্ধে গ্রামের লোকের অজ্ঞতাকে কাহিনীর উপকরণরূপে নির্বাচন করে লেখক ভ্রান্তি, বিস্ময় ও কৌতূহলের নাটকীয় মুহূর্ত রচনা করেছেন।

গ্রামোফোনের চোঙ-নিঃসৃত মনুষ্যকণ্ঠের বিকট আওয়াজ গ্রামের মানুষদের কাছে অপরিচিত। এর চেয়ে তাদের কাছে বাঘের ডাক অনেক বেশি স্পষ্ট। তাই খুব সহজেই "সাহেববাড়ির কল" দ্বারা বিভ্রান্ত হল তারা। চরম না[ট]্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে লেখক শুধু হাস্যরসই পরিবেশন করলেন না, কালের অমোঘ নির্দেশটি উপসংহারে বক্তব্য আকারে রাখলেন।

ঘটনা উপস্থাপনে নাটকীয়তা সবিশেষ লক্ষণীয়। পাদপ্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গ্রামের মানুষের অজ্ঞতা, কৌতূহল, তাদের যূথবদ্ধ জীবনযাত্রা ও পারস্পরিক সহযোগিতার এক গ্রাম্যরূপ। ফলে, আখ্যায়িকার গ্রাম্যতা নিজস্ব স্বভাবে মণ্ডিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা ও তাদের আচরণের অসংগতি থেকে একধরনের কৌতুকরস উচ্ছ্বসিত হয়, যার ফলে জীবন উপভোগের দিকটাও প্রধান হয়ে পড়ে।

পরিবেশ রচনায় লেখকের মুন্সিয়ানা অপূর্ব। গ্রামোফোনকে কেন্দ্র করে যখন কৌতুক কৌতূহল বিস্ময় ও আগ্রহে সকলে অধীর, তখনও লেখক রহস্য আবরণমুক্ত করেন না:

> "হরসিত চোখ বুজিয়া হুঁকা টানিয়া তামাকের ধোঁয়ায় পৌষ মাসের সকাল বেলার মতো চারদিকে নিবিড় কুয়াশা জমাইয়া তুলিল।"

গ্রামোফোনের রহস্যও অমনি কুয়াশা সৃষ্টি করে গল্পের অবয়বে। তাই দেখি, বাঘের রহস্য উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে কলের গানের মর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় না। কৌতূহল জীইয়ে রেখে গ্রাম্যলোকদের অজ্ঞতার সঙ্গে তাকে যুক্ত করে এক নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। অজ্ঞাত বস্তুটির সম্পর্কে লোকের আবেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে পরিচিত শব্দ ও উপমার ব্যবহার গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষ সম্বন্ধে লেখকের বহুবিস্তৃত জীবন-অভিজ্ঞতার নিদর্শন। গ্রামোফোনকে "সাহেব বাড়ির কল" বা "কোম্পানি বাহাদুরের কল", রেকর্ডকে "কালো পাতলা পাথর', গ্রামোফোনের চোঙকে "ধুতুরাফুলের মত গড়নের একটি চোঙা", সাউণ্ডবক্সকে "চকচকে গোলাকার বস্তু", পিনের বাক্সকে "কাঁটার কৌটা" প্রভৃতি বলায় অপূর্ব রূপে গ্রাম্যতা রক্ষিত হয়েছে। ইংরাজদের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পরিচয়ও এ কাহিনীতে দুর্লক্ষ্য নয়:

"অশ্বিনী পাল অকস্মাৎ উচ্ছ্বাস ভরে বলিয়া উঠিল—কি কল বানায়েছে সাহেব কোম্পানি। দেবতা, দেবতা—বেম্মা-বিষ্টুর চেয়ে ওরা কম কিসে? বাঁড়ুয্যেমশায় আপনার সেতারের টুং টাং আর রামপ্রসাদী-গুলো এবার ছাড়ুন।"

যান্ত্রিকতার ছদ্মবেশে যে নতুন কাল আসছে তাকে রোখা যাবে না, পুরাতনকে হটিয়ে দিয়ে নতুন তার আসন করে নেবে, গ্রামোফোনের ব্যাপারে তারই ব্যঞ্জনা। তিনকড়ির কণ্ঠে যুগপৎ বেদনা ও বিস্ময়ের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয় সেই জীবন-সত্য :

"ও যে কোম্পানীবাহাদুরের কল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? গোটা জেলাটা জুড়ে ওদের রাজ্য। আর আমি ব্রহ্মোত্তরের খাজনা পাই মোট একান্ন টাকা সাত আনা।"

যন্ত্রের প্রতি এখানে লেখক-মনের বিরূপতাই প্রকাশ পেয়েছে। গ্রাম-জীবনের স্বাভাবিকতাকে সে ব্যাহত করে। সামান্য একটা গ্রামোফোন যন্ত্রকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করে লেখক মানুষের জীবনে ও মননে যন্ত্রের দূরপ্রসারী প্রভাবের চিত্র এঁকেছেন। যন্ত্রের চমৎকারিত্ব এবং যন্ত্রীর অতি-মানবিক ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্ময় এবং মুগ্ধতা গল্পের প্রাণ। হরসিতের কলের গানকে কেন্দ্র করে চারিদিক যখন জমজমাট, পল্লীর সমস্ত মনপ্রাণ যখন সম্মোহিত, তখন আকস্মিকভাবে কলের স্প্রিং কেটে গিয়ে আয়োজন পণ্ড হয়ে গেল। স্প্রিং কেটে যাওয়ার মত একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে যান্ত্রিক জীবনের মধ্যে স্বাভাবিকতা নেই—আছে কৃত্রিমতা ও পরবশতা। গ্রামোফোন বিকল হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে "কি করিলি অবোধ বালিকা, সুধাভ্রমে হলাহল করিলি যে পান"—কথাটি শেষবারের মত উচ্চারিত হয়ে থেমে যায়। যন্ত্রের প্রতি বিরূপতাকে লেখক সুন্দরভাবে ইংগিতে বাচ্যার্থ করে তুলেছেন।

মনোজ বসুর ছোটগল্পের প্রধান লক্ষ্য মানুষ। তারা প্রায়শ গ্রামের সহজ সরল সাধারণ মানুষ। এই মানুষ ও পল্লী তাঁর সাহিত্য-রচনার ভিত। গ্রামীণ মানুষের মানবিকরূপ তাঁর ছোটগল্পের সম্পদ।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং স্বভাবশিল্পী বিভূতি-ভূষণের সাদৃশ্য রয়েছে। তিন জনেরই ছোটগল্পের ক্ষেত্র পল্লী। পল্লীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখ বাসনা-বেদনার কাহিনী হয়েছে গল্পের উপাদান। এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনুজ শিল্পীদের

রচনাগত বৈসাদৃশ্য আছে। শিল্পধর্মের দিক দিয়ে বরং মনোজ বসু ও বিভূতি-ভূষণ অভিন্ন।

মানুষ ও পৃথিবীর বিভিন্ন রূপ দেখার আগ্রহ থেকে মনোজ বসুর অনেক ছোট-গল্পের উৎপত্তি। ছোটগল্পগুলি মোটামুটি তিন বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করলে অন্যায় হয় না। এক : স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, মমতা, সহানুভূতি, কৌতুক এবং মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত মানব বিষয়ক গল্পগুলি। দুই : প্রকৃতি-জগতের রূপ ও রহস্যের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্পর্ক এবং তার অভিন্নতা ইত্যাদি যেসব গল্পের প্রধান অবলম্বন। তিন : অতি-প্রাকৃত জগৎ সম্পর্কিত বিস্ময়, কৌতূহল, আতঙ্ক অবলম্বন করে যে অতি-লৌকিক বা ভৌতিক গল্পগুলির সৃষ্টি।

মনোজ বসুর শান্ত ও সহজ দৃষ্টিভঙ্গি অতীত স্মৃতি-রোমন্থনের মধ্যেও সার্থক ছোটগল্পের আঙ্গিক খুঁজে পেয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে লেখকের কল্পনায় অতীতাসক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। অতীত ভূস্বামীদের স্মৃতি তাঁর রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। তাঁদের জীবনবৈভব এবং শৌর্যবীর্য সম্পর্কে সাধারণের ধারণা রূপকথাসুলভ বর্ণাঢ্য। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় গল্পগুলির বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটেনি, পরিবেশসৃষ্টি এবং নাটকীয় মুহূর্ত রচনার জন্যই লেখক অতীতমুখী হয়েছেন। "বনমর্মর" এইরূপ একটি গল্প।

'বনমর্মর' রোমান্টিকতা, প্রকৃতিমুগ্ধতা, অতীতাসক্তি, প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রেম, সামন্ততান্ত্রিক জীবন ও ঐতিহাসিক চেতনা, গ্রামীণ জীবন, লৌকিক বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত রহস্য প্রভৃতির টানাপোড়েনে বোনা এক অপূর্ব সুন্দর কাহিনী। মনোজ বসুর জীবনবোধের আশ্চর্য প্রতিফলনে গল্পটি সমগ্রতা লাভ করেছে। রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ঘটনা সংস্থাপন-কৌশল, নাটকীয় গতিবেগ, এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে অতিলৌকিক বিশ্বাসের যোগাযোগ। লেখকের এই মানসিক প্রবণতাগুলি কোন বিচ্ছিন্ন শিল্পধর্ম নয়। কাহিনীতে তারা অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর সংযুক্ত।

সাতমাস আগে শঙ্কর স্ত্রী সুধারাণীকে হারিয়েছিল। চুরুটের কৌটোয় সুধারাণীর-রাখা শুকনো বেলপাতা তাদের প্রণয়মধুর দাম্পত্যজীবনের এক সুখস্মৃতি বহন করে। মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। তাই শঙ্করের দাম্পত্যজীবনের মধুর আস্বাদনের মধ্যে একধরনের অসীমতার আভাস সূচিত হয়েছে।

মনোজ বসুর কবি-কল্পনায় প্রেম মৃত্যুহীন। মৃত্যুর পরেও লোকে

অতিলৌকিক জগতে জীবৎকালের প্রেমের রসাস্বাদন করে। রাজারামের গড়ে জমিজরিপের কাজে এসে শঙ্কর চারশো বছর আগের জানকীরাম ও মালতীমালার দাম্পত্য প্রেমের কিংবদন্তীকে আবিষ্কার করল। "বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয়ত প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপি টিপি এই পথ বাহিয়া এই সোপান বাহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন।" তারই এক সুন্দর রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান 'বনমর্মর'। বনের মর্মরে নির্জনতায় তাঁদের প্রেমের নিত্য বাসরসজ্জা। গহন বনদেশে শঙ্করও অনুভব করে, স্ত্রী সুধারাণী হয়ত তারই অপেক্ষায় রয়েছে। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি শঙ্করকে অশরীরী আত্মার সঙ্গে মিলন-কামনায় আকুল করে তোলে।

মনোজ বসু জীবন-উপভোগের কবি। শঙ্করের অতৃপ্ত জীবন-উপভোগ এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় সমস্যা। সুতীব্র জীবনপিপাসা তাকে মিলনপ্রত্যাশায় পতঙ্গবৎ আকর্ষণ করে। এই তৃষিত প্রেম হৃদয়কে শুধু দহন করে, ক্ষয় করে, তৃপ্ত আনে না। এই প্রেম, মনোজ বসুর মতে, অভিশপ্ত। "ক্ষুধিত পাষাণ"এর সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য হয়তো আছে, কিন্তু জীবনাদর্শগত পার্থক্যও প্রচুর। প্রকৃতি ও মানুষ মিলে 'বনমর্মরে' যে অতিলৌকিক পরিমণ্ডল রচনা করে, কখনো তা ভীতির উদ্রেক করে না। মানুষের সঙ্গে তার একটা সহাবস্থানের ভাব আছে।

'রায়রায়ানের দেউল' গল্পে দিগন্তবিসারী পাকসীর বিলের ভগ্ন দেউল আশ্রয় করে জনসমাজে যে গল্পকথা প্রচলিত আছে তাই উদ্ধার করতে গিয়ে লেখক এক সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপট এঁকেছেন। রায়রায়ান রামেশ্বরের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং খ্যাতি প্রতিপত্তির উদ্দীপনাময় কাহিনী গল্পের মুখ্যবস্তু নয়, নীড়াশ্রয়ী বাঙালী মনের নীড়রচনার স্বপ্নসাধ ব্যর্থপ্রেমের মধ্যে সমাধি লাভ করল, কাহিনীর রসবিস্তার সেইখানে।

দারিদ্র্যকে জয় করার বিপুল প্রয়াস রামেশ্বরকে জীবনসংগ্রামে অজেয় বীর করে তুলেছিল। কিন্তু অন্তর ছিল তার শূন্য। ভরত রায়ের কন্যা মঞ্জরীর সামনে রামেশ্বর শূন্যতা গভীরভাবে উপলব্ধি করল। হৃদয়ের একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য সে কাঙাল। হৃদয়লাভের কৌশল জানে না রামেশ্বর, সে শুধু জোর করতেই জানে। মঞ্জরীকে তার শক্তি দেখিয়ে বশ করতে চেয়েছিল, মেয়েটার ভয়শূন্য হাসি রামেশ্বরকে বিস্মিত করল।

মানুষের নীড়-রচনার সাধ জীবনসায়াহ্নেও শেষ হয় না। যৌবনের

প্রবল উদ্যম ক্ষয় হয়ে যায়, বার্ধক্যের ক্লান্তি ধীরে ধীরে দেহে মনে ব্যাপ্ত হয়, ঘরের প্রতি লোভ প্রবলতর হয় তখন। কিন্তু বয়সের অভিশাপ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে দেয় না। মঞ্জরী-প্রেরিত আয়নায় রামেশ্বর বিশবছর বাদে প্রথম নিজেকে দেখল। জীবন-সাফল্যের প্রতি ধিক্কার জন্মাল তার। নিঃসঙ্কোচে মঞ্জরীকে বলে, "সত্যিই বুড়ো হয়েছি, দেহে বল নেই। এখন এসব ছেড়ে গরিবের ছেলে হয়ে আবার খোড়োঘরে যেতে ইচ্ছে হয়।" ছোট্ট একটি নীড়ের প্রতি তার হৃদয়-আকুতি লেখক জীবন্ত অক্ষরে রূপায়ণ করেছেন। রায়রায়ান রামেশ্বর রণক্লান্ত। মঞ্জরী যে রামেশ্বরের বৈমাত্রেয় ভাই মধুকরকে ভালবাসে, বৃদ্ধের দৃষ্টি ততদূর গিয়ে পৌঁছয় না। মঞ্জরীর অনুকম্পাকে প্রেম ভেবে রামেশ্বর নিজেই জীবন-ট্রাজেডির বীজ বপন করে। মঞ্জরীকে কেন্দ্র করে এক গৃহমন্দির প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করল। মিলনের ব্যর্থলগ্নে রায়রায়ান জানতে পারল, মঞ্জরী মধুকরের বাগদত্তা। বার্ধক্যের পরাভবের গ্লানি রামেশ্বরকে উদভ্রান্ত করে। মঞ্জরীকে না পাওয়ার বেদনা মন্দির ধ্বংসে উদ্বুদ্ধ করল তাকে। এবার আক্রোশ নিজের উপরেই। হৃদয়জ্বালা জুড়ানোর জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীক রায়রায়ানের দেউলকে নিজের হাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে অবশেষে সে দীঘির জলে ঝাঁপ দিল।

শক্তির দম্ভ, বিত্তের অহঙ্কার কখনও কখনও জীবন-ট্রাজেডির সূচনা করে। 'নরবাঁধ' গল্পে (বিচিত্রা-৫ম বর্ষ, ১৩৩৮) লেখক ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে মানবতাবোধের সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছেন। বল্লভরায়ের বৃদ্ধ মাতার গঙ্গাস্নানে একটি খরস্রোত খাল বাধা হয়ে দাঁড়ালে বল্লভরায়ের অহঙ্কারে আঘাত লাগে। তিনমাসের মধ্যে ঐ খাল বাঁধার সংকল্প ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হলে সে দৈবশক্তিতে আস্থাবান হয়ে ওঠে। অবশিষ্ট তিনটি দিন তার মানসিক চরম সংকটকাল—এই দিয়ে নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করেছেন লেখক।

দেবীর স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী বল্লভরায় শপথ-রক্ষার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের অগোচরে তার শিশুপুত্র কুড়োনকে হত্যা করে খালের জলে ভাসিয়ে দেয়। সংস্কারান্ধতার পরিণাম মানুষের জীবনকে করে অভিশপ্ত। দেবীর ইচ্ছা পূরণ করেও শাক্ত ভক্ত বল্লভরায়ের অন্তরাত্মা অনুতাপবিদ্ধ হয়। অবশেষে, তীব্র মানসিক তাড়না থেকে উদ্ভূত এক অতিপ্রাকৃত পরিবেশে বল্লভরায়ের সলিলসমাধি ঘটে। এইখানেই গল্প শেষ হওয়ার অবকাশ ছিল। কিন্তু লেখক অন্য একটি স্বতন্ত্র কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন। মূল ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হলেও তার একটা সংযোগ আছে। ধর্মের নামে মানুষের বিবেকবর্জিত আচরণ

লেখকের দরদীপ্রাণে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ যে কতবড় মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, নতুন করে গল্পের পত্তন করে তিনি তা দেখিয়েছেন। ট্রার্ণার ব্রিজ দুর্বার খালের উপরে আধুনিক বিজ্ঞানের বিজয়নিশান। অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দৈব মাহাত্ম্যের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিস্পর্ধী মানুষী শক্তির বিজ্ঞানসম্মত কর্মকৌশলের সাফল্যই এর মধ্যে দেখানো হয়েছে।

জীবনের পরিধিতে ক্ষুদ্র বস্তুগুলি নগণ্য নয়, সুগভীর জীবনাবেদনা সৃষ্টিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন লেখক। এই জাতীয় গল্পে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা কিংবা চরিত্র ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অতিসাধারণ ঘটনাও গল্প হয়ে জীবনরস সৃষ্টি করতে পারে, লেখক তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়েছেন। 'উপহার', 'বাতাবী লেবু', 'শাস্তি' প্রভৃতি এই পর্যায়ের গল্প।

স্বল্প পরিসরে সামান্য উপাদানে 'উপহার' যথার্থ ছোটগল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্দিরা চা-বাগানের ম্যানেজারের মেয়ে। কালীতারা তাদের ঝি। সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী তাদের উপহার হয়েছে ভিন্ন। কালীতারা ঝি হলেও গুণী, কবিতা লেখার অভ্যাস আছে তার। বিদায়ের সময় লেখক সাধারণভাবে টাকা দিয়ে তাকে বকশিস করলেন, সে তাতে বেদনাবোধ করে। ইন্দিরার বেলায় ভুল সংশোধন করতে গিয়ে প্রমাদ ঘটল। মানী-লোকের কন্যার মর্যাদা রাখার জন্য সভায়-পাওয়া ফুলের মালা উপহার দিলেন তাকে। কিন্তু ইন্দিরা জঞ্জাল ভেবে ফেলে দিল নর্দমায়। দুটি পরস্পর বিরোধী নারীর দ্বিমুখী ভাবাবেগকে বিপরীত কোটিতে স্থাপন করে উপহার সম্পর্কে আমাদের চিরন্তন ধারণাকে একটি সূক্ষ্ম আঘাতে ভেঙে দিয়ে লেখক পরিচ্ছন্ন জীবনবোধের সৃষ্টি করেছেন। রুচি ও বিচারের তারতম্যে একই উপহার, একজনের কাছে আদরের, অন্যের কাছে অবহেলার। এইরূপ অজ্ঞতা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অসংখ্য ট্রাজেডির সূচনা করে।

'বাতাবীলেবু' গল্পে জীবনের ট্রাজেডির অভিনব এক করুণ মূর্তি। জমিদারের খামখেয়ালিতে হতভাগ্য কর্মচারিদের যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ঘটে, এই গল্পে তার চিত্র আছে। ফরমাস হল অসময়ের বাতাবীলেবু এনে দিতে হবে—সেই দিনের মধ্যেই। বৃদ্ধ অসুস্থ মালি হেমন্তের উপর শেষ পর্যন্ত সংগ্রহের ভার পড়ল। সাতরাজ্য ঢুঁড়ে হেমন্ত বাতাবীলেবু হাজির করে দিল—সেটি কিন্তু জমিদারের অনুগৃহীতা হেমন্তরই মেয়ে গোলাপমণি জমিদারকে দিয়ে অসুস্থ বাপের জন্য আনিয়েছে। গল্পের চূড়ান্ত ক্ষণে অপ্রত্যাশিত চমক সৃষ্টি করে লেখক এই রহস্যোদ্ধার করলেন। হেমন্তের মৃত্যুজনিত বেদনায়

আমাদের মনপ্রাণ তখন অত্যন্ত অভিভূত হয়। অসহায় মানুষের নিরুপায় আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে নিয়তি-ভাবনা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কয়েকটা তুলির টানে মানবিক অনুভূতির যে রেখা অঙ্কিত হয়েছে, স্কেচধর্মী হলেও শিল্পের বিচারে তার মূল্য অপরিমেয়।

জীবন ও সমাজের বিচার-বিশ্লেষণ এক ধরনের গল্পে প্রধান হয়ে উঠেছে। মানুষের দুর্গতি গ্লানি এবং মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়েছে প্রত্যয়দৃপ্ত জীবনের বাণী। মর্মান্তিক চরমবাণী ঘোষিত হয়েছে 'পৃথিবী কাদের" গল্পে। কৃষক জমি চাষ করে, জমি তাদের প্রাণ, অথচ ফসলের উপস্বত্বে অধিকার তাদের নেই। এই সব বঞ্চিতের জীবনকাব্য 'পৃথিবী কাদের ?'

মানুষ কি ভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তার ছবি ফুটেছে বিষয়বস্তুতে। কিন্তু অসহায় সর্বহারা শ্রেণীহীন মানুষের বিদ্রোহ অথবা ক্ষোভ-দুঃখ দূর করার মন্ত্র কাহিনীর মধ্যে নেই। দুঃখের কাছে অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং ভগবানের কাছে নালিশ করা ছাড়া এইসব নিষ্পেষিত মানুষের আর কোন পথ নেই। আত্মসমর্পণের মধ্যে অসহায় জীবনের করুণ রূপ ফুটে উঠেছে। এই গল্পে লেখক চেয়েছেন মানুষের বিবেককে সহানুভূতির আলোয় প্রোজ্জ্বল করে তুলতে।

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় মানুষ যখন পারিবারিক ও সামাজিক আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে বিরাট জনারণ্যে মিশে যাচ্ছে, তার সামাজিক সত্তার বিলোপ ঘটছে, তখন লেখক অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের মধ্যেই খুঁজে পেলেন জীবনের বাণী। গ্রাম-বাংলার জলহাওয়া-মাটি নিষিক্ত হয়েই তাঁর এমনি সব গল্প-উপন্যাসের সৃষ্টি। গাছপালা, পশুপাখি, বিল-মাটি ও মানুষ সবাই যেন অংশ গ্রহণ করে তাঁর এই সৃষ্টিগুলির মধ্যে। 'পৃথিবী কাদের' এমনি একটি গল্প। এই গল্পে প্রকৃতি-পরিবৃত মানুষের আত্মরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকের মত চাষের জমিই নটবরের প্রাণ। মাটিকে ভালবাসে সে আপন মায়ের মত। নটবর যথার্থই মাটির শিশু।

পল্লীমানুষের সুখদুঃখে প্রকৃতির একটা মুখ্যস্থান আছে, লেখক এ গল্পে তারও বাণীরূপ দিয়েছেন। প্রকৃতির বরাভয়দাত্রী কল্যাণীরূপ যেমন কৃষকজীবনের আশীর্বাদ স্বরূপ, তেমনি প্রকৃতির বিরূপতায় তাদের চরম দুঃসময়

আসে। তিন তিন বছর বাঁধ ভেঙে ফসল নষ্ট হওয়ার দরুন নটবর খাজনা দিতে পারে নি। সেই অপরাধে জমি নিলাম হয়ে গেছে। জমির অধিকার হারিয়েও নটবর পারেনি মাটির মমতা ত্যাগ করতে। চোরের মত রাতের অন্ধকারে এসে জমির পরিচর্যা করে সে। নটবরের ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য দায়ী প্রকৃতির আক্রোশ। জমিদারের সমবেদনাহীন মনোভাব শক্তিমান প্রকৃতির মতই ক্রুর ও বিচারহীন। প্রকৃতি ও মানুষের শত্রুতায় নটবরের জীবন অসহায় ও বিপর্যস্ত। শক্তিমান প্রকৃতিকে মানবায়িত করার ফলে মানুষের প্রকৃতিনির্ভরতা ও প্রকৃতিস্বভাব প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব হয়েছে। হতভাগ্য চাষী তার বঞ্চিত জীবনের বেদনা ও হতাশা নিয়ে বিধাতার কাছে প্রশ্ন করে : "এই পৃথিবী কাদের ?"

'কুম্ভকর্ণ' গল্পে লেখক পল্লীমানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কটি রূপায়িত করেছেন। শম্ভু প্রকৃতির প্রতীক। প্রকৃতির মত নির্বিকার সে। কুম্ভকর্ণ অর্থে জড়প্রকৃতির নিদ্রিতরূপ—প্রকৃতি উদাসীন বলে মানুষের বৃহৎ কর্মকাণ্ডের শরিক নয় সে। লেখক ভদ্রতর ঘরের ছেলে শম্ভু এবং তার ঘুমকাতুরে স্বভাব একত্রিত করে প্রকৃতির জড়ত্বকে মানুষী সত্তায় উপস্থাপিত করেছেন।

সামাজিক ভোজসভায় চরম লাঞ্ছিত হয়েও শম্ভুর চৈতন্যের উন্মেষ হয়নি। সেজন্য তার মনে কোন গ্লানি বা ক্ষোভ নেই। নির্বিকার ভাবে ঘুম দেয় সে। মানুষের পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের মধ্যে প্রকৃতির কোন ভূমিকা নেই, প্রকৃতি নির্লিপ্ত ও নির্বিকার। শম্ভু-চরিত্রে প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে তার স্বাস্থ্য অটুট। নির্বোধ সারল্য তার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাই দেখি, যে বিষ্ণু চক্রবর্তী তাকে পঙক্তি থেকে তুলে দিয়েছিল, তার কথায় সাঁড়াতলায় গরু-কোরবানি বন্ধ করতে সর্বাগ্রে ছোটে সে-ই। আসলে এটা যে বিষ্ণু চক্রবর্তী ও সামাদ মিঞার ব্যক্তিগত রেষারেষির পরিণাম, নির্বোধ তা বুঝতে পারে না।

পাড়াগাঁর শান্ত জীবনযাত্রায় গতি নেই—ঘুমিয়ে থাকার মতই সর্বত্র একটা নিস্তব্ধতা। বহুআকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সংবাদ গ্রামের মানুষের মধ্যে কোন সাড়া জাগায় না। রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে প্রকৃতিজগতের যোগাযোগ নেই বলে প্রকৃতিবেষ্টিত পল্লীমানুষের কাছেও তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। দেশবিভাগের পটভূমিতে বিষ্ণু চক্রবর্তী ও সামাদ মিঞার কলহের মীমাংসা সহজ হয়ে যায়। জীবনের সহজ সরল রূপের উপাসক

মনোজ বসু ইচ্ছা করলে এখানেই গল্প শেষ করতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃতিবৃত্তে গল্পের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য তিনি গল্পের সম্প্রসারণ করেছেন। স্বাধীনতা-উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য সভা হল। গ্রামের লোকের লক্ষণীয় অনুপস্থিতির ভিতর দিয়ে লেখক পল্লীর মানুষদের আসক্তিহীন জীবনযাত্রা ও নির্লিপ্ত মনোভাবকে ব্যক্ত করেছেন। শম্ভুর নিশ্চিন্ত নিদ্রা-উপভোগে সেই সত্য স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়েছে।

প্রকৃতি-প্রীতির পাশাপাশি লেখকের পল্লীপ্রীতিও স্থান পেয়েছে এই গল্পে। কোন একটা নির্দিষ্ট খাত বেয়ে চলে না পল্লীর জীবন। পাহাড়ী পথের মত চড়াই-উতরাই ভেঙে তার যাওয়া। লেখক সেই আশ্চর্য জীবনছন্দকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের মধ্যে। গ্রামের মানুষ স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ। পরস্পর তারা ঝগড়াবিবাদ করে, আবার মিটমাটও করে। 'কুম্ভকর্ণ' গল্পে পল্লীর জীবনপ্রবাহের এই তির্যকরূপ লক্ষ্য করা যায়। দাঙ্গাহাঙ্গামার দিন যে সামাদ মিঞা শম্ভুর মাথায় লাঠি মারল, সে-ই আবার ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী দেবার জন্য অনুরোধ করল তাকে। বিষ্ণু চক্রবর্তী ও সামাদ এক উঠানে দাঁড়িয়ে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতির কথাও বলে। পাভার্গার এই অদ্ভুত জীবনযাত্রা ছোট্ট পরিসরের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। উপরোক্ত দুটি গল্পে গ্রামজীবনের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক রূপ এবং জীর্ণ সামাজিক বন্ধনকে গল্পের উপাদানরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

লেখকের জীবনচৈতন্যের বৃহত্তর দর্পণে ধরা পড়েছে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক চেহারা। দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুসারে ভারতবর্ষের দ্বিখণ্ডীকরণ—হিন্দু ও মুসলমানের বিচ্ছেদ লেখক আদৌ মেনে নিতে পারেন নি। 'হিন্দু মুসলমান' ও 'সীমান্ত' এই দুই প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমরা এটা উপলব্ধি করব।

'হিন্দু মুসলমান'এর ঘটনাকাল ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্বে। 'সীমান্ত' গল্প তার কিছু পরবর্তী সময়ের। দুই গল্পেই লেখকের মানবপ্রীতি এবং মানুষের ভিতরের শাশ্বত সত্যউদ্ঘাটনের প্রয়াস জাজ্বল্যমান।

দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যার উদ্ভব হল। সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের জীবনে এজাতীয় সমস্যা আগে আসেনি। পাশাপাশি বাস করে তাদের মেলামেশা ছিল আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ। সেই আন্তরিকতা রাতারাতি

বিদ্বেষে পরিণত হল। 'হিন্দু মুসলমান' ও 'সীমান্ত' গল্পে লেখকের প্রশ্ন : আসল সত্য কোনটি—ধর্মীয় রাজনীতি, না মানুষ? লেখকের উদার মানবপ্রীতি সঙ্কীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ নিয়ে যে রাজনীতি করা হয়েছে, লেখক সেজন্য আন্তরিক বেদনাবোধ করেন।

'হিন্দু মুসলমান' গল্পের পটভূমি খুলনা জেলা। খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্তি পাকিস্তানে না ভারতে—এই নিয়ে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। লেখক তাকে গল্পের বিষয়বস্তু করে হিন্দু ও মুসলমানের জীবনের অনিশ্চয়তার এক ছবি এঁকেছেন। কিন্তু গল্পের আবেদন অন্যত্র। বয়স্কদের ভেদবুদ্ধিতে চারদিক যখন সন্দেহে অবিশ্বাসে আবিল হয়ে উঠেছে, তখন পূর্ণ সমাদ্দারের ছেলে নন্তু ও খোরশেদ খাঁর মেয়ে হাসিনার কাছে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আতঙ্ককর। এই নিয়ে তাদের মনে অসংখ্য প্রশ্ন ও কৌতূহল।

> "হাসিনা—আচ্ছা, হিন্দু কেমন রে নন্তু—তুই দেখেছিস? নন্তু বলে, কী বোকা রে। দেখলেই তো মেরে ফেলবে। হাসিনা—মোছলমান? মানে, বেটাছেলে নানান জায়গায় যাস কিনা তুই। নন্তু বলে, সে-ও তো এক হল। কিচ্ছু দেখিনি। বাবা রে, না দেখতে হয় যেন কখনো।"

দুটি গ্রাম্য বালক-বালিকার অবোধ কৌতূহল ও সরল অজ্ঞতাকে লেখক জীবন-সমালোচনার বিষয়ীভূত করে মানবিক অনৈক্যের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করেছেন।

'সীমান্ত' গল্পেও অনুরূপ মানবিক আবেদনের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক প্রীতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা-স্রোতে প্রবহমান কাহিনীতে। ১৯৪৮এর দাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার আস্থা ও বিশ্বাস, বিশেষত দেশবিভাগের মুহূর্তে, একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত একমাত্র সন্তানের শোক ইসমাইলের মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়েছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান পার্থক্য মুছে দিয়ে লেখক মানুষের সম্বন্ধটাই প্রধান করে তুলেছেন। সহায়সম্বলহীন দুশমন যদু রায়ের বিধবা মেয়ে শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসমাইলের আশ্রয় নেয় তাদের মধ্যেকার পুরাতন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কের জোরে। কিন্তু বিক্ষতচিত্ত ইসমাইল কারণে অকারণে অনাথ মেয়েটির প্রতি রূঢ় আচরণ করে। "বাপ চিরকাল আমাদের মাথায় পা দিয়ে বেড়িয়েছে, মেয়েরও সেই মেজাজ। কিন্তু পাকিস্তান এর নাম —তোদের জারিজুরি এ-জায়গায় নয়।" কিন্তু জীবনসমস্যার পরিবেশন গল্পের উদ্দেশ্য নয়, মানবিক আবেদন সৃষ্টি করাই মূল লক্ষ্য। তাই দেখি, মঞ্জুলার

ধর্মনাশের ষড়যন্ত্র যখন দানা বেঁধে উঠেছে, তখন কামরন চুপিচুপি মঞ্জুলাকে পাঠিয়ে দেয় সীমান্তস্টেশনে। ইসমাইল সে খবর পেয়ে বহুকালের সঞ্চিত মোহরভরা হাঁড়ি নিয়ে ছুটল। নিহত ছেলে রমজানের নামে দীঘি কাটবে বলে সে এই মোহর জমিয়েছিল। দুশমনের মেয়েব পাথেয় হিসাবেই মোহর খরচ করতে একটুও বাধল না ইসমাইলের মনে। বাইরের রুক্ষ কর্কশ আচরণের অন্তরালে ইসমাইলের স্নেহপ্রীতিপূর্ণ উদার হৃদয়ের যে পরিচয় চাপা ছিল, তাকে আবরণমুক্ত করা হয়েছে। এই আদর্শবাদ সৃষ্টিব জন্য ছোটগল্পের সংহতি ও শিল্পমূল্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

গভীরতম জীবন সংসক্তি মনোজ বসুর শিল্প-সৃষ্টির অনুপ্রেরণা। নীড়াশ্রয়ী বাঙালীর দাম্পত্য প্রেমের রোমান্স বচনায় তাঁর দক্ষতা যেমন আছে, মনোবিকলনের জটিলতার মধ্য দিয়ে তেমনি জীবন-রহস্যের অনুসন্ধানেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। 'স্বপ্নের খোকা' মানসব্যাধির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

প্রথম ও একমাত্র শিশুপুত্রকে হারিয়ে আশালতার মানসিক ভারসাম্য বিচলিত হয়েছে। স্বপ্নেব মধ্যে সে শুনতে পায় শিশুর ক্রন্দন, দেখতে পায় তাব খেলাধূলা হাঁটা-চলা, দেহের শিরায় উপশিরায় অনুভব করে খোকাব অশরীরী স্পর্শ। আশার মানসজীবনে এই প্রতিক্রিয়া একদিন আশ্চর্যভাবে প্রশান্তি লাভ করল। ট্রেনেব কামরায় সহযাত্রিণী ছোট্ট ছেলেকে ভুল করে আশালতার কোলে শুইয়ে দেয়। ঘুমের ঘোরে আশালতাও তাকে নিবিড় বাহুবেষ্টনে টেনে নিয়ে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। স্বপ্নে খোকার উৎপাত হল না সেদিন। বাৎসল্য-ক্ষুধাই যে আশার মানসিক বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ, এইভাবে তা ব্যঞ্জিত করা হল। আশালতার মনোব্যাধি শ্রীশের জীবনের ট্রাজেডি বটে, তবু ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী আশালতা ও শ্রীশের দাম্পত্য প্রেমের রহস্যমধুর রূপটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

মনোজ বসুর গল্পবিন্যাসে কোন কোন সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে অনিবার্য অমোঘতার সৃষ্টি হয়। 'উলু' লেখকের এমনি একটা গল্প। আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা-জিজ্ঞাসায় পাঠকমন এখানে উদগ্র হয়ে ওঠে।

শুরুতে পারিবারিক জীবনের স্নেহভালবাসার স্নিগ্ধ মধুর কাহিনী। লেখকের স্বভাবগত রোমান্টিক ভাবলোক রহস্যসুন্দর রূপ নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নবনীর কনে দেখতে আসার ঘটনা নিয়ে লেখক কৌতুকরসোচ্ছল

বাঙালী ঘরের ছবি এঁকেছেন। স্বপ্নের নীড় রচনার জন্য মানুষ যখন উন্মুখ, তখন সাধ ও স্বপ্ন ভাঙার জন্য কখনো কখনো আসে দুর্ভাগ্যের অভিশাপ। 'উলু' গল্পে নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত অভিশাপ অতিশয় নির্মম। বিয়ের কনে সেজে গৌরী মিলনলগ্নের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত, কিন্তু বর এসে পৌঁছচ্ছে না। এই সময়ে চরম নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সের সৃষ্টি হল :—অকস্মাৎ বরের নৌকাডুবির খবর এলো। ঝড়ঝাপটায় এ নৌকাডুবি হয়নি। ভগ্নদূত "ঘটক বলিল, ভরতের দেউলের ঐখানটায় এসে বাবুরা সব একদিকে ঝুঁকে পড়লেন। কোটাল্লের গাঙ, টানের মুখ—

ঘটক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।" নিয়তির অঙ্গুলি-সংকেতেই যেন দুর্ঘটনা ঘটল। অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মা, দাদু এবং গৌরী স্তব্ধ—উদ্‌ভ্রান্ত। সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসনের নাগপাশে বন্দী মানুষগুলি—এই অবস্থা লেখক দু-একটি ইংগিতে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। সেই রাত্রেই গৌরীর বিয়ে হল পাষণ্ড দোজবরে নিশিকান্ত মল্লিকের সঙ্গে। আশা ও স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় গৌরী নিশ্চল—আহত আত্মার আক্রোশেরই কাঠিন্য-মূর্তি সে। আনন্দহীন বিয়ের আসরে হঠাৎ বিস্ফোরণ হল : উলু—উলু—উলু! চরম পরাজয়বোধের অন্তর্জ্বালা হৃদয় বিমথিত করে আর্তনাদে ফেটে পড়ল—তা যেমন মর্মান্তিক, তেমনি মনস্তত্ত্বসম্মত। এই মানসিক ব্যাধি জীবন জিজ্ঞাসার পরিণাম।

মনোজ বসুর শিল্পীমানসে জীবনসত্যের যে রহস্যসুন্দর রূপটি ফুটে ওঠে, তা স্নিগ্ধ মধুর কৌতুকরসোচ্ছল। জীবনের রোমান্স, মাধুর্য বিরহ-মিলন, বিস্ময়-বেদনা, স্মৃতি-স্বপ্নের মধ্য দিয়ে লেখকের মনোভাবের প্রকাশ। 'একদা নিশীথ-কালে' 'অভিভাবক' 'রাত্রির রোমান্স' প্রভৃতি গল্প লেখকের শিল্পীমানসের বিস্ময়কর উদাহরণ। এর মধ্যে কোন কোন গল্পে লেখকের কৌতুকপ্রিয়তা ও ব্যঙ্গ যুক্ত হয়ে এক অপূর্ব জীবনরস সৃষ্টি করেছে।

ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে মনোজ বসু সিদ্ধশিল্পী। অপ্রত্যাশিত সিচুয়েশন সৃষ্টি করে তার মধ্যে রঙ্গরসের প্রবাহ উদ্বেলিত করতে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কিছু মিল থাকতে পারে। যুগের যন্ত্রণা কিংবা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত তাঁর হাস্য-রসাশ্রিত গল্পের মধ্যে প্রায়শ অনুপস্থিত। গল্প বলার একটা সহজাত ক্ষমতা থেকেই কাহিনীর মধ্যে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে।

মনোজ বসুর 'একদা নিশীথকালে' এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

'নিষিদ্ধ ফল' গল্পদ্বয়ের ঘটনা-সংস্থাপন এবং সমস্যা প্রায় একই রকমের। জীবনের স্বাভাবিকতাকে উদ্ভট বাধানিষেধের দ্বারা অবরুদ্ধ করার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা রোমান্টিক এবং হাস্যরসের উপাদান। পিতার কড়া পাহারায় নীলাদ্রিকে আইন পরীক্ষার জন্য পিনালকোড মুখস্থ করতে হয়। রাত বারোটার আগে নববধূর ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই। একদিন সে নিয়মভঙ্গ করে চোরের মত অসময়ে ঘরে ঢুকেছে। তখন অপ্রত্যাশিত সমস্যার উদ্ভব হল—নববধূর চীৎকারে পাশের ঘর থেকে শ্বশুর ঘটনাক্রমে ছুটে এলেন। লেপের ভেতর নীলাদ্রি ততক্ষণ পাশবালিশ হয়ে আত্মগোপন করেছে। শাশুড়ীর আবির্ভাব অবশেষে নীলাদ্রির রহস্যময় আত্মগোপন ফাঁস করে দেয়। এর মধ্যে রোমান্টিক কল্পনার চমৎকারিত্ব এবং কৌতুকের সমাবেশ গল্পটিকে অতুল রসসমৃদ্ধ করেছে।

'অভিভাবক' গল্পটি রচনার মুনশিয়ানা এবং বৈদগ্ধ্যের দীপ্তিতে মনোরম। অপরিচিত যুবক অবিনাশ এবং ট্রেনের সহযাত্রিণী কলেজের ছাত্রী প্রীতি-লতাকে নিয়ে রোমান্টিক গল্প জমে উঠেছে। পূজোর প্রচণ্ড ভীড়ে লোকে যখন টিকিট সংগ্রহ ও কামরার মধ্যে জায়গা পাওয়ার জন্যে গলদঘর্ম, অবিনাশ তখন সহযাত্রিণীকে সামনে রেখে লোকের অনুকম্পায় বিনা ক্লেশে টিকিট কাটা, গাড়ীতে ওঠা, বসার আসন এমন কি শোওয়ার স্থান-সংগ্রহ, জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা যে ভাবে করল, তা অত্যন্ত কৌতুকাবহ ও রোমান্টিক। কাহিনীর শেষে এপিগ্রামের শরাঘাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে রহস্যের ঘন যবনিকা উঠে যায়। যে মেয়েটির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কাটল, নবদম্পতির অভিনয় হল, গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত তার দিকে অবিনাশ আর ফিরেও তাকায় না, তার সুবিধা অসুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। এখন সে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। অবিনাশের এই চূড়ান্ত স্বার্থপরতা anticlimaxএর বিচিত্র রসে ভরে উঠেছে। একে একটুও অস্বাভাবিক মনে হয় না। অপ্রত্যাশিত অথচ স্বাভাবিক, এবং কৌতুকের সূত্রে নিবদ্ধ সংযত পরিমিতি-বোধই কাহিনীকে শিল্পগুণে মণ্ডিত করেছে।

অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতেও মনোজ বসু অতুলন। লেখকের রোমান্টিক প্রবণতার স্বাক্ষর এখানেও বিদ্যমান। 'প্রেতিনী' গল্পে অন্ধকার নদীবক্ষে নৌকায় দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী প্রভার সঙ্গে হরিচরণের প্রীতিমধুর কলহ অনুযোগ ও অনুরাগের মধ্য দিয়ে গোড়াতেই অতিপ্রাকৃত জগতের

সাংকেতিকতা সৃষ্টি হয়েছে। সরযূর অকালমৃত্যু, তালগাছের মাথায় অমাবস্যার ঘন অন্ধকার, নদীতীরে বটতলায় শ্মশানঘাট, কশাড় হোগলাবন—এই পরিবেশের মধ্যে হরিচরণ প্রভাকে নিয়ে নৌকায় চলেছে সরযূর বাপের বাড়ির ঘাট দিয়ে—পড়তে পড়তে পাঠকের অন্তরে শিহরণ জাগায়। দেহাতীত সতীন সরযূ সম্পর্কে প্রভার নানা কৌতূহল হরিচরণকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। সুকৌশলে কাহিনীর মধ্যে এই মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে :

> "বুঝলে প্রভা, সে শুধু নামেই তোমার সতীন, ভালবাসার ভাগ পায়নি।
>
> ঠিক এমন সময়ে মাঝি বলিয়া উঠিল, কলমিডাঙায় এলাম মাঠাকরুন।
>
> হরিচরণের মুখের হাসি নিভিয়া গেল। তাহার কেমন মনে হইল, যাহাকে কোনদিন ভালবাসে নাই বলিতেছিল, সে যেন কথাটা আশপাশ কোনখান হইতে শুনিয়া ফেলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এ ঠিক সরযূরই কান্না…।"

ঘটনা-সংস্থাপনার কৌশল হরিচরণকে এক অনৈসর্গিক অশরীরী জগতে নিয়ে গেল, একটা গা-ছম-ছম পরিবেশের সৃষ্টি হল। সরযূর অশরীরী আত্মা আজও দাম্পত্য প্রেম চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষায় যেন এই নির্জন নদীতীরে বনপ্রান্তে ছায়াান্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। অথচ, প্রভাকে তুষ্ট করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে সেই সরযূকে কাঁদিয়েছে সে। এই অপূর্ব সুন্দর অনুভূতিটি অতীন্দ্রিয় পরিবেশে প্রস্ফুটিত করেছেন লেখক : "সে উহাদের কথাবার্তা শুনিতে পাইয়াছে—শুনিয়া বুক চাপড়াইয়া বিজন শ্মশানঘাটায় একলা প্রেতিনী মানুষের ভালবাসার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে।"

এই গল্পে অতিপ্রাকৃত শিল্পায়নের সূক্ষ্ম কলাকৌশল বিদগ্ধ পাঠকের বিস্ময় জাগায়।

মনোজ বসুর গল্পগুলির সাফল্য মৌলিকতায় শুধু নয়, জীবনদর্শনের স্বাতন্ত্র্যে। বস্তুবৈচিত্র্যে এবং রচনারীতির দিক থেকেও সেগুলি আদর্শ ছোটগল্পরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। যথাযথ বিষয়বস্তু নির্বাচন, পরিমিত বিশ্লেষণ, অসাধারণ সংযম, নিপুণ সংলাপ তাঁর ছোটগল্পের শিল্প-সাফল্যের মূলীভূত কারণ। আগে ছোটগল্পের বিপুল সাফল্য, তারপরেই মনোজ বসুর ঔপন্যাসিক খ্যাতি। উপন্যাসস্থিত লেখকের মননস্বভাবের বিশিষ্টতাগুলি ছোটগল্পেরই প্রসারিত রূপ বলা যায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নাটক : মঞ্চ ও অভিনয়—

ঔপন্যাসিক রূপে মনোজ বসু সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগেই নাট্যকার রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। 'প্লাবন' (১৩৪৮, শ্রাবণ) নাটক প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর পরে প্রথম উপন্যাস 'ভুলি নাই' (১৩৫০, শ্রাবণ) প্রকাশিত হয়। 'ভুলি নাই'এর অল্প কিছুদিন পরে প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়া-জাগানো নাটক 'নতুন প্রভাত' (১৩৫০, মাঘ)। নাটকগুলি মনোজ বসুর অবিসংবাদিত প্রতিভার নিদর্শন।

বস্তুনিষ্ঠা, ঘটনাবিন্যাস, নাটকীয় গতিবেগ, চরিত্র, সংলাপ, নাট্যকৌতূহল, দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতির বিস্ময়কর অভিব্যক্তি 'নতুন প্রভাত' নাটকখানির সাফল্যের অন্যতম কারণ। জনমানসে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে তোলে এইজন্য নাটকটি ইংরেজ শাসকশক্তির রোষদৃষ্টিতে পতিত হয়।

মনোজ-প্রতিভার সার্থক বিন্যাস ঘটেছে নাটকে। তাঁর প্রতিভা নাট্যধর্মী। এই স্বভাবগত নাট্যপ্রবণতা গল্পে এবং উপন্যাসেও নাট্যশিল্পের দাবি নিয়ে সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, উপন্যাস ও নাটক দুটি পৃথক শিল্প। উভয় শিল্পরীতি সম্বন্ধে লেখক পূর্ণ সচেতন। উপন্যাসে মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠত্ব situation-সৃষ্টির কৌশলে এবং সংলাপ রচনায়। এই দুই বৈশিষ্ট্য আবার নাটক রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয়। প্রকৃত পক্ষে, উপন্যাসের মত নাটকও ছিল মনোজ বসুর স্বক্ষেত্র। ঔপন্যাসিক রূপে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হলেও তাঁর নাট্যপ্রতিভা ছিল প্রথম থেকেই পরিণত। তাই, উপন্যাসে কোন জীবনসত্য উদ্ভাবনের সময় চরম ঘাত-প্রতিঘাতময় পরিস্থিতি নির্বাচন এবং ঘটনার গতিবেগ সৃষ্টির জন্য নাট্যরীতির সদ্ব্যবহার লেখকের রচনা সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

মনোজ বসু যে যুগে নাট্যচর্চা আরম্ভ করেন, সে যুগে নাট্যসাহিত্যের রূপ ও রীতির মধ্যে একটা পরিবর্তন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। পূর্বযুগকে বাতিল করে দিয়ে এক নতুন জীবনজিজ্ঞাসা নাট্যধারার সঙ্গে সংযুক্ত হল—প্রচলিত সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পেল। বৃহত্তর গণজীবনের সমস্যা ও সংগ্রাম, তার দুঃখময় জীবনের কারুণ্য বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের বাণী বহন করে আনল। যুগগত জীবনজিজ্ঞাসার বাণীরূপ দিতে

গিয়ে নাটকের রূপ ও রীতির পরিবর্তন হল। এল নবনাট্য আন্দোলনের জোয়ার।[১]

নবনাট্য আন্দোলনের (১৯৪৪) সঙ্গে মনোজ বসুর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে, নবনাট্য আন্দোলনের আবহাওয়ায় তাঁর নাট্যচর্চা। বিশেষ করে 'নতুন প্রভাত' (১৯৪৩) এই নাট্য আন্দোলনের আগমনী-গান। নাট্য সাহিত্যে যে কথা বলি বলি করেও বলা হচ্ছিল না, মনোজ বসু নাটকের মধ্যে তাকে অবগুণ্ঠনমুক্ত করলেন। বলিষ্ঠ জীবনবাদ, আশাবাদ, প্রপীড়িত মানুষের সংগ্রাম, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মুক্তির শপথ প্রভৃতি সমকালীন নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর রচনায় প্রাধান্য লাভ করল।

নাট্যশালার বাইরের লোক হয়েও নাটকে নতুন জীবনের আশা ও স্বপ্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। বিভেদ শোষণ ও অত্যাচারের অবসান কামনা, নবীন জীবনের অভ্যুদয় ঘোষণা এবং সাম্য মৈত্রীর প্রতি বিশ্বাস তাঁর নাটকে এক নতুন জীবনশক্তি সৃষ্টি করেছে। সে কারণে দেশের সর্বত্র এমন কি দূরবর্তী অজ্ঞাত পল্লীতেও নাটকগুলি অভিনীত হয়ে গণজাগরণে সহায়তা করেছিল।

অভিনয়ের গুণাগুণে নাটকগুলি সমৃদ্ধ। পূর্বযুগের নাটকে প্রধান-চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। নবনাট্য আন্দোলন গৌণ চরিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি দিল, এবং অভিনয়ে তাদের বিশেষ মূল্য স্বীকৃত হল। মনোজ বসুর নাটকেও এই বিশেষ ধর্মটির উপস্থিতি লক্ষ্য করার মত। প্লাবন' নাটকে গোঁসাই, উৎপল, 'রাখীবন্ধনে' অনিরুদ্ধ, মল্লিনা প্রভৃতি গৌণ কমিক চরিত্রগুলি নাটকে relief সৃষ্টি করে, তেমনি আবার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণাগ্রে বিদ্ধ করে সমাজের ভণ্ডামিকে। নাট্যরসের কোন হানি না ঘটিয়ে এরা দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম।

নাটকের অভিনয় জনগণের চিত্তের কাছে ঘনিষ্ঠ করে তুলবার জন্য লেখকের আয়োজনের অন্ত নেই। শহরে এবং মফস্বলে অভিনয়ের জন্য (বিশেষ করে যেখানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারের সুযোগ নেই) পৃথক

১. "শুধু সংগ্রাম নহে, সংগ্রামের মধ্য দিয়া জনগণের মুক্তির সুস্পষ্ট আভাস এই নাট্য-আন্দোলনের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। আজিকার সমাজে প্রগতিমূলক ও সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শের যে প্রসার হইয়াছে তাহার পিছনে নবনাট্য আন্দোলনের ভূমিকা।"- বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ : পৃ. ৩৩।

পৃথক ব্যবস্থা। মঞ্চস্থলের মঞ্চের উপযোগী করে অংশ বিশেষ পুনর্লিখিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জানুযায়ী সংলাপের ব্যবস্থাও আছে। এক কথায় নাটক ও অভিনয়ের কথা তিনি একই সঙ্গে চিন্তা করেছেন। নাট্যকারের সঙ্গে অভিনেতা এবং মঞ্চের সম্বন্ধ আছে বলেই প্রয়োগসাফল্যের প্রতি তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ, মঞ্চসাফল্য অনেক অসার্থক নাটককেও উতরে দেয়। নাট্যকার নিজেও এই সম্পর্কে সচেতন :

"লেখক ও পরিচালক দু'জনেই শিল্পী। লেখকের মনের মধ্যে এ টা ছবি থাকে, আবার নাটক পড়ে পরিচালকের মনের মধ্যেও ছবি ফোটে একটা। দুই ছবিতে মেলে না। ... (তাই) লেখকে পরিচালকে ধ্বস্তাধ্বস্তি বেধে যায়।"[২]

নাটক লেখা আর তাকে মঞ্চস্থ করা সম্পূর্ণ আলাদা শিল্পকর্ম। নাটকের মধ্যে নাট্যোৎকর্ষই সব নয়। নাটককে মঞ্চেও সাফল্য অর্জন করতে হয়। নাট মঞ্চের সঙ্গে দর্শকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নাট্যকারের ভাবনাতেও দর্শকের একটা স্থান থাকা উচিত। দর্শকের সঙ্গে নাট্যকারের যোগাযোগের মাধ্যম মঞ্চ ও নাটকের কুশীলব। যোগাযোগের সেতু-নির্মাণের জন্য যবনিকার অন্তরালে কোন নাট্যকারই আত্মলোপ করে থাকতে পারে না; মনোজ বসুও থাকেন নি। থাকেন নি বলেই মঞ্চ-আঙ্গিকে অভিনবত্ব আনতে পেরেছেন। মঞ্চে বিক্ষুব্ধ জনতার দৃশ্য সমাবেশ ('প্লাবন', 'বাখি বন্ধন') করে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বহির্জগতের চলমান গণজীবনের বাস্তবায়ন করেছেন। আলোর বিচিত্র মায়াজাল সৃষ্টি করে অভিনয়কে বাস্তবায়িত করার বিভিন্ন নির্দেশ আছে নাটকে। বার্নার্ড শ'র নাটকেও অনুরূপ অভিনয়, মঞ্চ-ব্যবস্থা এবং রূপসজ্জা সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ আছে। মনোজ বসু বার্নার্ড শ'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন।

পরিশেষে বলা যায়, নাট্যকারের সমস্ত নির্দেশ পরিচালক নির্বিবাদে অনুসরণ করে চলেন নি। দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী গড়েপিটে নিতে হয়েছে তাঁকে। 'শেষলগ্ন' প্রসঙ্গে নাট্যকার আপনার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন : "বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বার কয়েক পড়ে দেখে বললেন, এত বেদনা দর্শকের সহ্য হবে না। মিলনান্ত করতে পারেন কি না দেখুন।" নাট্যকারের ও পরিচালকের উপলব্ধি এখানে এক হয়ে মিশতে পারে নি।

---

২. শেষ লগ্ন—ভূমিকা।

জাতীয় আন্দোলনের প্রবল ভাবোদ্দীপনার পটভূমিকায় নাট্যকার রূপে মনোজ বসুর আবির্ভাব। স্বাধীনতাকামী মুক্তিপাগল মানুষের মৃত্যুভয়হীন সংগ্রাম, ত্যাগ ও দুঃখের আদর্শ মনোজ বসুর অন্তরে নাট্যরচনার প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। যুগগত নাট্যচেতনার প্রতি অনুগত থেকে আদর্শের সুন্দর প্রতিমূর্তি অঙ্কন করেছেন তিনি। জাতীয় ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নাট্যকার শ্রেণী-চরিত্রের রহস্যকে করেছেন আবরণহীন। মানুষের দুটি শ্রেণী : ধনী ও দরিদ্র। এই ধারণাই সাধারণ মানুষের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বোধ বিলুপ্ত করে। সর্বহারা শোষিত মানুষদের ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করে জাতীয় মুক্তিযজ্ঞের সংগ্রামী জনতায় পরিণত করে; নাট্যকৌতূহলকে উত্তেজিত করে। আকস্মিক ঘটনার তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত situationএ সংগ্রাম-চেতনা যেমন বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তেমনি নাট্যকারের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, শ্রেণীচেতনা, গণবিপ্লবের ধারণা অপরূপ নাটকীয় পরিণতি লাভ করে।

প্লাবন (১৩৪৮, শ্রাবণ) মনোজ বসুর প্রথম নাটক। 'প্লাবন'কে দেশাত্ম-বোধক নাটক বলা যুক্তিসংগত হবে না। এই নাটকে নাট্যকারের রোমান্টিক মন মহাপ্রলয়ের পদ্মাসনে বসে এক অভূতপূর্ব জীবনরাগ সৃষ্টি করেছে।

এক প্লাবনে নাটকের সূচনা, আর এক প্লাবনে তার সমাপ্তি। প্রলয়ের আবর্তে হারিয়ে-যাওয়া জীবনকে প্রলয়ের পরিবেশে ফিরিয়ে দিয়ে নাট্যকার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন, কাহিনীতে স্পষ্ট নয়। আখ্যানভাগ নিশারাণী ওরফে মনোরমার অজ্ঞাতবাসের রহস্যকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে। নিশারাণী শেখরের আশ্রিত। খরের প্রেয়সী হয়ে বাঙালী হিন্দুনারীর গ্লানিময় জীবনযাপন নিশারাণীকে ক্লিষ্ট করে। শেখরকে সে তার নিরুপায় অসহায় জীবনের বন্দীত্বের কথা বলে। নাট্যকার তার এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে দুঃসহ করে তুলবার জন্য এবং শেখরের দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য ফ্লাশব্যাকে (পশ্চাৎআলোকপাতে) পূর্বঘটনার অবতারণা করে actionকে দ্রুত করে তোলেন। তীব্র নাট্যোৎকণ্ঠার মধ্যে পূর্বকথার শেষ হয়।

নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দৈনন্দিন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের রূপ ফুটে উঠেছে। কমলেশের কণ্ঠে শোষিত সমাজের এক মর্মন্তুদ ইতিহাস ব্যক্ত হয়। কিন্তু কমলেশের চরিত্র লেখকের সহানুভূতি বঞ্চিত। বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের জন্য নিশারাণীকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায়ের হীন

ষড়যন্ত্র এবং নীলাম্বরকে সবিতার প্রেমের প্রতিপক্ষ ভেবে উত্তেজনা প্রকাশ করা কিংবা গ্রাম-পরিত্যাগের সংকল্প করা তার মত দেশব্রতীর পক্ষে আদৌ উচিত নয়। কিন্তু কমলেশকে নাট্যকার type-চরিত্ররূপে আঁকেননি। একটা রক্তমাংসের সজীব মানুষ করে চিত্রিত করেছেন। সবিতার প্রত্যয়দৃপ্ত নারীব্যক্তিত্ব কৌতুকরস পরিবেশনে সহায়ক হয়েছে; নীলাম্বরের মত রিক্ত শূন্য মানুষের মিথ্যা দর্প, শক্তির আস্ফালন, মানুষের হৃদয়ের সান্নিধ্যলাভের জন্য তার কাঙালপনা চরম নাট্যোৎকণ্ঠার উপযোগী পরিবেশ রচনা করেছে দর্শকের কৌতূহলে নাটক গতিময় হয়েছে।

এই নাটকীয় গতি প্লাবনের জলকল্লোলে দুর্বার হয়ে ওঠে। সম্ভবতা অসম্ভবতার সমস্ত সীমারেখা মুছে দিয়ে এক আকস্মিক জীবনতরঙ্গের বেগ এসে পড়ে নাটকে। দাম্পত্য প্রেমের অনুরাগসিক্ত মিলনমধুর জীবনকাব্য রচনার জন্যেই যেন প্লাবনকে পারিবেশরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। ছিন্নমূল দাম্পত্য জীবন আকস্মিকভাবে সংযুক্ত হল প্লাবনের দোলায়। যে মহাপ্রলয় একদিন নিশারাণী-নীলাম্বরের ঘর ভেঙেছিল, তাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল, সেইরকম আর এক প্রলয়ে তারা দুজনে একত্রিত হল। কিন্তু তখন জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বাকি শুধু মহাপ্রলয়ের সঙ্গে শেষ বোঝাবুঝি। এক চিরজিজ্ঞাসার তিমিরে দাঁড় করিয়ে নাট্যকার তাঁর নাটক সমাপ্ত করলেন। মহাপ্রলয়ের গ্রাস থেকে তাদের জীবন নিরাপদ হোক, এই প্রার্থনা নিয়ে দর্শক প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে। দর্শকের এই সহানুভূতি এবং নাট্যোৎকণ্ঠা নাটকখানির গৌরব।

নূতন প্রভাত (১৩৫০ মাঘ) নাটকে দেশাত্মবোধ সৃষ্টির প্রচেষ্টা পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। সর্বত্র নাটকটি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করে। দেশের সর্বস্তরে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল বলে ব্রিটিশ সরকার এর অভিনয়ে অনুমতি দিতেন না।

'প্লাবনে'র রোমান্স থেকে 'নূতন প্রভাত' মুক্ত। নাট্যকারের বাস্তবনিষ্ঠা এবং বস্তুসচেতনতা এই নাটকে সার্থকতায় উত্তীর্ণ। জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নাট্যকার দেখেছেন দেশ ও কালের সমস্যা; জাতীয় জীবনের মূল্যে বিচার করে তার নাট্যরূপ দিয়েছেন। পল্লীগ্রামে সাধারণ মানব-সমাজের দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-সম্প্রদায়ের বিবেকহীন শোষণ। এই শোষণে ও দোহনে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। অবিচার অত্যাচারকে অবনত মস্তকে বরণ করে নেওয়া তাদের অভ্যাস হয়ে ওঠে। 'নূতন প্রভাত' নাটকে

নাট্যকার তাদের অভ্যুদয়—আত্মবিস্মৃত জাতির আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন দেখাতে চেয়েছেন। জাতীয় জীবনের ভীরুতা এবং নিশ্চেষ্টতার জন্য শশাঙ্কের মত শত সহস্র মুক্তিপাগল ছেলে দুঃসহ দুঃখকষ্ট সয়ে মৃত্যু বরণ করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। এই ব্যাপারে নাটকীয় সংঘাত ও ঘটনার গতিবেগ হয়েছে তীব্র। বাহ্য ঘটনা নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উত্তেজনা এবং আলোড়ন সৃষ্টির জন্য লেখক সম্ভবত বাইরের শক্তির উপর অধিক নির্ভর করেছেন।

মূল নাটকীয় সংঘাত শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। সংগ্রামী কৃষককুলের কর্মের ও ঘর্মের শরিকানা পূর্ণভাবে অর্জন করার দাবি লেখকের সাম্যবাদী চেতনার ফলশ্রুতি। জমিদারী নিষ্পেষণ যত কঠোর হয়েছে, শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদে তত বেশি কঠোর হয়ে উঠেছে। সাম্যবাদী চেতনার এই গভীরতা ও ব্যাপকতা নাটকে সার্থক ভাষারূপ লাভ করেছে। ধনলুব্ধ মানুষের অত্যাচারে হাতিপোতার জীবন সুস্থ স্বাভাবিক রূপে বিকশিত হতে পারে না। শ্রমের ফসল ধনী জমিদার লুঠ করে কৃষকের মেরুদণ্ড ভাঙলেও মাথা সম্পূর্ণ হেঁট করাতে পারে নি। রতিম নিঃস্ব, কিন্তু বলিষ্ঠ। দুঃখের দাহনে তার ব্যক্তিত্ব অনমনীয় দৃঢ়তা অর্জন করেছে। কান্তরামের তোষণনীতি ব্যর্থ। শোষণে যখন তার অস্তিত্ব চূর্ণপ্রায় তখনই তার চৈতন্যোদয় হল; সেজন্য তাকে মূল্য দিতে হল প্রচুর। মহেশ্বরের মত স্বার্থান্বেষী ধনীমানুষদের কাছে স্বার্থই বড় কথা। নিষ্পেষণ-যন্ত্রে মানুষকে নিঙড়ে ছিবড়ে করে আবর্জনার মত তারা ফেলে দেয়। কান্তরাম সেই পরিত্যক্ত আবর্জনা। তার মূঢ়তার সমুচিত শিক্ষা নাট্যকার দিয়েছেন তাকে।

শ্রেণীশত্রু সম্পর্কে নাট্যকার সচেতন হতে বলেছেন। সমাজে এরা বহুরূপী। এদের ছদ্মবেশ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। থানার দারোগা আমিনুল হক ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের বন্ধু সেজে তাদেরই বেশি অনিষ্ট করেছে। মানুষের মধ্যে বিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সে শ্রেণীসংগ্রামের শত্রুতা করেছে। তার চরিত্র দালাল শ্রেণীর। আমিনুলের ন্যায় হলধরও ধনীশ্রেণীর পদলেহী পিশাচ।

শোষণের ভয়াবহ নৃশংসতাকে নাটকে সমধিক প্রকট করার জন্য প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে হলধরের উপস্থিতি আবশ্যক হয়ে উঠেছে। নিষ্পেষণ-যন্ত্রের যন্ত্রী সে। এই নাটকের সে villain। কাহিনীতে তাকে প্রাধান্য দিয়ে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত ও আলোড়ন সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। হলধরের উপস্থিতি দর্শকের

মনে ঘৃণা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তাকে কেন্দ্র করেই নাটকীয় গতি দুর্বার হয়ে ওঠে।

শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ লেখকের অন্তরপুরুষকে বিচলিত করে। মানুষের নারায়ণকে জাগিয়ে তুলবার মহান শপথ এখানে প্রেরণাময় রূপ নিয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান নিয়ে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়, তা শ্রেণীচরিত্রেরই রকমফের। বিত্তের পাহাড় যাঁরা খাড়া করেছেন, তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখক টেনে নামিয়েছেন বুভুক্ষিত জনতার সারিতে। মানবাত্মার প্রতি এই বিশ্বাস-শ্রদ্ধা থেকেই নবীন প্রভাতের অরুণোদয় হবে। শেষ দৃশ্যে নাট্যকারের সহানুভূতি ও আত্মময়তা প্রবল হয়ে ওঠার দরুন নাট্যাংশ কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে।

রাখিবন্ধন (১৩৫৬, আশ্বিন) দুই অঙ্ক-বিশিষ্ট নাটক। প্রথম অঙ্কে মুক্তি-মাতাল তরুণদের প্রত্যক্ষ মুক্তিসংগ্রাম ; দ্বিতীয় অঙ্কে তাদের আত্মোৎসর্গ-লব্ধ বিজয়-লাভের করুণ পরিণাম। ১৯০৫ সালের বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধে জাতীয় বিক্ষোভ সর্বগ্রাসী অগ্নিবিপ্লবে পরিণত হল। সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল বাংলার ঘরে ঘরে। আব্দুল জব্বারের মত রাজভক্ত ব্যবসায়ীর স্ত্রী হামিদা, ভবদেবের মত অনুগত রাজভৃত্য, কন্যা উমা—সবাই বাধা বিচূর্ণ করে এগিয়ে গেছে। শাসন-ভাঙা তারুণ্যের জোয়ার কুমুদ, নিশানাথ, আজিজ, সুশীল, বিপিন, সেলিম, মনোহর প্রমুখ দামাল ছেলেদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। ব্রিটিশ-দমননীতির বিরুদ্ধে আমাদের নাট্যকৌতূহলকে উত্তেজিত করে লেখক তীব্র গতিবেগ সঞ্চার করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে স্থান পেয়েছে ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট তারিখের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের রাজনৈতিক রূপ। দুইবারের বঙ্গভঙ্গের মধ্যে নাট্যকার তফাৎ দেখতে পান না, একই ঘটনার প্রায় পুনরাবৃত্তি। ইতিমধ্যে সভ্যতার অগ্রগতি, ইতিহাসের বিরাট ওলটপালট হলেও দেশের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। "সেই tradition সমানে চলেছে।" কুমুদের তাই মনে হচ্ছে : 'সাঁইত্রিশ বছর আগে যা দেখে গিয়েছিলাম, অবিকল তাই।' সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারায় একই দেশের অধিবাসীকে দুই দেশের বাসিন্দা করেছে। 'ছিন্ন-অঙ্গ রক্তাক্ত দেশের আর্তনাদে' নিজদেশে পরবাসী হওয়ার অপমানে লেখক বেদনাবিহ্বল। ব্যক্তিগত ক্ষোভ, হাহাকার নাট্যকাহিনীর সঙ্গে মিশবার ফলে হৃদয়াবেগ ও আত্মময়তা প্রবল হয়ে উঠেছে। নাট্যকারের শিল্পীসত্তার সঙ্গে কুমুদ একাত্ম হয়ে গিয়েছে। ক্ষুব্ধ ব্যথিত লেখক এই কবন্ধ অর্থহীন

স্বাধীনতার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন ; শ্লেষশাণিত দৃষ্টিপাত করেছেন তার দিকে। স্বাধীনতার নামে দেশের লোককে প্রতারণা করা হয়েছে ; স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী মানুষরা গান্ধীটুপি পরে দেশপ্রেমিক সেজেছে। এই মিথ্যাচার ধাপ্পাবাজি স্বদেশপ্রেমিক কুমুদের অন্তরজ্বালার কারণ ; স্বাধীনতা নিয়ে ভণ্ডামীকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে লাঞ্ছিত করে সে। কেশব ওরফে কুমুদ চরিত্র লেখকের আবেগ-অনুভূতির রঙে রঙীন। লেখকের আশাবাদও ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠে। কঠিন মূল্য দিয়ে যে বিকলাঙ্গ স্বাধীনতা আমরা গ্রহণ করেছি, তার অবসান ঘটানোর জন্যে রক্তরাঙা-রাখি বন্ধন করে স্বাধীনতার দিনে সে ভাঙা-বাংলা জোড়া লাগানোর শপথ নেয়।

দ্বিতীয় অঙ্কে সংগ্রামের পরিণাম দেখানোর জন্য স্বাধীনতার বীর সৈনিক কুমুদের উপস্থিতিকে নাট্যকার প্রধান করে এঁকেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন—কিসের জন্য তারা একদিন লড়াইতে নেমেছিল, আর কি পেল পরিণামে ? দেশ বিভাগ রুখবার জন্য সর্বস্বপণ করে ছেলেমেয়েরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল, ফাঁসির দড়ি হাসতে হাসতে গলায় গলিয়ে দিয়েছিল—সেই সব মহান আত্মত্যাগ কি নিষ্ফল হয়ে গেল ? কুমুদের এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আর একজন বিপ্লবী— কুমুদেরই দলের সুশীল। স্বাধীন ভারতের মন্ত্রী এখন সে। সুশীল বলে, 'স্বাধীনতা মানে শুধু মনিব-বদল নয়।' কুমুদকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে সে আরো বলল, 'এক হব আমরা—রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে নয়, উদার মনুষ্যত্বের স্ফুরণে। এপারের মানুষ আমরা ওপারের মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে আসব। ওপারের মানুষ র এপারে ডেকে আনব রাখি পরবার জন্য।' স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় লেখকের সেই আকাঙ্ক্ষা বোধহয় পূরণ হতে চলল। স্বাধীন বাংলাদেশ যদিও সম্পূর্ণ পৃথক একটি রাষ্ট্র, তবু তাঁদের মুক্তিসংগ্রামে 'আমরা ওপারের মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে' দিতে পেরেছিলাম। কুমুদের কথাই সত্য হল শেষ পর্যন্ত—'হাজার হাজার সর্বত্যাগীর রক্তে-রাঙা রাখি'র বন্ধনে বাঁধা পড়ল দুইপারের বাংলা।

বলা উচিত এই অঙ্কে কাহিনী মন্থর। ঘটনার দ্রুততা আকস্মিকতা এবং নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের অভাব ও পভাবে অনুভূত হয়।

বিপর্যয় (১৩৫৫, কার্তিক) পারিবারিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা স্নেহ প্রেম শঠতা-বঞ্চনার নাট্যরূপ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের

প্রবৃত্তিগত ব্যাপার। দারিদ্র্য যখন বাধা হয়, মানুষ সাধপূরণের লোভে স্বেচ্ছায় আত্মসম্ভ্রম বিক্রী করে, ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেয়, যে-কোন মূল্যে অভিলষিত সম্মান সুনাম অর্জন করে। এর জন্যে একটি হৃদয়বান মানুষকে যে মূল্য দিতে হল, নাট্যকার তার চিত্র এঁকেছেন 'বিপর্যয়' নাটকে। ডক্টর হিরণ্ময় চৌধুরীর জগৎজোড়া খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও অন্তরে সে বিক্ষু। বুকের ভিতর হাহাকার ওঠে মানুষের হৃদয়ের একটু স্পর্শলাভের জন্য। অথচ ডক্টর চৌধুরীর ঘর, ছেলে, স্ত্রী সবই ছিল। উচ্চাভিলাষই তাঁকে কাঙাল করেছে। তাই, এই মর্যাদায় তাঁর তৃপ্তি নেই। এই অবস্থায় একদিন আকস্মিক ভাবে তিনি হারিয়ে-যাওয়া স্ত্রী নলিনী এবং পুত্র অজয়ের সাক্ষাৎ পেলেন। জীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার এসে লাগল। হিরণ্ময় ও মণিমালা ওরফে নলিনীকে নিয়ে নাটকীয় সংলাপ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রের নানা বিচিত্রমুখী অসমঞ্জস কর্মভাবনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকীয় গতিবেগে আন্দোলিত হয়েছে। হিরণ্ময়, মণিমালা, মলয়ার মুহুর্মুহু ভাবপরিবর্তন দর্শককে নাট্যোৎকণ্ঠায় উত্তেজিত করে রাখে। নাটকের গতিকে বিশেষভাবে বাড়িয়ে তোলার জন্য লেখক বাৎসল্যের পরিবেশ রচনা করেছেন। ছিন্ন দাম্পত্যজীবনের পুর্নমিলন এবং স্বচ্ছন্দ গৃহজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য অজয়ের উপস্থিতি নাটকে অপরিহার্য হয়েছিল। কিন্তু ছিঁড়ে-যাওয়া জীবনে গিঁঠ লাগানোর প্রধান সমস্যা হল পারিবারিক জীবনের ভুলবোঝাবুঝি, সুতীব্র ভালবাসার অভিমান। নলিনী নিষ্পাপ ও পবিত্র। স্বদেশী আন্দোলনের গোপনীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য শঙ্করের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের অভিনয় তাকে করতে হয়েছিল, তারই জন্য হিমাংশুর সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। হিমাংশু ও নলিনীর দাম্পত্য মিলনের পথে শশাঙ্ক ছিল বাধা; কিন্তু অজয়ে অনুকূল সেতুবন্ধন। তাই বাৎসল্য সবেগে হিরণ্ময়কে আকর্ষণ করে অজয়ের দিকে; তাকে কেন্দ্র করে হিরণ্ময়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব তুঙ্গে আরোহণ করে। স্নেহের হাত অজয়ের দিকে সে যত প্রসারিত করে, মণিমালা অজয়কে হারানোর আশঙ্কায় ততই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। অজয়ের পিতৃপরিচয় দাবি, তার আবেগ-উত্তেজনা হিরণ্ময়ের হৃদয়দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তোলে। অন্তরজোড়া সেই হাহাকারের প্রতিক্রিয়ায় সন্তানকে সে প্রতিহিংসায় উত্তেজিত করে।

"তুই বড় হতে চাস খোকা? তার চেয়ে বড়দের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়া। মানুষের চোখের জলে পৃথিবী পঙ্কিল হয়ে গেল।

পঙ্কের উপর শতদলের আলো ফুটিয়ে তোল তোরা।…কোথায় যাচ্ছিস ? মেঘ করেছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, একটুখানি দেরী করে যা" (পৃ-৮০)

প্রবল নাট্যোৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে বিরোধ যখন পরিসমাপ্তি লাভ করে, তখন আর এক নতুন বিপর্যয়—হিরণ্ময়-মণিমালা-অজয়ের মিলন অরুণ-কিশোরের শত্রুতায় বিপর্যস্ত হল। মলয়া স্নেহ প্রেম ভালবাসা ও নীরব আত্মোৎসর্গ নিয়ে নাট্যে উপেক্ষিতা রয়ে গেছে। নাটকটি অভিনয়োপযোগিতার জন্য পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘকাল অভিনীত হয়েছিল।

পূর্বালোচিত নাটক চতুষ্টয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন অনুকূল নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির কার্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে "নূতন প্রভাত" ও 'রাখিবন্ধন' আন্দোলনের পুরোপুরি নাট্যরূপ। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার বাস্তব ও নিখুঁত চিত্র থাকা সত্ত্বেও এই দুইটি নাটক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে গৃহীত হয়নি। কিন্তু অপেশাদার মঞ্চগুলি বিপুল সাফল্যের সঙ্গে অজস্র অভিনয় করেছেন।

'শেষ লগ্ন' মনোজ বসুর বিখ্যাত বিয়োগান্ত গল্প 'উলু' অবলম্বন করে রচিত। 'উলু'র ভাববস্তু নাটকে অনুসৃত হয়েছে : কিন্তু পেশাদারী মঞ্চের অনুরোধে বিয়োগান্ত কাহিনীকে মিলনান্ত করা হয়েছে। নাটকে লেখক গল্পটিকে কথঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করেছেন। গল্পের নাট্যোৎকণ্ঠা কাহিনী-সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছে। লেখকের বক্তব্য থেকে জানতে পারি :

> বীরেন্দ্রকৃষ্ণ (ভদ্র)…বললেন—এত বেদনা দর্শক সহ্য হবে না। মিলনান্ত করতে পারেন কিনা দেখুন—গৌরীকে বাঁচিয়ে রেখে বিয়ে-থাওয়া দিয়ে দিন। প্রথমটা মনে হল অসম্ভব। ভাবতে লাগলাম।… বিয়ের তিনটে লগ্ন। প্রথম লগ্ন প্রতীক্ষায় কাটল। দ্বিতীয় লগ্নে নিশির সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে—গৌরীর জীবনে সর্বনাশা দুর্যোগ। তৃতীয় ও শেষ লগ্নে মিলন—বুকের উপর থেকে উদ্বেগ ও বিষাদের পাথর নেমে গেল। নাটকেরও তাই নতুন নামকরণ হল 'শেষ লগ্ন'।

হৃদয়হীন সামাজিক প্রথার একটি সকরুণ কাহিনী পল্লী পরিবেশে নাট্যকারের অভিজ্ঞতায় জীবন্ত এবং বাস্তব রূপ পেয়েছে। 'শেষলগ্ন' নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন : "বছর কয়েক আগেও এক অজ পাড়াগাঁয়ে প্রায় এমনি কাণ্ড হতে যাচ্ছিল।" এই নাটকে পল্লীজীবনের নীচতা, হৃদয়-

হীনতা, নিয়মসর্বস্ব আচারের প্রতি আনুগত্য কুচক্রী মানুষের ষড়যন্ত্র এক আশ্চর্য নাট্যরূপ লাভ করেছে।

গৌরীর মত অতিসাধারণ কুরূপা মেয়েকে সুপাত্রস্থ করার সমস্যা নিয়ে যে নাটকীয় সংকটের উদ্ভব হল, তা বাঙালী পরিবারের হৃদয়-নিঃসৃত মাধুর্য ও স্নেহবাৎসল্যে পরিপ্লুত। গৌরীর অদৃষ্টলাঞ্ছিত জীবন দুঃসহ ও জটিল করে তুলবার জন্য নাট্যকার নিশিকান্ত মল্লিকের মত পাষণ্ড নরপশু এবং নীরদের মত দুরাচার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। নিশিকান্ত এবং নীরদের অমানুষী কার্যকলাপ তাদের ষড়যন্ত্র এবং অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার কৌতুক-কৌতূহলের বিষয়; আবার এর মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সঞ্চারিত হয়েছে নাটকে। পল্লীসমাজের অভিশাপে গৌরীর জীবন যখন দুঃখময় হয়ে ওঠে, একটি সুন্দর জীবনের শুভ্রতা সজীবতা একটু একটু করে যখন ম্লান হয়ে আসে, তখন দর্শকের মন নিশিকান্তর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। ঘটনাপ্রবাহের প্রতি দর্শকের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা নাট্যরস সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ রচনা করে। নিশিকান্তর ষড়যন্ত্রে গৌরীর জীবনে দুর্ভাগ্য যখন ঘনিয়ে এল, গৌরীকে বধূরূপে লাভ করার জন্য তখনকার অসংগতিপূর্ণ আচরণ যেমন কৌতুকময় তেমনি বীভৎসতায় করুণ। এই দৃশ্য দর্শকচিত্তে একপ্রকার শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা জাগিয়ে রাখে।

শুধুমাত্র Situation সৃষ্টির কৌশলে 'শেষ লগ্ন' এক অনবদ্য নাট্যরূপ লাভ করেছে। মিলনান্ত পরিণতির দিকে যখন ঘটনা অগ্রসর হচ্ছে, অকস্মাৎ বরের আগমন উপলক্ষ করে তখন নূতন এক সংকটের উদ্ভব হয়, যা অবস্থা একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিল। নিশিকান্তর সঙ্গে গৌরীর বিয়ের আয়োজন ও প্রস্তুতি যখন নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি সুনিশ্চিত করে তুলেছে, তখন আবার বরের হঠাৎ আবির্ভাবে নতুন নাট্যতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। দর্শকের উদ্বেগ কৌতূহল উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে নাটকের মিলনান্ত পরিসমাপ্তি হয়েছে। এই পরিণতি নাট্যশিল্পসম্মত এবং স্বাভাবিক। এবং প্রণয়ের মাধুর্যে মনোরম : "তোমায় আমি সিঁদুর পরিয়ে এখানে ফেলে রেখে যাব না গৌরী। তোমায় আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমার মায়ের কাছে।" কিংবা, "কোথায় ছিলে ঠাকুর ? রাত পোহায়ে যায়, এত দেরি করতে হয়। এই দেখ, আমায় মেরেছে—কেটে কেটে গিয়েছে।"—এমনি সব কথাবার্তার মধ্যে নাট্যসমাপ্তি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শিল্পচেতনা ঃ

Plot, character, dialogue, time and place of action, style, and a stated or implied philosophy of life, then, are the chief elements entering into the composition of any work of prose fiction, small or great, good or bad.

—An Introduction to the Study of Literature: W. H. Hudson.

উপন্যাসের সার্থক শিল্প প্রসঙ্গে রোমা রোঁলা বলেন, 'Style is soul' অর্থাৎ শিল্পীর সমস্ত চিন্তাভাবনা, উপলব্ধি, অনুভূতি—এক কথায় তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব শিল্পরূপকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায়। প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।' শিল্পীর জীবনভাবনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে সাহিত্য যখন রূপময় হয়ে ওঠে, তখনই তা সার্থক হয়।

মনোজ বসু বলেন, 'সাহিত্যের কাজ জীবনের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা।' এই প্রকাশের কাজটি সমাধা করতে লেখক এক বিশেষ ধরনের আর্টের আশ্রয় নিয়েছেন। যুগযুগান্ত ধরে মানুষ যে ভঙ্গিতে কথা বলে, গল্প করে, আলাপ জমায়—সেই ভঙ্গি যে গল্প-উপন্যাস রচনারও উপযোগী মনোজ বসু তার প্রমাণ। বাংলাসাহিত্যে কথন-রীতির সাহিত্যরচক মনোজ বসুতেই প্রথম নয়। প্রমথ চৌধুরী কথন-রীতির উৎকৃষ্ট শিল্পরূপ দেন। বিভূতিভূষণের অনেক রচনাতেও এই পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মনোজ বসুর মত এমন ব্যাপক ও সাবলীল ভাবে কেউ কথনভঙ্গিতে শিল্পরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন, কিনা সন্দেহ।

মনোজ বসু সদালাপী মানুষ। গল্প করতে ও বলতে ভালবাসেন। গল্প বলার বাসনা থেকেই নিশ্চয় এই শিল্পরীতির উদ্ভব।

"কিশোর বয়সে গল্প বলতে ভালবাসতাম।...গল্প বলা আজও চলেছে। এখন আর মুখে বলি না, লেখে বলি।...তাঁদের তৃপ্তি দেওয়াই জীবনসাধনা আমার। তাই নিয়ে অহরহ চিন্তাভাবনা।"

(ঝিলমিল-পৃ-১৬৩)

এই যৌগস্বভাবের সঙ্গে অন্বিত হয়েই তাঁর শিল্পরীতির বিকাশ। চেনাজগতে কথাবার্তা বলা ও গল্প করার বিশেষ পটভূমিতে তিনি তাঁর সৃষ্টির ভিত রচনা করেছেন। সাহিত্যে আত্মকথন-রীতি নামে একে অভিহিত করা চলে।

প্রচলিত শিল্পপদ্ধতি ও আঙ্গিক পরিহার করে লেখক এই রীতির সাহায্যে তাঁর গল্প-উপন্যাসের সৃষ্টি করেন। আত্মকথন-রীতির সাহায্যে মানব-জীবনের বিচিত্র ও বহুব্যাপক প্রবাহের যে ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তা তাঁর ব্যক্তিত্বের কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। মনোজ বসুর শান্ত সহজ দৃষ্টিভঙ্গি আত্মকথন-আঙ্গিকে যত প্রাণস্পর্শী হয়, লিপিধর্মী আঙ্গিকে ততদূর বোধহয় সম্ভব নয়। তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তা এত ঘনিষ্ঠ যে অনেক সময় রচনাটি গল্প, না রূপকথা-উপকথা, না দিনলিপি, না উপন্যাসের অংশবিশেষ তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। 'ছবি আর ছবি' 'পথ কে রুখবে?' 'নিশিকুটুম্ব' 'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসগুলিতে এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে।

গল্প মানেই নির্বাচন। নির্বাচন দু'ভাবে হয়েছে। জীবনের রূপ ও সমস্যাকে বেশী করে যখন দেখাতে চেয়েছেন, তখন একটি সমস্যার জালে ঘটনা ও চরিত্রকে জড়িয়ে ঘাত প্রতিঘাতের সংঘর্ষে তাকে উত্তাল করে তুলেছেন। এর ফলে, গল্পে ও উপন্যাসে অনিবার্যভাবে নাটকের প্রবল বেগ এসে পড়ে। আর যেখানে গল্পটাই মুখ্য সেখানে নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াস নেই। নির্বাচনী মনটা স্বভাবত শিথিল সেখানে। মানুষ ও ঘটনার সমারোহেই গল্প সেখানে জমজমাট। বিচিত্র মানুষ ও বিস্তৃত জীবন এই গল্পরসকে পুষ্ট করে। ছবি আর ছবি' 'পথ কে রুখবে?' উপন্যাসে মূলত ব্যক্তির সঙ্গে শিল্পীর নিবিড় মিলন ঘটেছে। এবং সে মিলনের ফলে কাহিনী আত্মস্মৃতিমূলক আঙ্গিকে শিল্পিত হয়েছে।

রচনায় লেখকের কথকসুলভ বৈশিষ্ট্যটি সহজে চোখে পড়ে। কাহিনীর মধ্যে লেখকের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের উপস্থিতি প্রায় সব উপন্যাসেই ঘটেছে। চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি গল্প লেখেন। শিল্পীর কক্ষ ছেড়ে মাঝে মাঝে এসে পড়েছেন চরিত্রদের সুখদুঃখের প্রাঙ্গণে। এর ফলে গল্পের কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে ব্যবধান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে, চরিত্রগুলির অন্তরের অন্তস্তলে পাঠক দৃষ্টি সঞ্চালিত করতে সক্ষম হন। এবং লেখক নিজেও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিঃসাড়ে মিশে যান। পাঠক-হৃদয় ও

উপন্যাসের মানুষের মধ্যে একটা সহৃদয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে। যেমন, 'প্রেমিক' উপন্যাসের শেষাংশে :

> "রুচিবাগীশরা রাগে জ্বলেন : অরিন্দম ডাক্তারের পক্ষাঘাত জানি, কিন্তু এমন কেউ নেই বোম্বেটে ড্রাইভারটার ঘাড় ধরে গোটা কতক রদ্দা কষিয়ে দেয় ? নিষ্ঠুর নরাধম দুটোই—যেমন ড্রাইভারটা তেমনি ঐ মেয়েমানুষ। কেচ্ছাকেলি চোখের উপর দেখানোর জন্য অসহায় মানুষটাকে ময়দান অবধি টেনে নিয়ে আসে।"

সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পীর এই অন্তর্মিলনের ফলে শিল্পীর নির্লিপ্ততার অবসান হয়ে যায়। যা দেখে মনে হতে পারে, শিল্পসৃষ্টিতে সচেতন নন তিনি। কিন্তু লেখকের এই বিশেষ শিল্পধর্ম একেবারে নিরাসক্ত লিপিধর্মী আঙ্গিকে সম্ভব হতে পারে না।

উপন্যাসে যে নাটকীয়তা আছে, তা কোন সচেতন নাট্যচেতনার ফলশ্রুতি নয়। নাটকের কথাবস্তুর মত কাহিনীকে সুসংযত করে পরিবেশন করা তাঁর একটা বিশেষ art-form। ঘটনা-নির্বাচনে নাটকীয়তা এবং ক্লাইম্যাক্স-অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের বিচিত্র সংমিশ্রণে বৃহৎ জীবনচৈতন্যের উপলব্ধি এক তাৎপর্যময় রূপলাভ করে। ভাবরূপের মধ্যে ফুটে ওঠে সামগ্রিক জীবন-সত্য। কথাসাহিত্যের মধ্যে নাটকের ক্রিয়া কি রকম সমারোহময় করে তুলেছেন তিনি, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। "বনমর্মর" গল্পে ঘটনা-সংস্থাপনের কৌশল বিপুল গতিবেগ সঞ্চার করেছে। "উলু" গল্পেও সৃষ্টি হয়েছে অনুরূপ নাটকীয়তা। "আমি সম্রাট", "রানী" প্রভৃতি উপন্যাসও নাট্য চমকে উদ্ভাসিত। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এবং গতির তরঙ্গে ভিতর দিয়ে জীবনের নাটকীয় মুহূর্তগুলি রসময় হয়ে প্রকাশ পায়। জীবনের সহজ সরল রূপের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টির জন্য এই নাটকীয় শিল্পরীতির আশ্রয় তাঁর রচনাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

মনোজ বসুর কলাবিধির প্রধান বৈশিষ্ট্য সরলতা। গল্প, উপন্যাস, নাটক পর্যালোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, তাঁর লেখার ভাব ভাষা রচনাভঙ্গি সবই সহজ। সহজিয়া পথের সাধক তিনি। বিভূতিভূষণের মতন তাঁর জীবন ও শিল্প-ভাবনার মধ্যে বিরোধ নেই। দ্বন্দ্বহীন মন সংশয়হীন কল্পনা শিল্পচেতনাকে করেছে নির্বিরোধ। কলাবিধিতেও নেই তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শিল্পব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশেছে তাঁর শিল্পরীতি। রচনাশৈলী পরীক্ষার নামে আপন ভাবকল্পনাকে কোন রকম কৃত্রিমতার দ্বারা আড়ষ্ট

করেননি। সকল রকম দুরূহতা জটিলতা পরিহার করেছেন। জীবনের মত শিল্পও স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর। সহজ রসের সাধক মনোজ বসুর শিল্পসাধনার মন্ত্র : Think your own thoughts, feel your own feelings. Let your heart set the rhythm to the words.

ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মনোজ বসু সহজ স্বচ্ছন্দ ও অনাড়ম্বর। ভাষা তাঁর চিন্তা ও অনুভূতিরই অনুরূপ। কৃত্রিম সাজানো ভাষাকে তিনি স্বীকার করেননি। মুখের ভাষাকেই শিল্পের ভাষা করেছেন। লেখনীর মুখে মৌখিক ভাষাই তরঙ্গ হয়ে প্রকাশিত হয়। এই 'আলাপী ভাষা' তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। কথকরীতির সঙ্গে অন্বিত হয়ে এই প্রকার ভাষার বিকাশ। এই ভাষারীতি অন্যের পক্ষে অনুকরণ করা দুঃসাধ্য।

সাধু এবং চলতি দুটি ভাষা-রূপেই লেখক সিদ্ধহস্ত। গোড়ার দিকে সাধুভাষা অবলম্বন করে অনেকগুলি গল্প ও কিছু উপন্যাস রচনা করেন। পরবর্তীকালে চলতি রীতিই হয়েছে তাঁর সাহিত্যের বাহন। চলতি কথায় লেখা গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা অনেক বেশী। ভাষারীতিতে মৌখিক প্রচলিত ভাষার সঙ্গে অনেক দেশীয় উপভাষা, এবং মুসলমানী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করেন। দু-একটি বহুলব্যবহৃত শব্দের উল্লেখ করছি : তেবিয়া, হররোজ, মাংনা, চাট্টি, রমারম প্রভৃতি দেশি শব্দ ; মুরুব্বি, হালফিল, তাবিপ, শামিল, মালুম, বেএক্তিয়ার, বেওয়াবিশ প্রভৃতি আরবি-ফারসি শব্দ। এরকম অজস্র শব্দসম্ভারে পরিপূর্ণ তাঁর রচনা। তবে, কলকাতায় ব্যবহৃত চলতি ভাষাই মূল আশ্রয়। উল্লেখ্য, রচনাকে অতিবাস্তব করার জন্য আঞ্চলিক ভাষারীতি রক্ষার প্রতি তিনি মনোযোগ দেননি। কিন্তু বিশেষ এক বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহার করে অঞ্চলবিশেষের প্রাণসম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। 'জলজঙ্গলের' দুকড়ি, 'বন কেটে বসতের' মহেশ কথায় কথায় প্রাচীন রূপকথা উপকথার উদ্ধৃতি দেয় এবং বাদারাজ্যে চলাফেরার নিয়মকানুন, বাদাবন সম্পর্কে প্রবাদ-প্রবচনের যথেচ্ছ ব্যবহার করে। এই কৌশলে আঞ্চলিকতার স্বাদ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গদ্যের এই মিশ্ররীতির প্রয়োগে মনোজ প্রতিভা অনন্য।

মনোজ বসু আত্মসচেতন শিল্পী কি না ? এ বিষয়ে বলা যায়, তাঁর অনেক উপন্যাসের কাঠামো দৃঢ়বদ্ধ নয়—শ্লথবিন্যস্ত। ঘটনাগুলো অনেক সময় অপরিহার্য ভাবে আসে না। 'ছবি আর ছবি', 'পথ কে রুখবে ?' উপন্যাস পাঠ করলে এই ত্রুটি উপলব্ধি করা যায়। নানা এলোমেলো কাহিনী ও ঘটনা

উপন্যাসের মধ্যে এসেছে বিক্ষিপ্তভাবে। 'ছবি আর ছবি'তে ঘটনাগুলো চিত্রার্পিতবৎ। একটির পর একটি ঘটনা ছায়াছবির মত আসছে এবং যাচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা পরিবেশনের মধ্যে নেই নাটকীয় উত্তাপ বা চাঞ্চল্য।

লেখকের কতকগুলি নিজস্ব ভাল-লাগা অনুভূতি আছে, প্রিয় চরিত্র আছে, যেগুলি হৃদয়রাজ্যে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। বাস্তব জীবনঅভিজ্ঞতার সূত্রে পাওয়া বলেই এদের প্রতি লেখকের অসীম মমতা। ভুলে থাকতে পারেন না—ঘটনাপ্রসঙ্গে তারা আসে প্রায় একই সাজে। ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিকে ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্য লেখকের বাস্তবসচেতনতা তথ্যের প্রতি ঝুঁকেছে। ফলে, সাংবাদিকতা অনিবার্যভাবে এসেছে সাহিত্যায়নে। সাংবাদিকতার সাহিত্যরূপ 'আগস্ট ১৯৪২' এবং 'পথ কে রুখবে'?

'আগস্ট ১৯৪২'এর কাহিনীর দ্বিতীয়াংশে দেশব্যাপী আইনঅমান্য আন্দোলন এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে কাহিনীকে এক-সূত্রে গ্রথিত করার জন্য এবং ঘটনার তীব্র গতিবেগ ও আন্দোলন মানুষ কি ভাবে নিয়েছে তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট সংবাদ উদ্ধৃত করে লেখক উপন্যাসের সঙ্গে তাদের সন্ধিস্থাপনা করেছেন। গণসংগ্রামের মহিমা উপন্যাসের অন্তর্গত চরিত্রগুলিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আখ্যায়িকার প্রথম পর্বে সব চেয়ে বেশী দীপ্ত ছিল চন্দ্রা। দেশের মুক্তি-অভিযানের তরঙ্গে জনগণের মধ্যে সেই চরিত্র একেবারে হারিয়ে গেল। আন্দোলনের জোয়ারে খড়কুটোর মত পাঠকও ভেসেছেন। 'পথ কে রুখবে?' উপন্যাসেও মল্লিকঘাটের ওয়েটিংরুমে কালহরণের সময় লেখক এই সাংবাদিকও . ' আয়োজন করেন। এবং সৌভ্রাত্র সৃষ্টির অনুকূল ভাবাবেগ সঞ্চারিত করেন কাহিনীতে। এই situation-সৃষ্টির কলাকৌশল সাংবাদিকের অধিগম্য নয়—সে জন্য দরকার আর্টিস্টের। মনোজ বসু রূপদক্ষ আর্টিস্ট বলেই সাংবাদিকতার নিখুঁত সাহিত্যায়ন করতে পেরেছেন।

মনোজ বসু রোমান্টিক জীবনশিল্পী। তাই যা প্রত্যক্ষ, শুধু তাকেই একমাত্র জীবনসত্য বলে তিনি গ্রহণ করেন নি। ভাবলোকে জীবনের রহস্য-সুন্দর রূপটি উজ্জ্বল করে তুলবার অভিপ্রায়ে রোমান্সের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। লেখকের এই মনোভাব তাঁর বাস্তব রসবোধ এবং সৃজনক্ষমতা থেকেই জন্ম নিয়েছে। জীবনের বাস্তবতা ও চরিত্রের প্রত্যক্ষ জীবস্বরূপ আকর্ষণ করে তাঁকে। দুর্গম সুন্দরবনের অধিবাসীদের অজ্ঞাত জীবনরহস্য,

দুর্ধর্ষ পৌরুষ, বর্বর বীর্য বাস্তবতায় সার্থক। মনোজ বসুর মানসগঠন অতএব যথার্থ বাস্তববাদী শিল্পীর।

অপরপক্ষে, রোমান্সের স্বপ্নাবেশ অনেক গল্পে ও উপন্যাসে বর্তমান। জল ও জঙ্গলের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে এইরূপ কোমল আবেগসমৃদ্ধ চিত্র আছে। 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত', 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসে বাংলা দেশের দিগন্তবিস্তৃত নদী, অরণ্য, মাঠ, বিল, খাল, আকাশ, পৃথিবীর নিসর্গ-বর্ণনার মধ্যে সূক্ষ্ম গীতিরসের ব্যঞ্জনা। 'বনমর্মর'-এর আরণ্য রহস্য কবিকল্পনায় ভাস্বর :

"হঠাৎ কোন দিক হইতে হু-হু করিয়া হাওয়া বহিল ; এক মুহূর্তে মর্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোন-কিছুর যোগাড় নাই। চারিদিকে মহা শোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মতো সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না—সে যেন মহামহিমার্ণব যারা সব আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সিপাহিসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল : এ কে ? এ কোথাকার কে—চিনি না তো !"

রোমান্টিক কাব্যানুভূতির সঙ্গে গভীর মননশীলতার যোগ হয়ে গদ্য রচনা তীব্র তীক্ষ্ণ জীবন-সমালোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে :

"জীবন ভোর ধিকিধিকি জ্বলেপুড়ে মরা। চোখের সামনে ঘরে ঘরে হাজার মেয়ে স্বামীপুত্র শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ঘরকন্না করছে। আনন্দে হাসে, দুঃখে ব্যথায় চোখের জল ফেলে। তাই দেখে আমারও যদি কোনদিন নিশ্বাস পড়ে থাকে, সে দোষ আমায় দিবি নে—দোষ সেই বিধাতাপুরুষের, বিধবা জেনেও যে দেহ ভরে যৌবন বইয়ে দেয়, মনের মধ্যে ঝড় তোলে।"

(নিশিকুটুম্ব—১ম, পৃ. ২৬৫)

মনোজ বসুর সামগ্রিক শিল্পচেতনার বৈশিষ্ট্যের সূত্রেই তাঁর চরিত্রগুলির বিকাশ। দৃষ্টিভঙ্গীর অকৃত্রিম সরলতায় চরিত্রগুলি জীবন্ত। কোনরূপ জটিল অন্তর্বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন না তিনি। চরিত্রগুলি শান্ত সুস্থ স্বাভাবিক,

এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর। কোনরকম হীনমন্যতা নেই প্রধান চরিত্রগুলির ভিতর। ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্যে তারা দীপ্তিময়।

একটি পথিক-মন রয়েছে লেখকের মধ্যে, ঘরের চার-দেয়ালে সে বন্দী অবস্থায় থাকতে চায় না। বিশাল পৃথিবীর জন্য তার আকুলতা। তাঁর সৃষ্ট বহু চরিত্র বন্ধন-অসহিষ্ণু —পথ চলার নেশায় মত্ত। জীবন সম্পর্কে লেখকের নির্লিপ্ত নিরাসক্ত উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গী তাদের ভবঘুরে রোমান্টিক জীবনবোধকে পুষ্ট করেছে। এই ধরনের নায়ক চরিত্রগুলি হল : কেতুচরণ, মধুসূদন, জগন্নাথ, মহেশ, সাহেব, পান্নালাল, শিশির ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ভবঘুরে নায়ক চরিত্র লেখকের বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার সূত্রে বিধৃত। জীবনের ছোট বড় ঘটনার স্রোতে তারা ভেসে চলেছে এক কূল থেকে অন্য কূলে। উমার প্রেম পারে নি পান্নালালের ঘরছাড়া মনকে গৃহবাসী করতে (সৈনিক)। বিশাল প্রকৃতির বিস্তৃত অঙ্গনে কেতু, জগন্নাথ, মহেশ, সাহেব ছন্নছাড়া। পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের নেশা।

সাহিত্যে পালাবদল সূচিত হল ১৯৫০ থেকে। "মানুষ নামক জন্তু"তে তার প্রথম সূত্রপাত। ১৯৬০-এর পর সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন-গুলো লক্ষীভূত হয়। এই সময় থেকে নাগরিকতার উন্মেষ হল মনোজ বসুর সাহিত্যে। লেখকের গ্রামভাবনায় ছিল যশোহর জেলা। ঐ অঞ্চল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের বিপন্ন সম্প্রীতি নিয়ে লেখক দীর্ঘকাল ধরে আদর্শমূলক অনেক গল্প রচনা করেছেন। স্বপ্নসাধের বিনষ্টিতে লেখক আশাহত, গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়ার যন্ত্রণায় মন তাঁর বেদনাবিধুর। এ অবস্থা নগরকে পটভূমি নির্বাচন করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। শহরের প্রতিকূল পরিবেশে সৃষ্টি-প্রেরণা স্ফূর্তি পায় না, জীর্ণ-ব্যবস্থার ভগ্নস্তূপের উপর নতুন সমাজ-নির্মাণও অসাধ্য। 'মানুষ গড়ার কারিগর'এ তার দৃষ্টান্ত। বিকল্প ব্যবস্থা-হিসাবে লেখক পল্লার উৎখাত মানুষ ও শহরের পরিবেশকে আশ্রয় করে শিল্পসৃষ্টি শুরু করলেন : এই সব চরিত্র শহরের বাসিন্দা হলেও এদের অন্তর গ্রামের প্রতি মমতা ও বেদনায় নিষিক্ত। এই পর্বে গ্রাম পূর্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ নয়। লেখক এখানে আশ্চর্য রকম বস্তুনিষ্ঠ। এই সময়ের রচনার মধ্যে পূর্ববর্তী রোমান্টিকতা এবং বাস্তবতার সমন্বয় ঘটেছে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

পর্যটক :

মনোজ বসুর অনুপম সৃজনী প্রতিভার প্রকাশ ভাবে রূপে যেমন স্বতন্ত্র ও বিচিত্র, তেমনি তা বহুমুখী ধারায় প্রকাশিত। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি তাঁর সার্বভৌম কবি-মনীষায় উজ্জ্বল। সম্প্রতি কিশোরদের জন্য লেখা বইও বেরিয়েছে (রাজার ঘড়ি)। ভ্রমণসাহিত্যও তাঁর অপরিমিত দানে সমৃদ্ধ।

নগণ্য গ্রাম থেকে শুরু করে পৃথিবীর বহু অঞ্চলে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। ঘুরেছেন চীন, হংকং, রাশিয়া, আফগানিস্তান, সিংহল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ (চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড, জার্মানি, প্যারিস, বেলজিয়াম, লণ্ডন প্রভৃতি)। এ ছাড়া আছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল।

পূর্বালোচনায় দেখেছি মনোজ বসুর মধ্যে একটি পথিক মন রয়েছে। নিরন্তর চলতে চায় সে :

> "বিল-বাঁধ জঙ্গল-জাঙাল পাহাড় প্রান্তর কত হেঁটেছি! হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে। কাঁটা ফুটেছে, জোঁকে খেয়েছে, শামুকে পা কেটে চৌচির হয়েছে। ধূলিধূসর পথে সূর্যদহনে রক্তমুখ হয়ে ছুটেছি কখনো—বর্ষায় ধারাস্নান করে ছুটেছি, খালপারের সময় পা পিছলে স্রোতের মুখেও পড়ে গেছি।"[১]

ভ্রমণের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা পথের বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করে কেবলই এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে। লেখকের কাছে "পথই আসল।···বাউল-ফকিরের মত ঘুরেছি চলার আনন্দে।" পথে কুড়ানো সেই আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছেন তিনি ভ্রমণকাহিনীর পাতায়।

ভ্রমণকাহিনীগুলি লেখকের ব্যক্তি-মনের স্পর্শে সঞ্জীবিত। "কত সমস্ত মানুষজন, ঘরবাড়ি, কতরকম সুখদুঃখ, আশাআশ্বাস। আলাপনে ও বিশ্রামে সময় বয়ে যায়, পথ এগোয় না। চারিদিকে উচ্ছলা ধরণী নব নব রূপ মেলে

১। পথ চলি—পৃ-১

ধরেছে—কাকে ফেলে কাকে দেখি, তাড়াতাড়ি এগোব কি করে ?''[২] সহস্র স্মৃতির সঞ্চয় নিয়ে লেখক কৌতূহলী শ্রোতার কাছে আসর সাজিয়ে বসেন। মনোরম ভঙ্গিতে পরিবেশন করেন ভিন্ন দেশের মানুষের অভিনব জীবনকথা, বৈঠকী গল্পের ভঙ্গিতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। যে বিশেষ শিল্পরীতির সাহায্যে মনোজ বসু আমাদের গল্প শোনান, ভ্রমণকাহিনীতেও সেই শিল্পরীতি। কথকরীতির সুনিপুণ মুন্সিয়ানায় স্থান-পরিচয়, অনুষ্ঠান-পরিচয়, মানবচরিত্র, ঘটনা সব চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। পাঠক যেন তাঁর ভ্রমণের সহযাত্রী হয়ে ওঠেন। "চারদিক দেখতে দেখতে নানান কথা লিখে রেখেছিলাম, সেইগুলো তুলে দিচ্ছি। পড়তে পড়তে আপনারাও উঠে আসুন না আমাদের সঙ্গে।"[৩]

'চীন দেখে এলাম', 'সোভিয়েতের দেশে দেশে', 'নতুন ইউরোপ, নতুন মানুষ', 'পথ চলি' এবং 'ঝিলমিল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গুটি কয়েক ভ্রমণ-কথা মুখ্যত ডায়েরীধর্মী এবং আত্মগত ভাব ও ভাবনায় বৈচিত্র্যময়। লেখকের কথকসুলভ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ডায়েরীর প্রত্যক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠা মিলিত হয়েছে। ডায়েরীর খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভাবনা এই ক্ষেত্রে আশ্চর্য সংহতি লাভ করেছে। প্লেনে ট্রেনে লেখক দেশবিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর দিয়ে যাচ্ছেন—তখনকার বিবরণ ও মনোভাব সঙ্গে সঙ্গে খাতায় টুকছেন। এবং এক কলমের একটু পরিচয় রেখেই দৃশ্যান্তরে ছুটছেন। ফলে, চারপাশের পরিবেশের একটা চলমান রূপ ফুটে উঠেছে ; কোন একটি চিন্তা দীর্ঘক্ষণ ডালপালা মেলে ধরে আপনাকে বিস্তৃত করেনি। যানবাহনের গতির সঙ্গে মুহুর্মুহু ছবি বদলাচ্ছে। একটি রেখায় সম্পূর্ণ অবয়ব ফুটে উঠবার আগেই ভিন্ন টি চিত্রের আয়োজন করতে হয় লেখককে। এজন্য কিন্তু রচনা কেন্দ্রগত ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। বরঞ্চ গল্পরসের আকর্ষণে অধিকতর উপভোগ্য হয়ে ওঠে। 'পথ চলি,' 'ঝিলমিল'-এর অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি এর নিদর্শন।

মনোজ বসুর রোমান্টিক ভাবধর্মী শিল্পীমানস ভ্রমণকাহিনীকে বস্তুসর্বস্ব করেনি। শিল্পকৌতূহল, সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্যজিজ্ঞাসা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চিন্তা, ইতিহাস ও শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ ইত্যাদি অনুভূতির রূপে-রসে লেখা মধুস্বাদী হয়ে উঠেছে।

২। পথ চলি —পৃ-১

৩। চীন দেখে এলাম—পৃ ২২৫

বহু দেশে লেখক ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে ভ্রমণ করেছেন, এবং সেই সেই স্থানে প্রভূত সমাদর পেয়েছেন। "ভুবনের কত রূপ দেখে গেলাম, ভুবনের দেশে দেশে কত পরমাশ্চর্য সুন্দর মানুষ।"[৪]

চীনে যখন যান, শাসন-শোষণ-পীড়নের নাগপাশ থেকে চীন তখন সদ্যমুক্ত। তার বিপুল কর্মোদ্যম, "স্বাস্থ্য ও সুরুচির উল্লাস" পূর্বে এমন প্রকাশমান ছিল না। স্বার্থান্বেষী বণিককুল, প্রভুত্বকামী সাম্রাজ্যবাদী-দল আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল চীনা জনগণকে। শিক্ষার অভাবে জাতি ছিল দুর্বল ও পঙ্গু। রাজা খেলার পুতুল। সান ইয়াৎসেনের মহান নেতৃত্বে চীন তার যুগযুগান্ত সঞ্চিত জড়তা ও অন্ধ কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে আত্মসচেতন হয়। "সোভিয়েতের দেশে দেশে"তে দেখি এইরূপ একই ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ (পার্থক্য, সে বহিঃশত্রুর প্রভাবমুক্ত)। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে এই দুই দেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেকটা মিল রয়েছে।

বিপ্লব চীন ও রাশিয়ার জনগণকে দিয়েছে মুক্তির আনন্দ, বিপুল কর্মোদ্যম। সর্বত্র অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য। সাম্যবাদী দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে দেশের তরুণ সমাজ এবং শোষিত সাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাদের স্বভাব, আচরণ, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, আকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য, বৈষম্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, দেহ-প্রসাধন প্রভৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্যে লেখকের সূক্ষ্ম মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মান্য অতিথিরূপে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সম্বর্ধনা ও আপ্যায়নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে চীন ও রাশিয়ার সুদীর্ঘকালের ইতিহাস সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন লেখক। দেশগঠনের বিপুল আলোড়ন দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছেন।

'চীন দেখে এলাম' গ্রন্থের লেখক পিকিন শান্তিসম্মেলনের একতম ভারতীয় প্রতিনিধি। কাজেই, দুই দেশের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

> "দুই পুরানো পড়শি—মহাচীন আর বিশাল ভারত। হাজার হাজার বছর ধরে অচ্ছিন্ন সৌহার্দ্য। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে কত শতবার আমাদের গমনাগমন চলেছে। রণদুর্মদ সৈন্যবাহিনী নয়, প্রবীণ

৪। চীন দেখে এলাম—পৃ-২৭১

বিদগ্ধজন—হাতে জ্ঞানের মশাল, মুখে আনন্দ ও শান্তির পরম আশ্বাস। জ্ঞানগৌরবে দেদীপ্যমান আত্মসমাহিত সুপ্রাচীন ছুটি দেশ। নির্লোভ আত্মসন্তুষ্ট।"[৫]

লেখকের সুগভীর ইতিহাসপ্রীতির সঙ্গে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ বিজড়িত। ঐতিহাসিক বিষয় তাঁর হৃদ্‌গত রোমান্সরসে প্লাবিত হয়ে গীতিধর্মিতা লাভ করেছে। ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা অপেক্ষা কল্পনাসমৃদ্ধ সুন্দর মধুর চিত্র-রূপই এখানে ফুটেছে বেশি। ঐতিহাসিক স্থানসমূহের নামমাহাত্ম্য এবং তাদের নয়নাভিরাম রূপ, সাহিত্যিক ও লৌকিক আকর্ষণ, স্থাপত্য সৌন্দর্য প্রভৃতি বর্ণনায় অভিনব লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করেছেন তিনি নয়া চীনকে। সেখানে সবাই দেশ-গঠনের শরীক; শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক কাঠামো আমূল সংশোধিত হয়েছে। ভিখারী-পতিতাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সুস্থ সমাজদেহ নির্মাণের আদর্শ স্থাপন করেছে চীন। আত্মসচেতন জাতিতে পরিণত করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষারও আয়োজন চলেছে। নয়া চীনে সর্বত্র "মুক্তির অবাধ আলো, নবজীবনের আনন্দস্বাদ।"

'চীন দেখে এলাম'এর সঙ্গে 'সোভিয়েতের দেশে দেশে' গ্রন্থের আদর্শ ও লক্ষ্যগত ঐক্যের কিছু আলোচনা ইতিপূর্বেই করেছি। সাম্যবাদী দুই রাষ্ট্রের ভূগোল ভিন্ন, কিন্তু ইতিহাসের গতি অভিন্ন। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছনোর কর্মধারা প্রায় একই। লেখক যখন সোভিয়েত দেশে যান, বিপ্লবোত্তর রাশিয়া তখন বি. অগ্রবর্তী। আর চীনে যখন গেলেন, সদ্যমুক্ত চীন সবে সংগঠনের কাজে হাত দিয়েছে। তাই, 'চীন দেখে এলাম'এর বিপুল কর্মচাঞ্চল্যের কাহিনী 'সোভিয়েতের দেশে দেশে'তে অনুপস্থিত। সোবিয়েত ভ্রমণের ক্ষেত্রে লেখকের আবেগ তাই সংহত। একটি সুগঠিত দেশের বিভিন্ন উদ্যম এবং সাফল্যকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার অবসর সেখানে বেশি। 'সোভিয়েতের দেশে দেশে'র লেখক জনৈক অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ও গবেষক।

রাশিয়ার জনগণের পরিচয় প্রসঙ্গে তাদের স্বাস্থ্যের লাবণ্য, বুদ্ধির দীপ্তি, প্রাণোচ্ছল স্বভাবের প্রশংসা করে লেখক রাশিয়ার নারীপ্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন। সে দেশের নারীপ্রকৃতি আপনার

৫। চীন দেখে এলাম—পৃ. ১

স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ প্রবণতা তাদের মধ্যে পূর্ণতা-লাভ করেছে। জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে তারা পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী, অথচ প্রকৃতিতে তারা নারীই। ভারতীয় নারীর মত সংসারজীবনে গৃহবধূরূপে প্রতিষ্ঠা তাদের একান্ত কাম্য। নারীধর্ম পালনকে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে গণ্য করে—"মেয়েগুলোর ঘর বাঁধার বড় লোভ।" রাশিয়ার শাসনতন্ত্রও মানুষের নীড় কামনার পৃষ্ঠপোষকতা করে। মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে উদ্বেগ নেই। বরঞ্চ অধিক সন্তানের জননীকে সরকারী ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অবৈধ সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়াও সরকারী বিধি। শিক্ষা-দীক্ষাতেও রাশিয়া স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। একদা লৌহযবনিকার অন্তরালে থেকে আপনাকে পুনর্গঠিত করে আজ রাশিয়া বিশ্বের দিকে প্রীতি ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সুদৃঢ় বন্ধুত্ব-সম্পর্ক।

"দুটো দেশের ভূমি-প্রকৃতি সামাজিক পরিবেশ ও মানুষ আলাদা বটে, কিন্তু লক্ষ্যে কিছুমাত্র তফাৎ নেই— মানুষকে সর্বসম্পদে ও সর্বাঙ্গীণ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করা।"[৬]

দেশ গড়ার আগ্রহ যাতে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারে, তারই জন্যে লেখক চীন ও রাশিয়ার বিপুল জাগরণ এবং গঠন-প্রয়াসকে সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন। জাতি ও জীবনের সংহতির জন্যে তাদেরই মত কর্মোদ্যম এবং সততা একান্ত প্রয়োজন। লেখক দেশপ্রীতি, ইতিহাসপ্রীতি এবং সাংগঠনিক বোধ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে কোন রকম রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি তিনি। দুই দেশের সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই জিনিস সম্ভব করে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'পথ চলি' গ্রন্থে দীর্ঘ পথের বিবরণ নেই। আছে পথের স্মৃতি। স্মৃতির স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছে পথিকজীবনের অনেক আশ্চর্য মুহূর্ত।

"কত সমস্ত মানুষজন ঘরবাড়ি, কতরকম সুখ-দুঃখ আশা-আশ্বাস। আলাপনে ও বিশ্রামে সময় বয়ে যায়, পথ এগোয় না। চারিদিকে উচ্ছলা ধরণী নব নব রূপ মেলে ধরেছে—কাকে ফেলে কাকে দেখি, তাড়াতাড়ি এগোব কি করে?"[৭]

---

৬. সোভিয়েতের দেশে দেশে—পৃ. ১০৬

৭. পথ চলি—পৃ. ১

নানা উপভোগ্য ঘটনা মনের চারদিকে ভিড় করে। সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলি ধীরে ধীরে স্পষ্ট অবয়ব পায়। কাশ্মীরের পথে সহযাত্রিণী পুষ্পলতার স্নেহদুর্বল অসহায় করুণ মূর্তি, হংকং-এ দেখা চীনা কলগার্লের স্বাজাত্যাভিমান, গাঁয়ের হাটে অনন্তদার দুর্দশা, গ্রাম ও প্রবাস-জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ঘটনা, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম আলোড়ন প্রভৃতি লেখকের অনুভূতিকে অনুরঞ্জিত করেছে। লেখকের আপন মনের সঙ্গে শিল্পীহৃদয়ের যোগাযোগ ঘটে সেখানে। ফলে মনের ভাল-লাগাকে নিজের কাছে কেবলই ব্যক্ত করেছেন। খাপছাড়া ভাবনা, ছেঁড়া টুকরো কথা যেমন আছে, তেমনি ওরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বহু সুগভীর জীবনসত্য। জীবনের ভোজের আয়োজন যত তুচ্ছ সামান্য হোক না কেন লেখক আপন হৃদয়াংশ যুক্ত করে দিয়ে তাকে অনির্বচনীয় করে তুলেছেন। এর মধ্যে তাই একধরনের রসসৃষ্টি হয়েছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনার মধ্যে নেই। চলার পথে লেখক যা-কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন, উপভোগ করেছেন, তাকেই সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। বাঁধাধরা কাহিনী নেই, লেখক-মনে কোন বন্ধন নেই, চিন্তা করে কথা বলার চেষ্টাও নেই। মনের স্বচ্ছন্দ বিহারে রচনা স্বতঃস্ফূর্ত।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গল্পশিল্পী

মনোজ বসুর কিছু কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সগুলি লেখা হয়েছিল মূলত সভা-সমিতিতে ভাষণ দেবার জন্য। দু-একটি প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব মত বিশ্বাস এবং ধারণার পরিচয় আছে। বিষয় অনুসারে প্রবন্ধগুলি : আত্মস্মৃতিমূলক, ভাষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক; রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তামূলক। কলাবিধির বিচারে এগুলি প্রবন্ধ কিনা আলোচনা করা যাক।

তথ্য ও যুক্তি সহযোগে একটি বিশেষ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসকে আমরা প্রবন্ধ বলে থাকি। প্রবন্ধের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের মত বাংলাসাহিত্যও তর্ককণ্টকিত। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে ব্যক্তিগত অনুভূতির পরিবেশে প্রবন্ধ বা নিবন্ধে লালন হয়ে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, উত্তরসূরীরা তাকে নানা বিচিত্র রূপে রূপায়িত করে তুলেছেন।

বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রধানত ঐ দুই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রতিপত্তি। তবে, বিশ্লেষণধর্মী তথ্যনির্ভর যুক্তিনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধ অপেক্ষা কল্পনা-প্রভাবিত, আত্মজীবনীমূলক গদ্যরচনার চর্চাই সমধিক। মনোজ বসুর গদ্য চর্চা দ্বিতীয় প্রকারের। মন্ময় (subjective) শ্রেণীর গদ্যরচনার প্রতিনিধিত্ব করছেন দুই দিকপাল : রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। আধুনিক বাঙালির চিত্তদর্পণে বীরবলীয় প্রবন্ধরীতি স্বকীয়তা বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত। গদ্যরচনায় মনোজ বসু বীরবলের রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত।

প্রমথ চৌধুরী "মিশেল দ মঁতেন" (১৫৩৩-৯২) এর অনুসরণে বাংলা গদ্যসাহিত্যে বৈঠকী রীতির আমদানি করলেন। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় "বাংলা প্রবন্ধের এক শতাব্দী" রচনায় মঁতেনের প্রবন্ধশিল্পের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "প্রবন্ধ যে ব্যক্তিচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হবে, তা যে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুহৃৎসম্মিত সম্পর্ক স্থাপন করবে, তা যে বিষয়নির্ভর না হয়ে ভাবনিষ্ঠ হবে, বক্তব্যকে ছাড়িয়ে উঠবে প্রকাশরীতি এবং সর্বোপরি প্রবন্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিণত হবে, এই চেতনার মূলে আছেন মঁতেন।"

বীরবলীয় রচনারীতির এই আলাপচারী ঢঙ মনোজ বসুর গদ্যে অক্ষুণ্ণ। রচনাগুলি পাঠ করলে মনে হবে, মজলিসে বসে লেখক আলোচনা করছেন। আলোচনার এই ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস মঁতেনের ভাবশিষ্য প্রমথ চৌধুরীর অনুরূপ। ঢঙই শুধু নয়, আলাপী ভাষাও গদ্যরচনাকে অন্তরঙ্গ করে তুলেছে।

গদ্যরচনায় মনোজ বসুর শিল্পসাফল্য বিচার করা যাক। বক্তব্য বিষয়ের সুচারু শিল্পরূপ দিতে গেলে প্রথম প্রয়োজন বিষয় প্রকরণজ্ঞান, আঙ্গিক সচেতনতা, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা। বস্তুত আত্মভাবনার উজ্জ্বল আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠেছে মনোজ বসুর গদ্যস্বভাব। উদাহরণ-স্বরূপ, "আমি জনৈক শিক্ষক" নিবন্ধটির উল্লেখ করা যায়। এখানে লেখক একটি দুরূহ সামাজিক সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। শিক্ষার গুরুত্ব, শিক্ষকজীবনের দুর্দশা, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশের অভিভাবকদের অনুৎসাহ, সরকারি ঔদাসীন্য প্রভৃতি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দিকগুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বলার ভঙ্গি বলার বিষয়কেও ছাপিয়ে যায়। শব্দের প্রতি গদ্যরচয়িতার মনোভাব কখনো গল্পকারের মত, কখনো সহৃদয় শিক্ষকের জবানবন্দির মত,

কখনো বা শিক্ষানুরাগী একজন অসহায় নাগরিকের আক্ষেপোক্তির মত। ব্যক্তিগত উপাখ্যান মূল বক্তব্যকে অতিক্রম করে না; পক্ষান্তরে, বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্যে তা উপমার মত কাজ করে। লেখক তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে সচেতন বলেই রাগে উত্তেজনায় কখনও কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয় না। ঠাণ্ডা মাথায় বৈঠকী মেজাজে বিদগ্ধ শ্রোতার মন জয় করার জন্য রসিয়ে রসিয়ে (সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সঞ্চারিত করে) অবহেলিত শিক্ষার মর্মার্থ ব্যক্ত করেছেন।

"বিহার পশ্চিমবঙ্গ" নিবন্ধটি বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের অন্তর্গত। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষাগুলির ক্ষেত্রে একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংহতির নাম করে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সংকট-সৃষ্টি ও অপচেষ্টা সম্বন্ধে জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে লেখক বাংলাদেশের (তখন, পূর্বপাকিস্তান) ভাষাআন্দোলন থেকে পাঠ নিতে বলেছেন। বিহার ও পশ্চিমবাংলা সংযুক্ত করে বাংলাভাষা নষ্টাৎ করা.. ষড়যন্ত্রে বিক্ষুব্ধ লেখকমনের উষ্ণতা রচনার মধ্যে কোথাও সঞ্চারিত হয়নি। এতৎব্যতীত যুক্তি তর্ক ও তথ্যের সমাবেশে বিষয়বস্তু ভারাক্রান্ত হয়নি কোথাও। পরিবেশনের গুণে তা অনির্বচনীয়তা লাভ করেছে।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, বক্তব্য বিষয়ে লেখকের ভাববিলাস এবং তাঁর আলাপচারী স্বভাব মুখ্য হলেও বিষয়ের পারম্পর্যের কোনপ্রকার হানি হয় নি; অনুভূতির মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়েছে। তবে, গল্প করার সুযোগ পেলেই লেখক বিষয় ফেলে সেইদিকেই ঝোঁকেন। "সভাপর্ব", "সাহিত্য কথা ও নিশিকুটুম্ব", "ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি" প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। বক্তব্য গল্প দিয়েই শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। সাদৃশ্যমূলক দৃষ্টান্ত, গল্প, উপমা যুক্তির স্থান নেয়। গদ্যরচনায় মনোজ বসুর প্রতিভা বিশ্লেষণধর্মী–বস্তুবিশ্লেষণের নয়, ভাববিশ্লেষণের। গল্পে গল্পে পৌঁছান তিনি উপসংহারে। পাঠকের মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে একটা চমৎকার গল্পরসে। পাঠকের পক্ষে তখন বিচার করা দুঃসাধ্য হয়—এটা প্রবন্ধ, না গল্প। না দুটোই? মনোজ বসুর কলম যথার্থ ঔপন্যাসিকের কলম বলেই এই রূপ বিভ্রান্তি। কিন্তু আলোচনার ভাষা আদৌ অস্পষ্ট নয়। বক্তব্য অত্যন্ত সরল, স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল।

গ্রন্থপঞ্জী

	নাম	শ্রেণী	প্রথম প্রকাশ	যে সাময়িক পত্রে মুদ্রিত
১।	বনমর্মর	গল্প	১৩৩৯ শ্রাবণ	
২।	নরবাঁধ	ঐ	১৯৩৩	
৩।	দেবীকিরণাবী	ঐ	১৯৩৪	
৪।	প্লাবন	নাটক	১৩৪৮ শ্রাবণ	
৫।	একদা নিশীথকালে	গল্প	১৯৪১	
৬।	ভুলি নাই [অনুবাদ : (১) হিন্দী, কৈসে ভুলু ; (২) মালয়ালম]	উপন্যাস	১৩৫০ আশ্বিন	'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'তে অংশত প্রকাশিত।
৭।	নূতন প্রভাত	নাটক	১৩৫০ মাঘ	শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫০
৮।	দুঃখ-নিশার শেষে	গল্প	১৩৫১ বৈশাখ	
৯।	সৈনিক	উপন্যাস	১৯৪৫ জুলাই	
১০।	ওগো বধূ সুন্দরী [অনুবাদ : হিন্দী, সুন্দরী]	ঐ	১৯৪৬	
১১।	শত্রুপক্ষের মেয়ে	ঐ	১৩৫৩ মাঘ	বিচিত্রা
১২।	আগস্ট ১৯৪২	ঐ	১৯৪৭ আগস্ট	
১৩।	পৃথিবী কাদের	গল্প	১৩৫৫ বৈশাখ	
১৪।	বাঁশের কেল্লা	উপন্যাস	১৩৫৫ আশ্বিন	
১৫।	বিপর্যয়	নাটক	১৩৫৫ কার্তিক	শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা (১৩৪৯) 'নলিনীর মৃত্যু' নামে
১৬।	উল্লু	গল্প	১৯৪৮	
১৭।	রাখিবন্ধন	নাটক	১৩৫৬ আশ্বিন	
১৮।	খদ্যোত	গল্প	১৩৫৭ শ্রাবণ	
১৯।	নবীন যাত্রা	উপন্যাস	১৩৫৭ মাঘ	শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৭

২০।	কাচের আকাশ	গল্প	১৯৫০	
২১।	মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত)	গল্প	১৯৫০	
২২।	দিল্লি অনেক দূর	গল্প	১৯৫১	
২৩।	জলজঙ্গল [অনুবাদ : ইংরেজী, The Forest Goddess]	উপন্যাস	১৩৫৯ কার্তিক	'দেশ'এ ২৪শে চৈত্র ১৩৫৭ থেকে ১২ই আশ্বিন ১৩৫৮ পর্যন্ত
২৪।	বকুল	ঐ	১৩৫৯ পৌষ	শারদীয় দৈনিক বসুমতী
২৫।	কুঙ্কুম	গল্প	১৩৫৯ পৌষ	
২৬।	চীন দেখে এলাম	ভ্রমণ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার-প্রাপ্ত	১৩৬০ আশ্বিন	মাসিক বসুমতীতে ১৩৫৯ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৬০ আশ্বিন পর্যন্ত
২৭।	এক বিহঙ্গী	উপন্যাস	১৩৬১ শ্রাবণ	শারদীয় দৈনিক বসুমতী (কিয়দংশ প্রকাশিত)
২৮।	শেষ লগ্ন	নাটক	১৩৬৩ অগ্রহায়ণ	
২৯।	বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং	ঐ	১৩৬৩ অগ্রহায়ণ	
৩০।	পথ চলি	ভ্রমণ	১৩৬৩ ফাল্গুন	
৩১।	বৃষ্টি বৃষ্টি	উপন্যাস	১৩৬৪ বৈশাখ	ভারতবর্ষ : চৈত্র ১৩৬১ থেকে পৌষ ১৩৬৩।
৩২।	সোভিয়েতের দেশে দেশে	ভ্রমণ	১৩৬৪ কার্তিক	মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৬৩ থেকে ভাদ্র ১৩৬৪।
৩৩।	কিংশুক	গল্প	শ্রাবণ ১৩৬৪ (২য় সংস্করণ)	
৩৪।	গল্পসংগ্রহ (ডঃ রথীন রায় সম্পাদিত)	ঐ	১৩৬৪ ফাল্গুন	
৩৫।	আমার ফাঁসি হল	উপন্যাস	১৩৬৫ পৌষ	'দেশএ' ১৭ই শ্রাবণ ১৩৬৫ থেকে ১লা কার্তিক ১৩৬৫
৩৬।	ডাকবাংলো ('বৃষ্টি, বৃষ্টি' উপন্যাসের নাট্যরূপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত ও মনোজ বসু)	নাটক	১৯৬৯ মার্চ ১২ই	

৩৭। মানুষ নামক জন্তু

উপন্যাস ১৩৬৬ শ্রাবণ শারদীয়া দেশে বড়গল্প আকারে প্রকাশিত

৩৮। রক্তের বদলে রক্ত ঐ ১৩৬৬ শ্রাবণ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬৫

৩৯। রূপবতী ঐ ১৩৬৭ অগ্রহায়ণ শারদীয়া আনন্দবাজাব পত্রিকা ১৩৬৭

[অনুবাদ : ইংরাজী, The Beauty]

৪০। মানুষ গডার কারিগব

ঐ ১৯৭c মার্চ শারদীয় বেতারজগৎ

[অনুবাদ : হিন্দী, মহিম মাস্টার]

৪১। বন কেটে বসত ঐ ১৩৬৮ শ্রাবণ শারদীয়া উল্টোরথ ১৩৬৫ 'বনের মধ্যে ঘর' নামে প্রথম অর্ধাংশ প্রকাশিত এবং দ্বিতীয় অংশ মাসিক বসুমতীতে ১৩৬৫ পৌষ থেকে ১৩৬৭ আষাঢ

৪২। মায়াকন্যা গল্প ১৩৬৮ আশ্বিন

৪৩। রাজকন্যার স্বয়ম্বর

উপন্যাস ১৩৬৮ চৈত্র শারদীয় যুগান্তব

৪৪। ডম্বরু ডাক্তার একাঙ্ক নাট্যসংকলন

১৯৬১ জুন

৪৫। সবুজ চিঠি—উপন্যাস ১৯৫৬

৪৬। নতুন ইয়োরোপ

নতুন মানুষ। ভ্রমণ ১৯৫৯

৪৭। গল্পপঞ্চাশৎ গল্প ১৯৬২

৪৮। নিশিকুটুম্ব (১ম ও ২য়)

উপন্যাস ১৯৬৩ আগস্ট দেশে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত

অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত, ১৯৬৬

[অনুবাদ : হিন্দী—রাতকা মেহমান, গুজরাটি, ইংরাজী—I come as a thief]

৪৯। স্বর্ণসজ্জা উপন্যাস ১৯৬৪ জুন শারদীয়া অমৃত ১৩৭০

[অনুবাদ : ইংরাজী—Trappings of Gold মারাঠি]

৫০। ছবি আর ছবি ঐ ১৯৬৫ এপ্রিল সাহিত্যের খবর, পত্রিকায় "চলুন আমাদের গাঁয়ে" শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে অংশত প্রকাশিত

৫১। সাজবদল উপন্যাস ১৯৬৫ শারদীয় এলোমেলো

৫২। চাঁদের ওপিঠে ঐ ১৯৬৬ ফেব্রু শারদীয় যুগান্তর

৫৩। কল্পলতা গল্প ১৯৬৬

৫৪। সেতুবন্ধ উপন্যাস ১৯৬৭ এপ্রিল অমৃত ১৩ই শ্রাবণ ১৩৭৩
[অনুবাদ : হিন্দী] থেকে ৩১শে চৈত্র ১৩৭৩

৫৫। রানী ঐ ১৩৭৪ চৈত্র শারদীয় সিনেমাজগৎ ১৮৮৯ শকাব্দ

৫৬। প্রেমিক ঐ ১৩৭৭ চৈত্র শারদীয় যুগান্তর ১৩৭৫
[অনুবাদ : হিন্দী]

৫৭। পথ কে রুখবে ? উপন্যাস ১৩৭৬ বৈশাখ সাপ্তাহিক বসুমতীতে ৫ই বৈশাখ ১৩৭৫ থেকে ১২ই ফাল্গুন ১৩৭৫

৫৮। ওনারা ভৌতিক গল্প ১৩৭৬ চৈত্র

৫৯। ঝিলমিল গদ্যরচনা ১৯৬৯

৬০। আমি সম্রাট উপন্যাস ১৩৭৮ বৈশাখ শারদীয় অমৃত-১৩৭৭
[অনুবাদ হিন্দী : মৈঁ সম্রাট হূঁ]

৬১। মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প গল্প ১৩৭৮ বৈশাখ
(নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নির্বাচিত)

৬২। সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল রচনাবলী ১৩৭৮ আশ্বিন

৬৩। রাজার ঘড়ি ছোটদের গল্প

আকাদেমি পুরস্কার ও নরসিংহদাস পুরস্কার ছাড়াও লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত "শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার" এবং অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত "মতিলাল ঘোষ পুরস্কার" পেয়েছেন।